পরিবেশ বিজ্ঞান

কৃষি বনায়ন

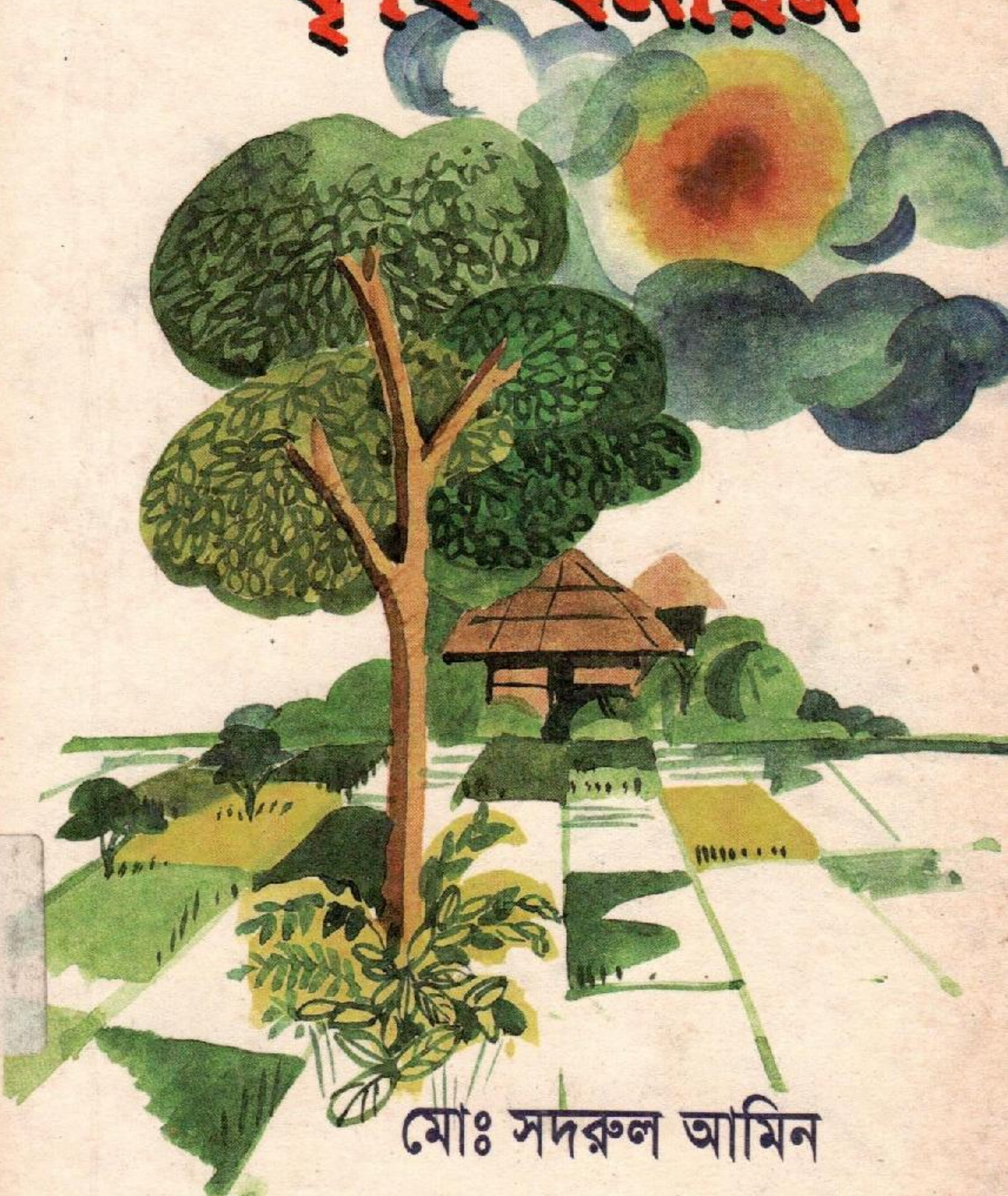

মোঃ সদরুল আমিন

পরিবেশ বিজ্ঞান : কৃষি বনায়ন

BANSDOC Library Dhaka

ড. মোঃ সদরুল আমিন
অধ্যক্ষ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর

বাংলা একাডেমী ঢাকা

পরিবেশ বিজ্ঞান : কৃষি বনায়ন
(কৃষি বনায়নে বন, বনজ বৃক্ষের পরিচিতি ও ব্যবহার)

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৪০৬/নভেম্বর ১৯৯৯

বা/এ ৩৯৫৬
(১৯৯৯-২০০০ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি : ৩)

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জীকৃচি ২৭০

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
শা. ব. শামীম

মূল্য
তিনশত ষাট টাকা

PARIBESH BIJNAN : KRISHI BANAYAN (Environmental Science : Agroforestry) by Dr. Md. Sadrul Amin. Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition : November 1999. Price : Tk. 360.00 only.

ISBN 984-07-3965-4

BANSDOC Library
Accession No. 17810
Date 10.6.04

ভূমিকা

শ্যামল সবুজে ভরা এ বাংলাদেশে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ বন থাকা আবশ্যক। ফসল উৎপাদনের মৌসুমে সবুজে ভরে গেলেও এদেশের সবুজ বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

বন, বনের প্রকার, বনে উপযোগী বৃক্ষের পরিচিতি ও ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষাস্তরে পাঠ্যপুস্তক হওয়া প্রয়োজন। ইতোমধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্ভিদ ও কৃষি শিক্ষায় বনবিষয়ক পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই 'পরিবেশ বিজ্ঞান : কৃষি বনায়ন' গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও বনের বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের পরিচিতি বর্ণনায় প্রাকৃতিকভাবে বনের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কৃষি বন, সামাজিক বন ও বনায়ন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথাসম্ভব বিস্তৃত বর্ণনা উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির মোট ষোলটি অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ, বন, বনের শ্রেণিবিন্যাস, কৃষি বন, সামাজিক বন, বনবৃক্ষের বিভিন্ন প্রজাতির আন্তঃক্রিয়া, বিভিন্ন বনবৃক্ষের বৈশিষ্ট্যসহ পরিচিতি, চাষ ব্যবস্থাপনা, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ক বর্ণনা সকলের কাছে সমাদৃত হবে আশা করা যায়।

গ্রন্থটি স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কৃষিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, বনবিদ্যায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকারে আসবে ধারণা করা যায়। এছাড়াও এটি সাধারণ ও বনজ বৃক্ষের পরিচয় জানতে আগ্রহী পাঠকবৃন্দের যথেষ্ট কাজে আসবে আশা করা যায়। এ বিষয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও গবেষকগণও উপকৃত হতে পারবেন।

সর্বোপরি বাংলা একাডেমীর জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগের সঠিক তত্ত্বাবধানে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর

ড. মোঃ সদরুল আমিন

BANGDOC Library
Dhaka

উৎসর্গ

সাজিদকে

Dhaka

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : বন ও পরিবেশের উপাদান ১—৭

১. ভূমিকা ১
২. পরিবেশের উপাদান ২
৩. প্রাকৃতিক পানিচক্র ২
৪. তাপসাম্যতা ৩
৫. বায়বীয় সাম্যতা ও পরিবেশ ৪
৬. মৃত্তিকা পুষ্টিচক্র ও উদ্ভিদ ৫
৭. পরিবেশ চক্র ও জীব জগৎ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিবেশের উপর বনের প্রভাব ও পরিবেশ দূষণ প্রতিকার ৮—১৬

১. সংজ্ঞা ৮
২. পরিবেশ চক্রে উদ্ভিদ জগতের অবদান ৮
৩. বনের পরিবেশগত তাৎপর্য ৯
৪. বাংলাদেশের পরিবেশ আইন ১০
৫. বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের কারণ ১১
৬. পরিবেশ দূষণের মানব সৃষ্ট কারণ ১২
৭. পরিবেশ দূষণ প্রতিকারের উপায় ১৩
৮. পরিবেশ দূষণের আন্তঃক্রিয়া ১৪
৯. খামার পরিবেশ ১৫

তৃতীয় অধ্যায় : বন ও বনের গুরুত্ব ১৭—২৬

১. সংজ্ঞা ১৭
২. বনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, কাঠের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, বাঁশের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, কাঠজাত শিল্প কাঁচামালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, বনভেষজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ১৯
৩. বনের জীববৈচিত্র্যগত গুরুত্ব ২৫
৪. চিত্তবিনোদনগত গুরুত্ব ২৬

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন ব্যবস্থাপনা ২৭—৬২

১. বাংলাদেশের বন ২৭
২. বাংলাদেশের পরিবেশ ৩৩
৩. বাংলাদেশের পরিবেশ নীতিমালা ৩৫
৪. বাংলাদেশের জাতীয় বননীতি ৩৬
৫. জাতীয় বননীতির ঘোষণা ৩৭
৬. বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন কার্যক্রম ৩৮
৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৪০

BANSDOC Library Dhaka

৮. শিল্প, পানি সম্পদ ও জ্বালানি ৪২
৯. বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য ৪৫
১০. মৃত্তিকা সম্পদ ৪৭
১১. মৎস্য ও পশু সম্পদ ৪৯
১২. গৃহায়ন ও নগরায়ন ৫১
১৩. কৃষি ৫৩
১৪. চর এলাকার সমস্যা ৫৫
১৫. মধুপুর গড় ও বরেন্দ্র অঞ্চল ৫৬
১৬. জলাভূমির বিষয়াবলী ৫৭
১৭. লবণাক্ততা ও চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত বিষয় ৫৯
১৮. উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয় ৬০
১৯. দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা ও কার্যক্রম ৬২

পঞ্চম অধ্যায় : বনের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা ৬৩—৭১

১. বাংলাদেশের বনের বর্তমান অবস্থা ৬৩
২. বনজ সম্পদ ও বনভূমির বিবরণ ৬৩
৩. বন ধ্বংসের কারণ ৬৫
৪. বাংলাদেশের বনবিধি ৬৫
৫. বন্যপ্রাণী বিধি ৬৬
৬. হালা বনায়ন, নার্সারি উন্নয়ন ও সবুজ বেষ্টনী মডেল ৬৭
৭. কুঞ্জগলি শস্য উৎপাদন ৬৮
৮. উডলট বাগানের মডেল ৬৯
৯. সারিবদ্ধ বনায়ন ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায় : কৃষি বনায়ন ৭২—৭৬

১. সংজ্ঞা ও ধারণা ৭২
২. কৃষি বনায়নের ইতিহাস ৭৪
মেসোপোটেমিয়া কৃষি সভ্যতা, মিশরীয় নীলনদ সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, ইউরোপ সভ্যতা, আফ্রিকা সভ্যতা, মেক্সিকো সভ্যতা ৭৪
৩. কৃষি বনায়ন খামারের বৈশিষ্ট্য ৭৬
৪. কৃষি বনায়নের সুবিধা ৭৬

সপ্তম অধ্যায় : কৃষি বনায়ন শ্রেণিবিন্যাস ৭৭—৮৫

১. গঠনিক শ্রেণিকরণ ৭৭
উপপদ্ধতির প্রাধান্য অনুসারে শ্রেণিকরণ ৭৭
উপপদ্ধতির বিন্যাসভিত্তিক শ্রেণিকরণ ৭৮
২. কার্যভিত্তিক শ্রেণিকরণ ৭৮
৩. ফিজিওলজিক শ্রেণিকরণ ৭৯

৪. বাস্তুসংস্থানগত শ্রেণিকরণ ৭৯
৫. আর্থসামাজিক শ্রেণিকরণ ৭৯
৬. ব্যবস্থাপনাভিত্তিক শ্রেণিকরণ ৮০
৭. প্রযুক্তিভিত্তিক শ্রেণিকরণ ৮০
৮. জমির ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণিকরণ ৮০
৯. কৃষি বনায়নের পদ্ধতি ও প্রকার ৮১
১০. বাংলাদেশে কৃষি বন ৮১
১১. প্রচলিত কৃষি বনায়ন মডেল ৮২

অষ্টম অধ্যায় : সামাজিক বনায়ন ৮৮—১২০

১. সংজ্ঞা ও ধারণা ৮৮
২. সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্র ও গাছের বিবরণ ৮৮
৩. সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য ৯৫
৪. বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা ৯৫
৫. সামাজিক বনায়ন বাস্তবায়নের শর্ত ৯৮
৬. সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপ ৯৯
৭. বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের প্রেক্ষাপট ও কার্যক্রম ১০০

নবম অধ্যায় : কৃষি বনায়নের প্রজাতি আন্তঃক্রিয়া ১১৯—১৩১

১. প্রজাতি মনোনয়নের গুরুত্ব ১২১
২. প্রজাতি মনোনয়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ১২১
৩. প্রজাতি মনোনয়নের উপাদান ১২২
৪. বহু ব্যবহারমুখী বৃক্ষ ও এর ব্যবহার ১২৩
৫. প্রজাতি মিশ্রণযোগ্যতা ও আন্তঃক্রিয়া ১২৪
৬. কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও মিশ্রণ যোগ্যতা ১২৫
৭. বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়া ১২৮
৮. বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়ার উপাদান ১২৯
৯. আন্তঃক্রিয়াভিত্তিক বৃক্ষ ও ফসল মনোনয়নের উদাহরণ ১৩২

দশম অধ্যায় : কৃষি বনে লিগ্যুম বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য ১৩৪—১৪১

১. আকাশমনি ১৩৪
২. খয়ের ১৩৪
৩. ম্যানজিয়াম ১৩৫
৪. বাবলা ১৩৬
৫. শিরীষ বা কালি কড়ই ১৩৭
৬. শ্বেত কড়ই বা চন্দনা কড়ই ১৩৮

BANSDOC Library Dhaka

৭. কড়ইজাতীয় বৃক্ষের তুলনামূলক বিবরণ ১৩৮
৮. মান্দার প্রজাতি ১৪০
৯. শিশু ও রেইনট্রি ১৪১

একাদশ অধ্যায় : কৃষি বন গাছের বৈশিষ্ট্য : ফল, ভেষজ ও বাঁশ ১৪২—১৫৯
১. আতাফল ও শরীফা ১৪২
২. কাঁঠাল ১৪২
৩. খেজুর ১৪৩
৪. নারকেল ১৪৪
৫. সুপারি ১৪৪
৬. সফেদা ১৪৫
৭. বেল ১৪৬
৮. তাল ১৪৬
৯. নিম ১৪৭
১০. অশোক ও অর্জুনের বিবরণ ১৪৮
১১. ত্রিফলা গাছসমূহ ১৪৮
১২. ছাতিম ১৪৯
১৩. বাঁশের বৈশিষ্ট্য ১৫০

দ্বাদশ অধ্যায় : বিবিধ বনজ গাছের বৈশিষ্ট্য ১৬০—১৬৬
১. জারুল ১৬০
২. কদম ১৬০
৩. শিমুল ১৬০
৪. ঝাউ ১৬২
৫. পিতরাজ ১৬২
৬. বরুন ১৬৩
৭. প্রজাতির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ১৬৪
৮. মেহগনির দুটি প্রজাতি ১৬৫
৯. হিজল ও পানি হিজল ১৬৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় : কৃষি বন নার্সারি প্রযুক্তি ১৬৭—১৮৩
১. নার্সারিতে চারা উৎপাদনের সুবিধা ১৬৭
২. নার্সারি পরিকল্পনা ১৬৮
৩. চারা উৎপাদন ১৭২
৪. বীজতলা তৈরি ১৭৪
৫. বীজ পরীক্ষা ও প্রত্যয়ন ১৭৫
৬. পলিব্যাগের জন্য মাটি তৈরি ১৭৭
৭. পলিব্যাগে চারা ব্যবস্থাপনা ১৮০

চতুর্দশ অধ্যায় : চারা রোপণ ব্যবস্থাপনা ও বনজ বৃক্ষ উৎপাদন ১৮৪---২০২

১. চারা রোপণের ধাপ ১৮৪
২. বনজ বৃক্ষের সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা ১৯২
৩. বৃক্ষ ব্যবস্থাপনা : প্রুনিং ও ট্রেনিং ১৯৪
৪. বৃক্ষের ট্রেনিং ও ব্যবস্থাপনা ১৯৬
৫. বনজ বৃক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি : সেগুন ১৯৭
৬. শিশু ১৯৯
৭. মেহগনি ২০০

পঞ্চদশ অধ্যায় : বনজ বৃক্ষের সাধারণ পরিচিতি ২০৩---২৭১

১. চন্দনা কড়ই বা শ্বেতকড়ই ২০৩
২. শিরীষ বা কালি কড়ই ২০৩
৩. রক্ত চন্দন ২০৪
৪. তেলি কদম ২০৪
৫. খয়ের ২০৫
৬. আকাশমনি ২০৫
৭. ম্যানজিয়াম ২০৬
৮. মটর কড়ই বা খড়ি কড়ই বা অসীম গাছ ২০৬
৯. সোনালু বা বাঁদর লাঠি ২০৭
১০. অশোক ২০৭
১১. বিলাতী আমড়া ও উলটাকাটা ২০৮
১২. মেহগনি ২০৮
১৩. শাল ২০৯
১৪. গর্জন ২০৯
১৫. সেগুন ২১০
১৬. নাগেশ্বর ২১০
১৭. চাপালিশ ২১১
১৮. কাঁকড়া ২১১
১৯. বাইন ২১২
২০. জোনাকী জাম/কাঞ্চাইল বা উড়ি আম ২১২
২১. কেওড়া ২১৩
২২. বিলাতী জারুল ২১৩
২৩. গামার ২১৪
২৪. ইউক্যালিপ্টাস ২১৪
২৫. পাটকা বা মিটকি ২১৫
২৬. ছাতিম ২১৫
২৭. গাব বা দেশী গাব ২১৬
২৮. চম্পা বা স্বর্ণ চম্পা ২১৬
২৯. পানি হিজল ২১৭

৩০. পানিয়াল বা সুলতানা চম্পা ২১৭
৩১. বনজিয়াল বা চিকুন বা ধলসাগর ২১৮
৩২. বন নরঙ্গা বা ছগললেদা ২১৮
৩৩. রেইনট্রি বা রেন্ডি কড়ই ২১৯
৩৪. ইপিল ইপিল ২২০
৩৫. মিনজিরি ২২০
৩৬. গ্লিরিসিডিয়া ২২১
৩৭. ডালবার্জিয়া ২২১
৩৮. শিশু গাছ ২২২
৩৯. পালিতা মান্দার ২২২
৪০. খৈয়া বাবলা বা জিলাপি ২২৩
৪১. মিরাকল গাছ ২২৩
৪২. মলাকোনা গাছ বা সিলোন সাউ ২২৪
৪৩. ডেরিস গাছ ২২৫
৪৪. আমলকি ২২৫
৪৫. বাবলা ২২৬
৪৬. সজিনা ২২৬
৪৭. কৃষ্ণচূড়া ২২৭
৪৮. শিলকড়ই ২২৭
৪৯. তেঁতুল ২২৮
৫০. পানি মান্দার ২২৮
৫১. বিলিম্বি ২২৮
৫২. পলাশ বা কিংশুক ২২৯
৫৩. শ্বেতখয়ের বা খয়া বাবলা ২২৯
৫৪. সাকুয়া কড়ই বা শ্যাম সুন্দর ২৩০
৫৫. কড়ই ২৩০
৫৬. ঘোড়া নিম বা পাহাড়ী নিম ২৩১
৫৭. চালা বা উদাল ২৩১
৫৮. মহুয়া ২৩২
৫৯. কমেলা বা সুন্দরী ২৩২
৬০. অরা বা শয়লা ২৩৩
৬১. কুসুম ২৩৩
৬২. তুঁত ২৩৪
৬৩. অর্জুন ২৩৪
৬৪. বোতল ব্রাস ২৩৫
৬৫. নিম ২৩৫
৬৬. হরিতকি ২৩৫
৬৭. বহেরা ২৩৬
৬৮. কুমারীবুড়া বা নিম পিটালী ২৩৬
৬৯. দেবদারু ২৩৭

৭০. ঝাউ ২৩৭
৭১. শেফালি বা শিউলি ২৩৭
৭২. কদম ২৩৮
৭৩. শিমুল ২৩৮
৭৪. কানাইডিঙ্গি বা খোনা ২৩৯
৭৫. বকুল ২৩৯
৭৬. পেয়ারা ২৪০
৭৭. কাঁঠাল ২৪০
৭৮. কদবেল ২৪০
৭৯. সফেদা ২৪১
৮০. তাল ২৪১
৮১. বেল ২৪১
৮২. খেজুর ২৪২
৮৩. জাম্বুরা ২৪২
৮৪. আমড়া ২৪৩
৮৫. লটকন ২৪৩
৮৬. লিচু ২৪৩
৮৭. জাম ২৪৪
৮৮. কাজুবাদাম ২৪৪
৮৯. ডেউয়া বা ডেওফল ২৪৫
৯০. জলপাই ২৪৫
৯১. কামরাঙ্গা ২৪৬
৯২. কুল বরই ২৪৬
৯৩. ডালিম ২৪৭
৯৪. কেওড়া ২৪৭
৯৫. করমজা ২৪৮
৯৬. জিগা ২৪৮
৯৭. কৈয়া জাকল বা গানিয়ারী বা কাকিয়ারা ২৪৯
৯৮. পরশ বা পবশ পিপল ২৫০
৯৯. নিউলি গাছ বা মেরাগাছ ২৫০
১০০. কাঠ বাদাম ২৫১
১০১. রঙ্গি গাছ বা তুন ২৫১
১০২. ভাদি ২৫২
১০৩. পিটা বা বড় হরিনা ২৫২
১০৪. জিয়াপুতা ২৫৩
১০৫. চলতা ২৫৩
১০৬. নালুরা বা জামরুজ ২৫৪
১০৭. কুকুরচিতা ২৫৪
১০৮. বরুন বা মেরা ২৫৪
১০৯. এচরি বা ঢাকুয়া ২৫৪

১১০. হিজল ২৫৪
১১১. পিতরাজ রয়না বা বান্দিরাজ ২৫৫
১১২. কেপক বা বার্মা শিমুল ২৫৬
১১৩. বহাল বা কানউজা ২৫৬
১১৪. কুলাম ২৫৭
১১৫. পান বট ২৫৭
১১৬. বট ও ঝুরি বট ২৫৭
১১৭. জগ ডুমুর ২৫৮
১১৮. নারকেল ২৫৮
১১৯. ডুমুর ২৫৯
১২০. সুপারি ২৫৯
১২১. কলা ২৬০
১২২. আঁশ কলা ২৬০
১২৩. কনকাইচ বাঁশ ২৬০
১২৪. বরাক বা বৌড়া বাঁশ ২৬১
১২৫. মাকলা বাঁশ ২৬১
১২৬. তল্লা বাঁশ বা মিতিঙ্গা বাঁশ ২৬২
১২৭. বাসনি বাঁশ ২৬২
১২৮. ছোট মিতিঙ্গা বা তেতুঁয়া বাঁশ ২৬২
১২৯. মরাল বাঁশ ২৬৩
১৩০. কুরাজাভা বাঁশ বা জিওধা বাঁশ ২৬৩
১৩১. কেইট্টা বাঁশ ২৬৩
১৩২. ক্রোটালারিয়া ২৬৪
১৩৩. হেইরি ইন্ডিগো ২৬৪
১৩৪. ধইনচা ২৬৫
১৩৫. অড়হর ২৬৫
১৩৬. লেসপেজেডা ২৬৬
১৩৭. শোলা গাছ ২৬৬
১৩৮. পাতা করলা বা চৌকা শিম ২৬৭
১৩৯. আদা ২৬৭
১৪০. হলুদ ২৬৭
১৪১. সিবাত্রো গাছ ২৬৮
১৪২. কিডনি বিন বা কিডনি শিম ২৬৮
১৪৩. ডেসমোডিয়াম ২৬৯
১৪৪. নীলজাতীয় গাছ ২৬৯
১৪৫. গুচ্ছ শিম বা ক্লাস্টার বিন ২৬৯
১৪৬. ডেসম্যান্থাস ২৭০
১৪৭. সাইট্রোনেলা বা গন্ধ ঘাস ২৭০
১৪৮. এরারুট বার্লি ২৭০

ষোড়শ অধ্যায় : কৃষি বনায়নে রোগ ও পোকা দমন ব্যবস্থাপনা ২৭২—২৯৫

১. শিশুর উইল্ট বা পানামা রোগ ২৭২
২. শিশুর মূল পচা রোগ ২৭২
৩. ইউক্যালিপটাসের ড্যাম্পিং অফ ২৭২
৪. গামার ও নিম চারার কাণ্ড পঁচা রোগ ২৭২
৫. মেহগনির শাখা ছিদ্রক পোকার আক্রমণ ২৭৩
৬. আমে উইভিল পোকার আক্রমণ ২৭৩
৭. কলার সিগাটোকা রোগ ২৭৩
৮. কলার উইল্ট বা পানামা রোগ ২৭৩
৯. সুপারির কলেরা রোগ ২৭৪
১০. সুপারির ফল পচা রোগ ২৭৪
১১. সুপারির গোড়া পচা রোগ ২৭৪
১২. আমের পরজীবী বৃক্ষের আক্রমণঘটিত রোগ ২৭৪
১৩. কলার ফল পচা বা ঢেকি রোগ ২৭৪
১৪. কাঁঠালের মুচি পচা রোগ ২৭৫
১৫. লেবুর ডগা ছেঁকা রোগ ২৭৫
১৬. পেয়ারার ঢলে পড়া রোগ ২৭৬
১৭. পেয়ারার অ্যানথ্রাকনোজ রোগ ২৭৬
১৮. পেয়ারার কাণ্ড দুষ্টি রোগ ২৭৭
১৯. পেঁপের গোড়া পচা রোগ ২৭৭
২০. পেঁপের মোজাইক রোগ ২৭৭
২১. নারকেলের মুকুল পচা রোগ ২৭৭
২২. নারকেলের কাণ্ডক্ষত ২৭৮
২৩. অরণ্য বৃক্ষে কাণ্ডদুষ্টি রোগ ২৭৯
২৪. বাঁশের রোগ ২৭৯
২৫. পেঁপের চারা ধ্বসা ও কাণ্ড রোগ ২৮০
২৬. নারকেলের মাথা কাটা/গণ্ডার পোকা ২৮০
২৭. লেবুর আগা মরা রোগ ২৮০
২৮. লেবুর ক্ষত ২৮০
২৯. সুপারির মাথা মরা বা ভাইরে রোগ ২৮১
৩০. গাছের হার্ট পচা রোগ ২৮১
৩১. শালের হার্ট ছিদ্রক পোকা ২৮১
৩২. বাঁশের মাথা পচা রোগ ২৮১
৩৩. আনারসের কাণ্ড পচা রোগ ২৮১
৩৪. কাঁঠালের ফল পচা রোগ ২৮১

৩৫. লিচুর মাকড়/মাকড়সা ২৮২
৩৬. সেগুনের ক্যাংকার বা গ্রিবা রোগ ২৮২
৩৭. গামার গাছের নিষ্পত্রক পোকা ২৮২
৩৮. শিমুল শাখা ছিদ্রক ২৮২
৩৯. কেওড়া কাণ্ড ছিদ্রক পোকা ২৮২
৪০. নারকেলের উইপোকা ২৮৩
৪১. পেয়ারার সাদা শোষক পোকা ২৮৩
৪২. কুলের বিছাপোকা ২৮৩
৪৩. নারকেলের লাল কেড়ি পোকা ২৮৩
৪৪. কড়ই গাছের নিষ্পত্রক পোকা ২৮৩
৪৫. কড়ই পাতার রস শোষক পোকা ২৮৩
৪৬. পেয়ারার ক্যাংকার রোগ ২৮৩
৪৭. কুলের গুঁড়োচিতি রোগ ২৮৩
৪৮. বেলের মরচে পড়া রোগ ২৮৪
৪৯. ডালিমের পাতায় দাগ রোগ ২৮৪
৫০. আমলকি পাতার মরিচা পড়া রোগ ২৮৪
৫১. খেজুর পাতার দাগ রোগ ২৮৪
৫২. সুপারির গোড়া পচা রোগ ২৮৪
৫৩. সুপারির কুঁড়ি পচা রোগ ২৮৪
৫৪. আমড়ার আগা মরা রোগ ২৮৪
৫৫. কাজুবাদামের ঢলে পড়া রোগ ২৮৫
৫৬. ফলের পোকা মাকড় ও প্রতিকার ২৮৫
৫৭. সবজির পোকা দমন ২৮৬
৫৮. সবজির রোগ দমন ২৮৬
৫৯. কীটনাশক ব্যবহারে সাবধানতা ২৮৭
৬০. বৃক্ষের প্রধান প্রধান পোকামাকড় ২৮৭
৬১. নার্সারি কীটনাশক নির্বাচন ২৮৯
৬২. নার্সারি রোগ ২৮৯
৬৩. নার্সারি পোকামাকড় ২৯১
৬৪. নার্সারিতে পোকার প্রকারভেদ ২৯১
৬৫. ফল গাছের পোকা ও রোগ ২৯২

তথ্যপঞ্জি ২৯৭
পরিশিষ্ট — এক : কৃষি বনায়নে রোপণ উপযোগী গাছের নাম ও ব্যবহার ৩০১—৩৩০
পরিশিষ্ট — দুই : বাংলাদেশের কৃষিবনজ গাছের পরিচিতি ৩৩১—৩৩৬
কৃষি বনায়ন সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র ৩৩৭—৩৭৬

প্রথম অধ্যায়

বন ও পরিবেশের উপাদান

ভূমিকা

গাছপালা মানবজাতি ও পশুপাখির আদি আশ্রয়স্থল। কোনো এলাকায় গাছপালা দেখা গেলে ধারণা করাই সঙ্গত যে সেখানে মানব বসতি ও জীবজন্তু রয়েছে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে মানুষ বসতবাড়িতে ঘর বেঁধে বন পরিষ্কার করার ফলে বন মানুষের বসত থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল। এজন্যই বনকে ইংরেজিতে 'Forest' বলা হয়। ল্যাটিন *fores* শব্দ থেকে Forest শব্দের উৎপত্তি। অভিধান অনুসারে *fores* শব্দের ভাবার্থ হলো outside বা বহির্ভূত। এজন্য Forest শব্দের সাহায্যে এক অর্থে বসত এলাকা বহির্ভূত উদ্ভিদ প্রজাতির সমষ্টিকে বোঝায়।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বে বন ও বনভূমির ধারণা অনেক পাল্টে দিয়েছে। বন এখন আধুনিক সভ্যতার ধারক ও বাহক অর্থাৎ শহর থেকে অনেক দূরে কিন্তু প্রয়োজনে, ব্যবহারে ও ব্যবস্থাপনায় অনেক কাছে। এ বিশ্বে মানুষ না থাকলে গাছ ও বন্য জীবজন্তু টিকবে কিন্তু গাছ না থাকলে মানুষ ও জীবজন্তু টিকে থাকবে কি-না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। মানুষের প্রয়োজনেই দূরের বন, কাছের গাছ ও জীবজন্তু সবগুলোকেই লালন করতে হচ্ছে।

পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রের তলদেশ, হিম অঞ্চল থেকে উষ্ণ অঞ্চল, আর্দ্র অঞ্চল থেকে শুষ্ক অঞ্চল, মরুভূমি থেকে জলাভূমি সব স্থানে জন্মানোর উপযোগী উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে। বন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম ধারক ও বাহক। তাই হিসাব করে নির্ণয় করা হয়েছে যে, কোনো এলাকার মোট আয়তনের অন্তত এক-চতুর্থাংশ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। পৃথিবীর বনাঞ্চলকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়—

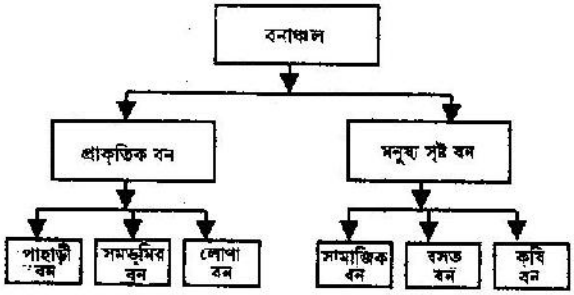

পরিবেশের উপাদান

পরিবেশ একটি ব্যাপক বিষয়। তাই এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন উপাদানের আশ্রয় নিয়েছেন। পৃথিবীর ভৌত ও জৈব উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট যে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থাকে পরিবেশ বলা যায়। সকল পারিবেশিক অবস্থাতেই ভৌত (জলবায়ু) ও জৈব (প্রাণী ও উদ্ভিদ) বিষয়ের সমন্বয়ে একাধিক উপাদানের সন্নিবেশ ঘটে। এসব বিবেচনায় পরিবেশের উপাদানগুলোকে বিভিন্নভাবে উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা যায়। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হলো।

পরিবেশ উপাদানের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাদানগুলো স্থান ও সময়ভিত্তিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এজন্য এখানে পরিবেশের সমন্বিত ক্রিয়াশীল উপাদানসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

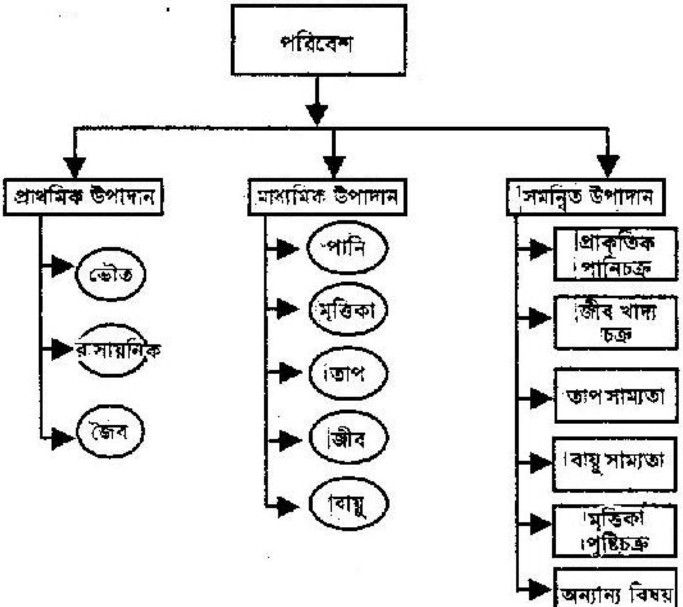

প্রাকৃতিক পানিচক্র

প্রাকৃতিকভাবে সর্বদা ঘটমান সাগর ও স্থলভূমির বাষ্পায়ন, বারিপাত, ভূগর্ভ সঞ্চয়ন, উপর প্রবাহ, চুয়ানী এবং সমুদ্রে জমা হওয়ার প্রক্রিয়াসমূহকে প্রাকৃতিক পানিচক্র বলা হয়। ইংরেজিতে পানিচক্রের সংজ্ঞা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়—

The natural hydrologic cycle may be defined as the processes occurring continuously in the form of transpiration, precipitation, underground storage, surface run off, leaching and accumulation in the sea and terrestrial systems.

প্রকৃতিতে পানির প্রাপ্তি, অপচয় ও চক্রায়ন পরিক্রমা পরিবেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের জৈবিক ও প্রাকৃতিক পারিবেশিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণে এই পানিচক্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিচে প্রাকৃতিক পানিচক্র পরিবেশে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগত অবদান উল্লেখ করা হলো।

পানিচক্রের পরিবেশ : বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভিদ

১. পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানি আসে।

২. বায়ুর আর্দ্রতা বেশি হলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

৩. উদ্ভিদ বেশি থাকলে বায়ুর আর্দ্রতা বেশি হয়।

বৃষ্টিপাতের পানি পুনরায় বাষ্পায়ন ও বাষ্পপ্রস্বেদনের (Evapotranspiration) মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এভাবে প্রাকৃতিক পানি চক্রায়িত হয়

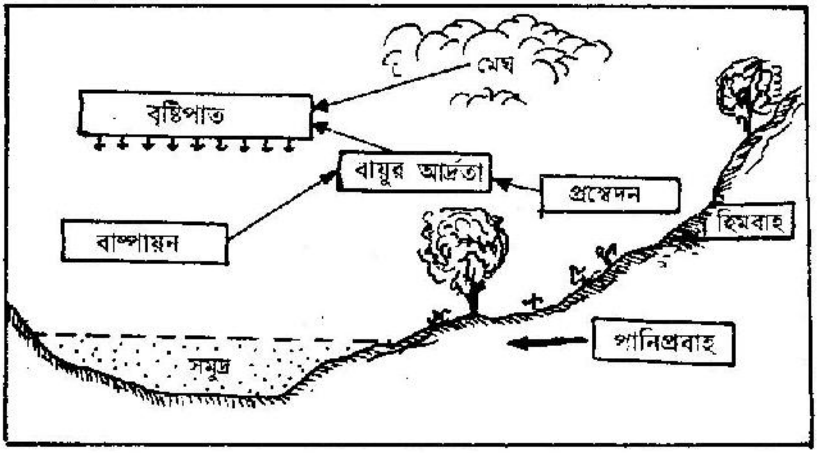

চিত্র ১.১ : প্রাকৃতিক পানি চক্র।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ না থাকলে বা কমে গেলে বৃষ্টিপাতে যে পরিমাণ পানি আসে, তার সবটুকু বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় না। এতে পর্যায়ক্রমে বিশ্বে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে।

ভূপৃষ্ঠে গাছ বা বনজ আবরণ না থাকলে বৃষ্টির পানি বাধাহীনভাবে অতি দ্রুত বেগে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় যা বসতবাড়ি, উঁচু জমি ও নির্মাণ সম্পূর্ণ ভেঙে নিয়ে যায়। ফলে ভূমির বেশ ক্ষয় হয়।

তাপসাম্যতা (Temperature equillibrium)

বায়ুমণ্ডল, মৃত্তিকা, পানি প্রভৃতিতে নিয়ত ঘটমান তাপ বিনিময়ের অনুপাত বা হারকে তাপ-সাম্যতা বলে (The rate or ratio of exchange of temperature within the atmosphere, soil and water system is known as temperature equilibrium.)।

ভূপৃষ্ঠের তাপসাম্যতার পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. উদ্ভিদের প্রস্বেদন বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে।

২. বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বায়ুমণ্ডলের তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং এই কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

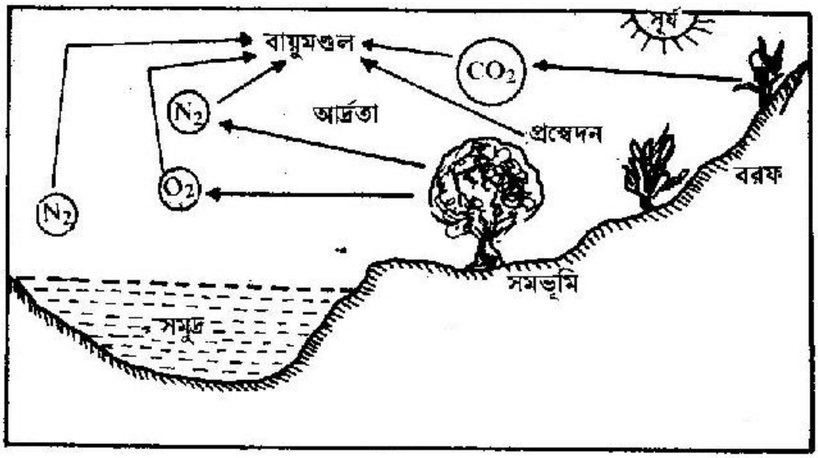

চিত্র ১.২ : তাপ সাম্যতা।

৪. বায়ুমণ্ডলীয় তাপ বরফগুলা ও সমুদ্রের পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছাড়ে এবং এভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন বা কার্বন ডাই-অক্সাইড অনুপাত ঠিক রাখার মাধ্যমে তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

বায়বীয় সাম্যতা (Gaseous equillibrium) ও পরিবেশ

বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকার মধ্যে বায়ুর বিনিময় ও গঠন অনুপাত পরিবর্তনের হারকে বায়বীয় সাম্যতা বলে (The rate of changes in ratioes of gases and its composition in the soil and atmospheric system is known as gaseous equilibrium)।

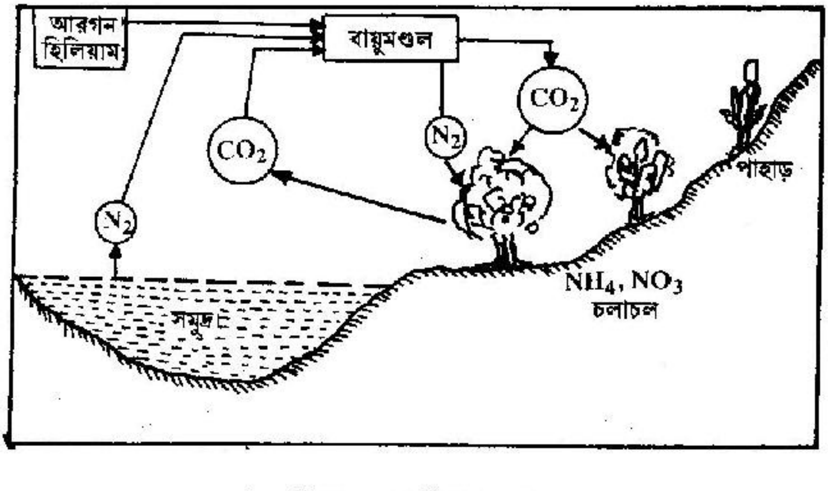

চিত্র ১.৩ : বায়বীয় সাম্যতা

বায়ুমণ্ডলে বায়বীয় সাম্যতার পরিবেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এতে উদ্ভিদের অবস্থান নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন শোষণ করে।

২. উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছাড়ে।

৩. মৃত্তিকা জৈব পদার্থ থেকে মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গ্যাস সৃষ্টি হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।

৪. উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমাণগত ভারসাম্য রক্ষা করে।

মৃত্তিকা পুষ্টিচক্র ও উদ্ভিদ

ভূপৃষ্ঠ ও মাটিতে বিদ্যমান সব পুষ্টি উপাদান চলাচল ও চক্রায়নে উদ্ভিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নিচে মৃত্তিকা পুষ্টিচক্র (Soil Nutirent Cycle) পরিবেশ ও উদ্ভিদের অবদানগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো—

১. লিগ্যুম উদ্ভিদ এবং শিকড় গুঁটি (root nodule) উৎপাদনের জন্য।

২. নীল সবুজ শ্যাওলা, ও অনেক অণুজীব সরাসরি বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন পরিশোষণ করে।

৩. উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটির গভীর থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে এবং তা মাটির উপরে দান করে।

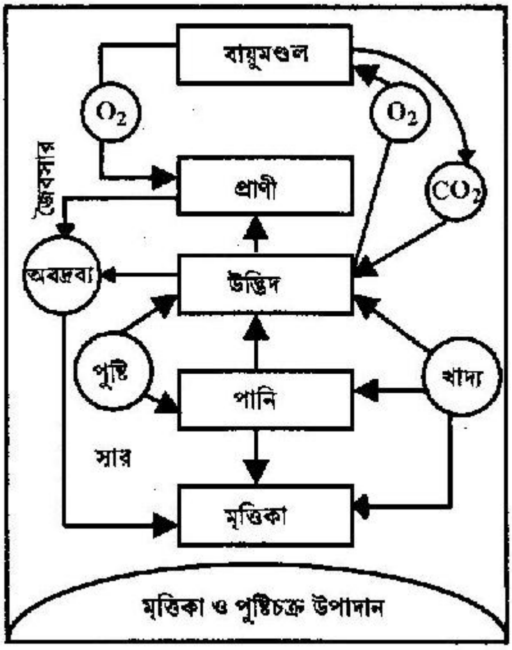

চিত্র ১.৪ : মৃত্তিকা ও পুষ্টিচক্র

৪. উদ্ভিদ মৃত্তিকা পানি ও মৃত্তিকা দ্রবণে ভারসাম্য রক্ষা করে।

৫. উদ্ভিদ মাটির উপরে পানি চলাচলের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মাটিতে পানির অনুপ্রবেশ হার বাড়ায়।

৬. উদ্ভিদ শিকড় মাটির গঠন উন্নত করে।

৭. উদ্ভিদ মৃত্তিকা পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে তাকে জৈব দ্রব্যে রূপান্তরিত করে।

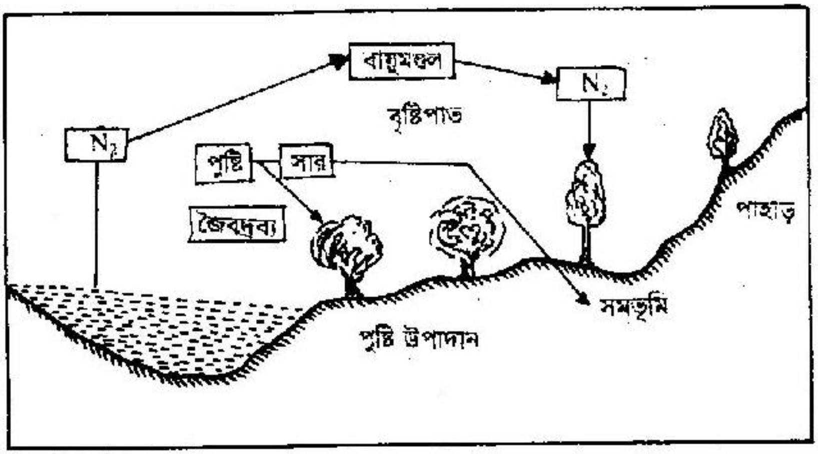

চিত্র ১.৫ : মৃত্তিকা ও পুষ্টিচক্র পরিবেশ।

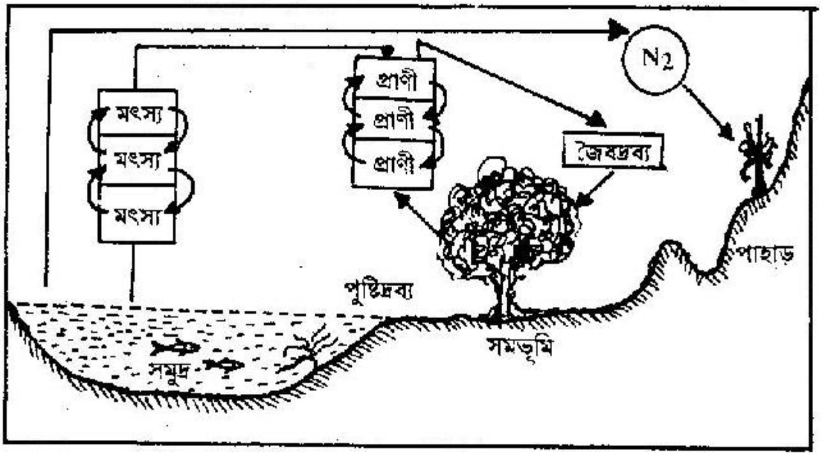

চিত্র ১.৬ : পরিবেশ চক্র ও জীবজগত।

৮. উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক উপাদানসমূহ মাটিতে পরিশোষণযোগ্য আকারে রূপান্তরিত হয়।

৯. অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদান শোষণের মাধ্যমে মাটি ও উদ্ভিদ ভূ-পৃষ্ঠে পুষ্টিচক্রের ভারসাম্য রক্ষা করে।

পরিবেশ চক্র ও জীবজগত

এ বিশ্বে খাদ্য ও অন্যান্য সম্পর্কের কারণে উদ্ভিদ, প্রাণীসহ সকল জীব একে অন্যের সাথে জড়িত। মৃত্তিকা, পানি ও বায়ুমণ্ডল, বায়ুমণ্ডলীয় তাপ ও বায়বীয় অবস্থা জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে. জীবজগতের এই সম্পর্কের কোনো একটি অংশ বিঘ্নিত হলে তা সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পরিবেশে বিপর্যয় বয়ে আনবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবেশের উপর বনের প্রভাব ও পরিবেশ দূষণ প্রতিকার

সংজ্ঞা

পরিবেশ বিষয়টির পরিধি এত বিস্তৃত যে এর বিষয়বস্তু ও অর্থগতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া জটিল। এই অধ্যায়ের আলোচনার সুবিধার্থে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো :

পার্থিব জলবায়ু, আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতিগত জৈব ও ভৌত উপাদানসমূহের যৌথ প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবেশ বলা যায় অর্থাৎ (The surrounding situation of the earth reflecting the joint effects and interrelations of climate, weather and other bio-physical factors may be termed as environment)।

পরিবেশের উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুসারে এর প্রাথমিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে—

১. জলবায়ু ও আবহাওয়া : ভৌত ও প্রাকৃতিক উপাদান।

২. মৃত্তিকা ও ভূতত্ত্ব : ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান।

৩. জীবজগত (উদ্ভিদজগত, প্রাণিজগত) : জৈব ও রাসায়নিক উপাদান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে জীবজগত প্রথম দুটি উপাদান দিয়ে সরাসরি প্রভাবিত হয়, বিশেষ করে এক্ষেত্রে উদ্ভিদজগত এক ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

পরিবেশ চক্রে উদ্ভিদজগতের অবদান

১. গাছ বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে।

২. গাছ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন সরবরাহ করে।

৩. গাছ প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪. গাছ মাটিতে জৈব পদার্থ সংযোজন করে মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

৫. গাছ বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প বাড়িয়ে বৃষ্টিপাত বাড়ায়।

৬. গাছ ভূমিক্ষয়ের হার কমায়।

৭. গাছ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ঘরবাড়ি ও সম্পদ রক্ষা করে।

৮. গাছ ধূলিঝড় হ্রাসের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করে।

৯. গাছ প্রাণিজগতের খাদ্য শিকল (food chain) ঠিক রাখে।

১০. জলজ গাছ মৎস্য সম্পদ বাড়ায়।

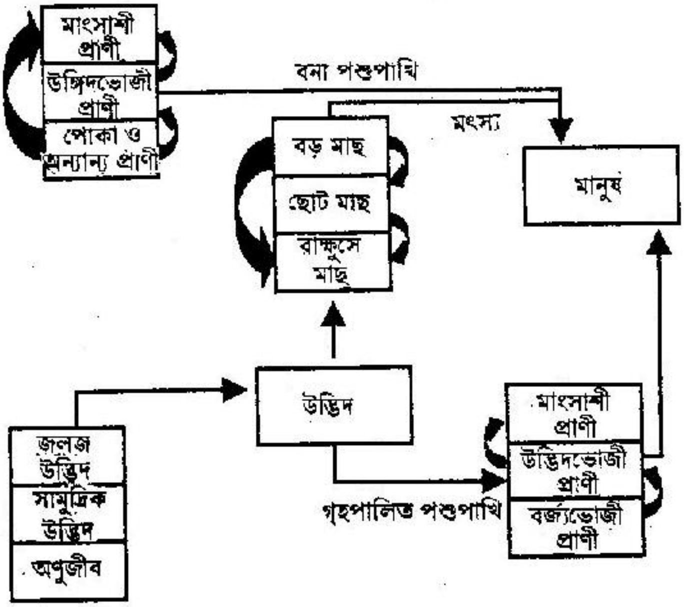

চিত্র ২.১ : জীব ও খাদ্যচক্র।

পরিবেশের উপর উদ্ভিদ তথা বনের ব্যাপক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশে পরিবেশ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে এবং এই মন্ত্রণালয়ের নাম দেওয়া হয়েছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পরিবেশ আইন, বনবিধি এবং বন্য প্রাণী বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। সাথে সাথে পরিবেশ দূষণের কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে পরিবেশ ও বন–বিধিসমূহ, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকারসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

বনের পরিবেশগত তাৎপর্য

যে কোনো এলাকার পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫% বনভূমি থাকা অত্যাবশ্যক। বনের পরিবেশগত তাৎপর্যের প্রধান প্রধান বিষয় হলো—

ক) ভূমিক্ষয় রোধ

১. বনজ আচ্ছাদন মাটিকে প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় থেকে রক্ষা করে।

২. গাছের শিকড় মাটি আঁকড়ে রাখে।

৩. বনে গাছের আচ্ছাদন থাকায় বৃষ্টি সরাসরি মাটিতে আঘাত করতে পারে না।

৪. বন পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস (Land slip) রোধ করে।

৫. বন মাটির উপরে বায়ু প্রবাহ হ্রাস করে।

৬. বন মাটিতে পানির অনুপ্রবেশ বাড়ায়।

৩. মৃত্তিকাঘটিত কারণ

মাটির ভূতাত্ত্বিক ক্ষয় (Geological erosion), ক্ষয়দ্রব্য অপসারণ, চুয়ানি, পরিবহণ প্রভৃতি নানাভাবে পরিবেশের অবনতি ঘটায়।

৪. প্রাকৃতিক পানিচক্র

বরফ জমা ও গলা, পানিতল, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতির প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে নানাভাবে পরিবেশ বিনষ্টের কারণ হয়।

পরিবেশ দূষণের উপরোক্ত কারণগুলো প্রাকৃতিকভাবে আন্তঃক্রিয়াশীল এবং একটির সাথে আরেকটি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। নিচের প্রাকৃতিক চক্রের সাহায্যে তা বোঝানো যেতে পারে।

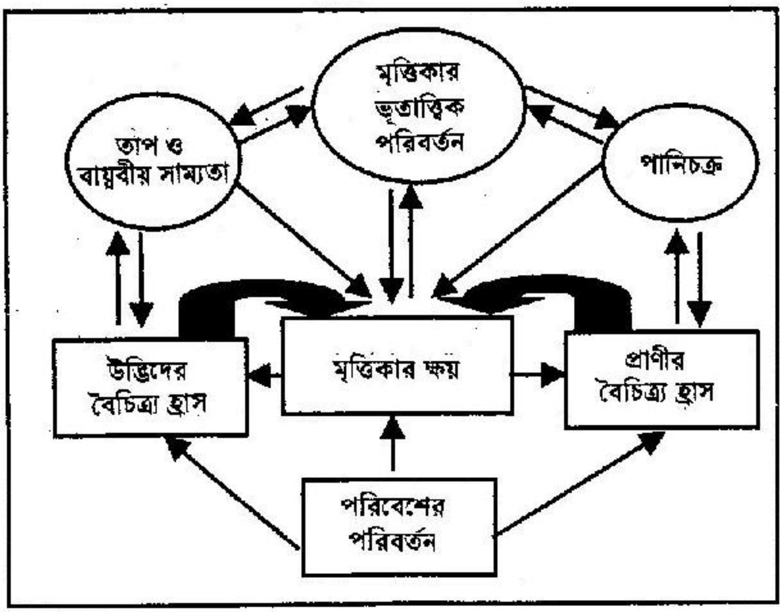

পরিবেশ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণ

সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং এই বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের ব্যবস্থা চাহিদা পরিপূরণ করতে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নিচে পরিবেশ দূষণের মানব–সৃষ্ট কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

বিস্তারিত বর্ণনার সাথে বায়ু, পানি, তাপ বিকিরণ ইত্যাদি দূষণ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. **শিল্প-কারখানার বর্জ্য :** শিল্পকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য নদীতে ও যেখানে সেখানে ফেলে পরিবেশ দূষিত করা হচ্ছে।

২. **বন উজাড় :** বনজ সম্পদের উজাড় পরিবেশ বিনষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ। বন কেটে ফেলা, নতুন বন সৃষ্টি না করা প্রভৃতি প্রধান কারণ।

৪. যানবাহন ও জ্বালানি

যানবাহন, জ্বালানি, ধুয়া, শব্দ, প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

৫. কোয়ারেন্টাইন

দেশ বিদেশে আমদানি রপ্তানি হওয়া গাছ ও প্রাণিজ দ্রব্য স্থানান্তরে কোয়ারেন্টাইন আইন রয়েছে।

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের কারণ

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের কারণ বহুবিধ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের ব্যবহৃত সকল দ্রব্য ও কর্মকাণ্ড যা স্বাভাবিক জীবনকাল বিঘ্নিত করে সেগুলোই পরিবেশ দূষণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পরিবেশ দূষণের দ্রব্য, প্রক্রিয়া ও ক্ষতির পরিমাণ প্রভৃতির ভিত্তিতে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট কারণসমূহকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। তবে সবগুলোর সমন্বয়ে একটি সহজ শ্রেণিকরণ সারণি নিচে করা হলো।

জৈবিক কারণ

উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিশেষের সংখ্যা হ্রাস ও বিলুপ্তির কারণে জীবজগতের খাদ্য শিকল বিঘ্নিত হয়। বিশ্বের হাজার হাজার জীব প্রজাতি সনাক্ত ও অসনাক্তকৃত পর্যায়ে এই প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়েছে এবং হচ্ছে।

জৈবিক দূষণে আরও রয়েছে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, ফুলের রেণু ইত্যাদি জৈবিক উৎস থেকে সংঘটিত নানাবিধ রোগ বিস্তারজনিত সমস্যা।

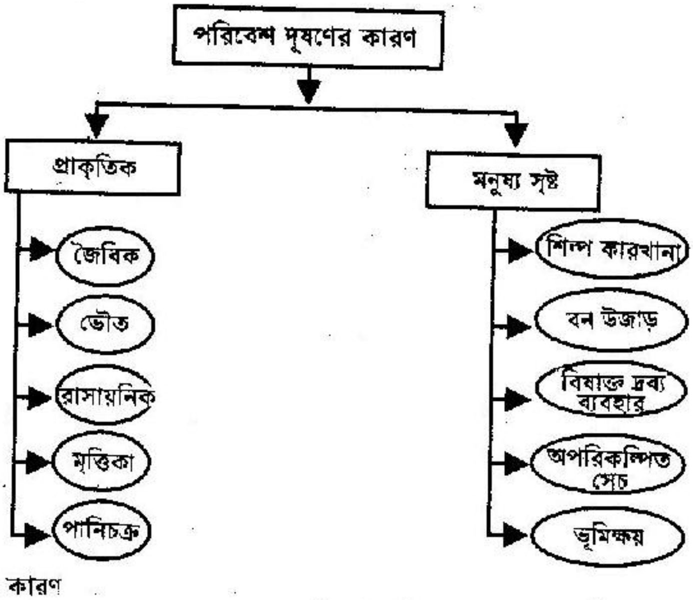

২. ভৌত কারণ

বায়ুমণ্ডল তথা জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, বজ্রপাত প্রভৃতি নানাভাবে পরিবেশ বিঘ্নিত করে।

৩. **বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার :** অতিরিক্ত মাত্রায় সার, কীটনাশক, রোগনাশক ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার, ধোঁয়া ও শব্দ উৎপাদন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছেছে।

৪. **অপরিকল্পিত সেচ :** সেচের কাজে অতিরিক্ত হারে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার তাপ বৃদ্ধির কারণে বরফ গলা ও বন্যা তথা অনিয়ন্ত্রিত সেচ ও নিকাশ পরিবেশ বিনষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ।

৫. **ভূমিক্ষয় :** পলি পতন, ভূমি, প্রভৃতি ব্যাপকভাবে পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে।

পরিবেশ বিনষ্টের উপরের কারণগুলোও বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এর একটি কারণের সাথে আরেকটি কারণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিচের চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যায়।

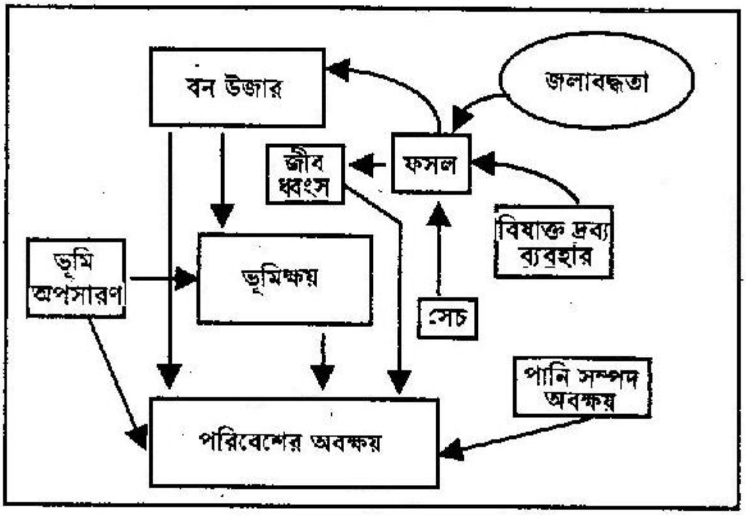

পরিবেশ দূষণ প্রতিকারের উপায়

যুগের পরিবর্তন এবং শিল্প প্রসারের কারণে পরিবেশ দূষণ বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতা লাভ করেছে। সেজন্য পরিবেশ দূষণ প্রতিকার ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দরকার।

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ ক্রিয়া দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না নিলে জীবনযাপন হুমকির সম্মুখীন হবে। এখানে সংক্ষেপে পরিবেশ দূষণ প্রতিকারের উপায়সমূহ উল্লেখ করা হলো।

১. বনভূমি ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল পুনর্বাসন।
২. সামাজিক বন ও কৃষি বনায়ন উৎসাহিতকরণ।

৩. মৃত্তিকা ভৌত গুণাবলী ও উপকূলীয় ভূমি উন্নয়ন।

৪. শিল্প বর্জ্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা।

৫. বরেন্দ্র, মধুপুর ও উপকূলীয় ভূমি ও মৃত্তিকা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন।

৬. সার ও পেস্টিসাইড এবং সেচ নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর আইন প্রণয়ন ও এর সফল বাস্তবায়ন।

৭. ভূমিধস ও মৃত্তিকার অবক্ষয় (degradation) রোধ।

৮. পাহাড়ে ঝুম চাষ নিরুৎসাহিতকরণ।

৯. ভেজাল নিয়ন্ত্রণে BSTI এর কার্যাবলী জোরদারকরণ।

১০. বসত বন ও খামার পদ্ধতির উন্নয়ন।

১১. সামাজিক বনায়নের জন্য আইন প্রণয়ন।

১২. বন্য প্রাণী বিধি আরও যুগোপযোগীকরণ

১৩. যানবাহন ও জ্বালানি ব্যবহারের মান নিয়ন্ত্রণ।

১৪. ভূ-গর্ভস্থ পানি, গ্যাস, আকরিক ও বনজ সম্পদ ব্যবহারে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন।

১৫. নগর আবর্জনা দিয়ে কমপোস্ট উৎপাদন।

১৬. জৈব কৃষি খামারের প্রসার উৎসাহিতকরণ।

১৭. কৃত্রিম পলিথিন, প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, গ্লাস উল প্রভৃতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

১৮. পরিকল্পিত সেচ ও বন্যা বাঁধ তৈরি।

১৯. নিয়মিত নদীনালা খনন।

২০. পরিবেশ বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটানো।

পরিবেশ উপাদানের আন্তঃক্রিয়া

১. **মানুষ :** লোকসংখ্যা, লোক সম্পদ, আচরণ, চাহিদা, সরবরাহ, ভোগ, ব্যবসা।

২. **উদ্ভিদ :** প্রজাতি, জাত, বৃদ্ধি মৌসুম, পরিমাণগত ও গুণগত

৩. **অন্যান্য প্রাণী :** মাংসাশী, তৃণভোজী, মৎস্য ও পশু খাদ্যচক্র জীবন নির্বাহ কার্যাবলী।

৪. **অজীব দ্রব্য :** বায়ু, সূর্যালোক, আলো, তাপ, শক্তি, বৃষ্টিপাত, ভূমিজ, পানি সম্পদ ও মৃত্তিকা।

৫. **ভৌত উপাদান :** কৃষি জলবায়ু, মৃত্তিকা, সেচ-নিকাশ

৬. **জৈবিক উপাদান :** ফসল, বৃক্ষ, প্রাণী, অণুজীব।

৭. **সামাজিক :** লোকসংখ্যা, শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো।

পরিবেশ উপাদানের সমস্যা ও সমাধান

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্ট সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হলো—

১. মানুষ

	সমস্যা	সমাধান
১.	লোক সংখ্যা বৃদ্ধি	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
২.	আয় হ্রাস	আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
৩.	অনাচার বৃদ্ধি	সামাজিক অনাচার রোধ
৪.	অসম খাদ্য	সুষম খাদ্য প্রদান
৫.	বেকারত্ব	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

২. জীব

	সমস্যা	সমাধান
১.	সংক্রামক রোগ বৃদ্ধি	সংক্রামক রোগ রোধ
২.	কাঙ্ক্ষিত প্রজাতি ও জাতের অভাব	উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য বৃদ্ধি
৩.	উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া	উৎপাদনশীলতা বাড়ানো
৪.	উদ্ভিদ প্রাণী সংখ্যাগত বিষম অবস্থা	উদ্ভিদ প্রাণীর সাম্য রক্ষা
৫.	কৌলিক দ্রব্যের অবক্ষয়	প্রজননের মাধ্যমে নতুন নতুন জাতের সৃষ্টি

৩. প্রাকৃতিক

	সমস্যা	সমাধান
১.	মৃত্তিকা অনুর্বরতা	মৃত্তিকা সংরক্ষণ
২.	বন্যার প্রাদুর্ভাব	বন্যা প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা
৩.	খরা	সেচ সম্প্রসারণ
৪.	মৃত্তিকার উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া	ভূমি উৎপাদনশীলতা বাড়ানো
৫.	ভূমিক্ষয় ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি	ভূমি ক্ষয় ও লবণাক্ততা রোধ।

খামার পরিবেশ

কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা ও বাস্তু পদ্ধতির রূপান্তর ও সমন্বয়কে সাধারণত খামার পরিবেশ বলা হয় (The integration and transformation of improved agriculture practice and Ecosystem for the purpose of agricultural production or increasing production is usually known as Farm Environment)।

৭. বন ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণক্ষমতা বাড়ায়।
৮. বন নদ-নদীর পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে পলি পতন কমায়।
৯. বন ঝর্ণার পানিতে পলির পরিমাণ কমায়।
১০. বনাঞ্চল মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ করে ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়।

খ) বৃষ্টিপাত ঘটানো

১. বনভূমি গাছের প্রস্বেদন বাড়ায়।
২. বন সংলগ্ন এলাকার বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে।
৩. বন বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে আবহাওয়ায় চরম ভাবাপন্নতা হ্রাস করে।
৪. বনাঞ্চলের বিস্তৃতি এলাকায় বৃষ্টিপাত ঘটায়।
৫. ঘন নিবিড় বনাঞ্চল এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ায়।

গ) প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ

১. বনাঞ্চল বায়ু প্রবাহের গতিরোধ করে।
২. বনাঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ কমায়।
৩. বনাঞ্চল ঝড়-ঝঞ্জা ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতির হ্রাস করে।

ঘ) বন্য প্রাণী আশ্রয় দেয়

১. বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য বনাঞ্চল উত্তম।
২. বনাঞ্চল বন্য প্রাণীর খাদ্য শিকার ঠিক রাখে।
৩. বনাঞ্চলে বন্য প্রাণী নিরাপদ বোধ করে।

বাংলাদেশের পরিবেশ আইন

বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরিবেশ আইনের আওতাধীন বিভিন্ন বিষয় হচ্ছে—

১. রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত আইন-কানুন

মৃত্তিকা, গাছ, প্রাণী প্রভৃতির জন্য ক্ষতিকর কোনো রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি ও ব্যবহার করলে এবং তাতে সরকারি অনুমোদন না দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (BSTI) কর্তৃক বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষা করে দেয়া মতামতের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে শিল্প রাসায়নিক দ্রব্য, সার, আপদনাশক (যেমন— কীটনাশক), ওষুধ প্রভৃতি।

২. বনজ অনুপ্রবেশ ও উজাড়

সরকারি অনুমতি ব্যতীত প্রাকৃতিক ও জনসম্পত্তির বনজ সম্পদ কাটা যায় না, প্রাণী হত্যা বা শিকার করা যায় না। এতদসংক্রান্ত আইন বন বিভাগ কর্তৃক কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা হয়।

৩. শিল্পবর্জ্য নিক্ষেপ

শিল্প কারখানার ক্ষতিকর বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলে পরিবেশ বিনষ্ট করা যায় না। কেউ এ ধরনের উদ্যোগ নিলে আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বন বিভাগে এজন্য নির্দিষ্ট আইন রয়েছে।

খামার পরিবেশের উপাদান

১. ভৌত উপাদান।
২. জৈবিক উপাদান।
৩. আর্থ-সামাজিক উপাদান।

স্থায়িত্বশীল খামারের বৈশিষ্ট্য

১. উন্নত উৎপাদন।
২. উৎপাদনের স্থিতিশীলতা।
৩. আয় সাম্যতা বা নিশ্চয়তা
৪. ঝুঁকি সহনশীলতা

খামারের পারিবেশিক আন্তঃক্রিয়া

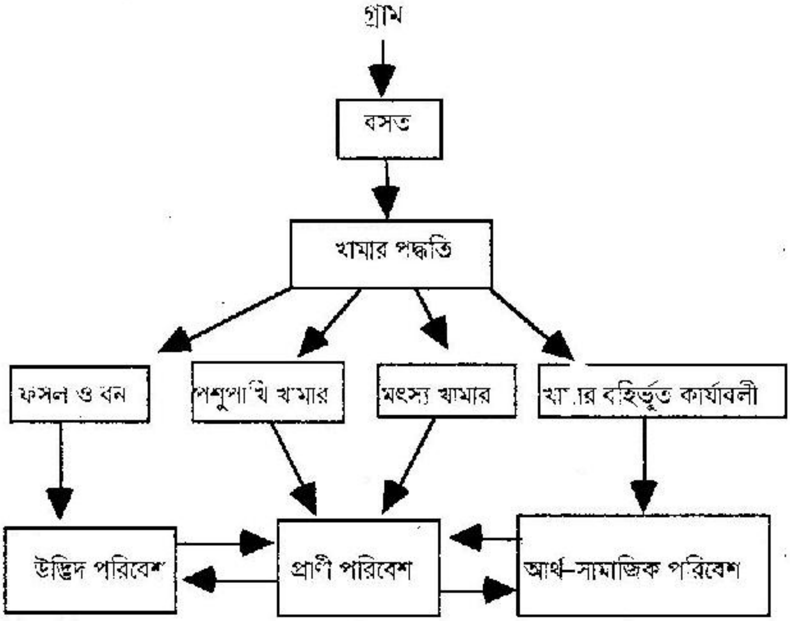

খামার পদ্ধতির প্রধান প্রধান উপপদ্ধতি (Subsuptem)

উপপদ্ধতি	উৎপাদন উদ্দেশ্য
মাঠ ফসল উদ্ভিদ	খাদ্য, অর্থ, জ্বালানি
বনজ বৃক্ষ	কাঠ, জ্বালানি, অর্থ, জ্বালানি
সবজি ও মসলা	খাদ্য অর্থ
পশু-পাখি	খাদ্য ও অর্থ
মৎস্য	খাদ্য ও অর্থ
কুটির শিল্প	কর্মসংস্থান, অর্থ

তৃতীয় অধ্যায়

বন ও বনের গুরুত্ব

সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বৃহদাকার গাছপালা দিয়ে আচ্ছাদিত স্থান, যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বন্য পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ বসবাস করতে পারে তাকে বন বলা হয় (The vast area covered by big trees where the wild animals, birds and insects can leave is usually termed as a forest)।

গাছপালা, বন্য পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ও জীবের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক বনজ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বনে বড় বড় গাছ-পালা থাকলে ফাঁকে ফাঁকে অনেক ঝোপ-ঝাড় ও গুল্মলতা থাকে। বনে নাম জানা অজানা অসংখ্য ধরনের বৃক্ষরাজি বিদ্যমান থাকে।

অতএব সংজ্ঞা অনুসারে বনের বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো —

১। বৃহদাকার বৃক্ষরাজি থাকবে

২। এলাকা আয়তনে অনেক বড় হবে

৩। ঝোপ-ঝাড় থাকবে

৪। লতানো গাছ থাকবে

৫। জমি উঁচু-নিচু, শুষ্ক ও জলাবদ্ধ থাকতে পারে

৬। উদ্ভিদের স্তরবিন্যাস থাকবে

৭। প্রাণীর খাদ্যস্তর, খাদ্যশিকল ও আন্তঃক্রিয়া থাকবে

৮। অসংখ্য ধরনের বন্য প্রাণী, পাখি, কীট-পতঙ্গ, আগাছা থাকে

বিশ্ব সম্পদ, পরিবেশ ও উপকারিতার বিবেচনায় বনের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নে বনের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের উন্নয়ন চিন্তা ধারার উন্মেষকালেই বনের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। আদি মানুষের প্রাথমিক আশ্রয় ছিল বন। খাদ্য, আবাস ও জ্বালানিসহ শিকার যন্ত্র নিজের রক্ষা সবকিছুতেই বনজ দ্রব্যের ব্যবহার বাড়তে থাকে। সেই আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানব জীবনে বন ও বনজ দ্রব্যের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে।

ব্যবহার ও অবদানের ভিত্তিতে বন ও সবুজ দ্রব্যের গুরুত্ব নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করা যায় —

১. অর্থনৈতিক গুরুত্ব

২. পরিবেশগত গুরুত্ব

৩. জীব বৈচিত্র্যগত গুরুত্ব

৪. বিনোদনগত গুরুত্ব

৫. বিবিধ গুরুত্ব

বিশ্বের সকল প্রকার বনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত গুরুত্ব রয়েছে।

সৃষ্টির উৎস অনুসারে বন প্রধানত দুই প্রকার। যথা– প্রাকৃতিক বন ও মানুষের তৈরি বন। মানুষের তৈরি বনাঞ্চলকে কৃত্রিম বনও বলা হয়। যে বনাঞ্চল আগে থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে অর্থাৎ মানুষের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়াই গড়ে উঠেছে এবং বিরাজমান রয়েছে তাকে প্রাকৃতিক বন (Natural forest) বলে। যেমন– খুলনার সুন্দরবন, গাজীপুর ও মধুপুরের শালবন। শত শত বছর আগে প্রাকৃতিকভাবে এদেশে সুন্দরবন, শালবন, পাহাড়ি বন প্রভৃতি তৈরি হয়েছে। অপরদিকে বিভিন্ন এলাকায় বা স্থানে নতুনভাবে গাছ লাগিয়ে যে বন তৈরি করা হয়েছে তাকে মানুষের তৈরি বন (Man made forest) বলে। যেমন– চট্টগ্রামের সেগুন বন, দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় কেওড়া বন প্রভৃতি। বর্তমান যুগে মানুষের তৈরি বন প্রসারের উদ্যোগ বনের গুরুত্ব নির্দেশ করে। কারণ মানুষের চাহিদা পরিপূরণে বনের অবদান এতই বেড়ে গেছে যে কেবল প্রাকৃতিক বন থেকে তা সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিশ্বের মানব জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাকৃতিক বনের পাশাপাশি নতুন নতুন বন সৃষ্টি করার অত্যাবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। বনের গুরুত্ব যদিও অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে পরিমাপ করা সম্ভব, তবুও বনের এমন কতকগুলো গুরুত্ব রয়েছে যার প্রকৃত গুরুত্ব অর্থনৈতিক তুল্য মানের অনেক বেশি। যেমন– পরিবেশগত গুরুত্ব, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি। সার্বিক বিবেচনায় বিশ্বে মানুষ ও অন্যান্য জীব প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা, উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বন ও বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। সংক্ষেপে বনের গুরুত্বকে নিচের সারণির সাহায্যে উল্লেখ করা হলো।

বনের গুরুত্ব

অর্থনৈতিক গুরুত্ব
* কাঠ
* বাঁশ
* শিল্পের কাঁচামাল
* কুটির শিল্প
* ভেষজ দ্রব্য
* মোম ও মধু

পরিবেশগত গুরুত্ব
* ভূমিক্ষয় রোধ
* বৃষ্টিপাত ঘটানো
* সুষম জলবায়ু রক্ষা
* মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি
* প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ
* জীব জন্তুর আশ্রয়

জীব বৈচিত্র্যগত গুরুত্ব
* উদ্ভিদ প্রজাতি রক্ষা
* প্রাণী প্রজাতি রক্ষা
* কীট–পতঙ্গ প্রজাতি রক্ষা
* অণুজীব রক্ষা
* প্রাণীর খাদ্য চক্র অব্যাহত রাখা
* জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা

বিনোদনগত গুরুত্ব
* বন ভোজন
* সফর
* বিশ্রাম
* নির্মল পরিবেশ
* বিজ্ঞান সাধনা
* ফুল ও সুদৃশ্য গাছ

বিবিধ গুরুত্ব
* সামাজিক গুরুত্ব
* কর্মসংস্থান
* কারু শিল্প
* আদি জীব
* ইতিহাস
* অন্যান্য গুরুত্ব

বনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মানুষের নাগরিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বন ও বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসীম। বন থেকে অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করা হয় যার যথেষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে এগুলো বন থেকে সংগ্রহ না করলে জীবনযাপনের অত্যাবশ্যক চাহিদা উপকরণ হিসেবে সেগুলো নগদ মূল্যে কিনতে হতো। এসব বনদ্রব্যের একটি সারণি নিচে দেওয়া হলো:

বনাঞ্চলের গাছপালার নাম ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	কাঠ ও আসবাব-পত্র	পশু খাদ্য	জ্বালানি	ফল	ওষধি	বাহারি ফুল বিশিষ্ট	কপিস গুণ
বহেরা	*Terminalia bellerica*	—	+	+	+	+	—	—
বাইন	*Avicennia officinalis*	+	—	+	—	—	—	—
বাবলা	*Acacia arabica*	+	+	+	—	—	—	—
বেল	*Aegle marmelos*	—	+	+	+	+	+	—
মহুয়া	*Madhuca indica*	+	—	+	+	+	+	—
মান্দার	*Erythrina indica*	—	—	+	—	—	+	—
মেহগনি	*Swietenia mahagoni*	+	—	+	—	—	—	—
মিনজিরি	*Cassia siamea*	+	—	+	—	—	+	—
লিচু	*Litchi chinensis*	+	—	+	+	+	—	—
রেইনট্রি	*Samania saman*	+	+	+	—	—	+	+
শাল	*Shorea robusta*	+	—	+	+	+	—	—
শেফালী (শিউলি)	*Nyctanthes arbortristis*	—	—	—	—	+	+	—
শিরিষ	*Albizia lebbek*	+	+	+	—	—	+	+
শিমুল	*Salmalia malabaricum*	—	—	—	+	—	+	—
শিশু	*Daldergia sissoo*	—	+	+	—	—	—	+
শিলকড়ই	*Albizia procera*	+	+	+	+	—	—	—
সফেদা	*Achras sapota*	—	—	—	—	+	—	—
সজিনা	*Moringa oleifera*	—	—	—	—	+	—	—
সেগুন	*Tectona grandis*	+	—	+	—	—	—	+

সোনালু	*Cassia fistula*	+	—	+	—	+	+	—
সুপারি	*Areca catechu*	—	—	—	—	+	—	—
হরিতকি	*Terminalia chebola*	+	—	-	-	+	—	—
হিজল	*Barringtinaia acrrangula*	+	—	+	—	+	+	—
গাব	*Diospyros embryopteris*	—	—	—	—	—	—	—
চম্পাফুল	*Michelia champaca*	+	—	+	—	+	+	-
চাপালিশ	*Artocarpus chaplasha*	+	+	+	+	+	—	+
চালিতা	*Dilencia indica*	+	+	+	+	+	—	—
ছাতিম/ ছাতিয়ান	*Alstonia scholaris*	+	—	—	—	+	—	—
জলপাই	*Elacocarpus floribundus*	—	—	—	+	-	—	—
জারুল	*Lagerstroemia flosreginae*	+	—	+	—	—	+	-
জাম্বুরা (বাতাবি লেবু)	*Citrus grandis*	+	+	+	+	+	—	—
জিওল-ভাদি	*Odina wodier*	+	—	-	—	+	—	+
ঝাউ	*Casuarina litorea*	—	—	+	—	—	—	—
তাল	*Borassus flabelliformis*	—	+	+	+	—	—	—
তেঁতুল	*Tamarindus indica*	+	—	+	+	+	—	—
তেজপাতা	*Cinnamomum tamala*	—	—	+	—	+	—	—
তুঁত	*Morus alba*	—	—	-	+	-	—	+
দেবদারু	*Polyalthea longifolia*	+	—	+	—	—	—	—
নাগেশ্বর	*Mesua-ferrea*	-	—	+	—	+	+	—
নারকেল	*Cocos nucifera*	-	—	+	+	—	—	—
নিম	*Azadirachta indica*	+	—	+	—	+	—	—
পলাশ	*Butea monosperma*	—	—	+	—	—	+	—

পেয়ারা	*Psidium guajava*	—	—	+	+	+	—	+
পুন্নাল	*Calophyllum inophyllum*	+	—	+	—	—	—	—
বকুল	*Mimusops hexandra*	—	—	+	—	+	+	—
বকাইন (ঘোড়া নিম)	*Melia azedarachta*	–	—	+	—	—	—	—
বটলব্রাশ	*Callistemon lanceolatus*	—	—	—	—	—	+	—
অর্জুন	*Terminalia arjuna*	-	—	+	+	+	+	+
অশোক	*Saraca indica*	—	—	—	—	+	+	—
আতা (শরিফা)	*Annona squamosa*	—	—	+	+	+	—	—
আকাশমনি	*Acacia auriculiformis*	+	?	+	—	—	+	?
আম	*Mangifera indica*	+	+	+	+	+	+	—
আমড়া	*Spodias pinnata*	—	—	—	+	+	—	—
আমলকি	*Emblica officinalis*	—	+	+	+	+	—	—
ইউক্যালিপটাস	*Spondias dulcis*	+	—	+	—	+	—	-
ইপিল ইপিল	*Leucaena leucocephala*	+	–	+	—	—	—	–
কদম	*Anthocephalus chinensis*	+	—	—	—	+	+	—
কদবেল	*Feronia lemonia*	–	—	+	+	+	—	—
কাঁকড়া	*Bruguiera lemonia*	+	—	+	—	—	—	—
কাঁঠাল	*Artocarpus heterophyllus*	+	+	–	+	+	—	—
কালোজাম	*Syzygium cumini*	+	+	+	+	+		—
কাঠ বাদাম	*Terminalia catappa*	+	+	+	+	—	—	+
কেওড়া	*Sonneratia apetala*	+	+	+	+	—		—
কুল	*Zizyphus mauritiana*	—	—	+	+	+	—	—

কৃষ্ণচূড়া	*Delonix regia*	—	—	+	—	—	+	—
খয়ের	*Acacia catechu*	+	+	+	—	+	—	—
খেজুর	*Phonix sylvestris*	—	—	—	+	—	—	—
খৈয়া বাবলা	*Pithecolobium dulici*	—	+	—	+	—	—	—
গর্জন	*Dipterocarpus turbinatus*	+	—	—	—	—	—	—
গামার	*Gmelina arborea*	+	+	—	—	—	—	—

'+' এর সাহায্যে ধনাত্মক বৈশিষ্ট্য এবং '—' এর সাহায্যে ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয়েছে।

কোথায় কি গাছ লাগাতে হবে

রাস্তা ও সড়কের ধারে : মেহগনি, শিশু, মিনজিরি, ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি, বাবলা, অর্জুন, জারুল, তেঁতুল, কড়ই, রেইনট্রি, ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। যেসব সড়কে যানবাহনের চলাচল কম সেখানে এলাকাভেদে আম, জাম, কাঁঠাল লাগানো যায়।

রেল লাইনের পাশে : বাবলা, মেহগনি, খেজুর, মিনজিরি, নিম, তেঁতুল, বহেরা, হরিতকি, অর্জুন, শিশু। ইউক্যালিপটাস, ইপিল ইপিল, আকাশমনি এ ধরনের গাছের ডাল বাতাসে সহজে ভেঙে ও উপড়ে যায়, সেজন্য রেল লাইনের ধারে এসব গাছ না লাগানোই উত্তম।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপাতাল ও অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে: নারকেল, আম, জাম, মেহগনি, সেগুন, শিশু, কাঁঠাল, বকুল, চম্পাফুল, ঝাউ, সোনালু, ইউক্যালিপটাস, পেয়ারা, কাঠ বাদাম, হরিতকি, বহেরা।

শহরের রাস্তার পাশে : বকুল, নাগেশ্বর, রাধাচূড়া (পেলটাফোরাম), তেলশুর, রাজকড়ই, চম্পা, মহুয়া, শিশু, মেহগনি, ঝাউ, চম্পাফুল, দেবদারু, বাবলা, সোনালু, কাঠ বাদাম।

বাঁধের ধারে : বাবলা, ইপিল ইপিল, শিশু, খেজুর, খৈয়া বাবলা, কাঠ বাদাম, পুন্যাল, রেইনট্রি, আকাশমনি, মেহগনি, বেল, কড়ই, বরই।

উপকূলীয় এলাকায় : রেইনট্রি, মান্দার, বাবলা, শিশু, খেজুর, ঝাউ, কড়ই, ইউক্যালিপটাস, নারকেল, সুপারি, বাইন, কাঁকড়া, করনজা, কাঠ বাদাম, পুন্যাল, ইপিল ইপিল।

বসতবাড়ির আঙ্গিনায় : আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেল, নিম, সজিনা, নারকেল, সুপারি, লিচু, বকুল। বসতবাড়ির আঙ্গিনায় গাছ লাগানোর সময় উত্তর-পশ্চিমে উঁচু বড় গাছ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিচু বা মধ্যম আকারের গাছ লাগাতে হবে। এভাবে লাগালে গৃহে পরিমিত সূর্যালোক এবং আলো বাতাস যথাযথভাবে পাওয়া সম্ভব।

নদী-নালার পাশে বালুকাময় ভূমিতে : শিশু, পিটালি, ছাতিয়ান, কদম, খৈয়া বাবলা, ঝাউ, শিমুল, হিজল, খেজুর।

বাড়ির পাশে নিচু স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় বা ছোট নালার পাশে : হিজল, মান্দার, পলাশ, পিটালি, অর্জুন, বহেরা, রেইনট্রি, ছাতিম, কদম, জারুল, শিমুল, জাম, আম খেজুর, পিতরাজ, কানজল, সোনালু, বরুন, শিশু, জলপাই।

উঁচু অনাবাদি পতিত জমিতে : আম, কাঁঠাল, জাম, শাল, সেগুন মেহগনি, কড়ই, ইউক্যালিপ্টাস, আকাশমনি, খেজুর, নারকেল, তাল।

গ্রামের হাট বাজারে : বট, পাকুড়, তেঁতুল, রেইনট্রি, জাম, আম, বহেরা।

পুকুর পাড়ে : নারকেল, সুপারি, ইপিল ইপিল, মেহগনি, খেজুর, কড়ই।

গ্রামাঞ্চলে বাড়ির আঙ্গিনায় বেড়া হিসেবে : মান্দার, ভেরেন্ডা, জিয়লভাদি, পলাশ।

ক্ষেতের আইলে : নিম, খেজুর, বাবলা, খয়ের, ইপিল ইপিল, শিশু, আমলকি, বকফুল।

শিল্প-বাণিজ্যিক এলাকায় : মেহগনি, বকুল, রাজ কড়ই, নিম, ইউক্যালিপটাস, সেগুন, নাগেশ্বর, নারকেল, তেঁতুল, আম, কাঁঠাল, জাম।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় : নাগেশ্বর, শিউলি, কামিনী, বকুল, আম জাম, কাঁঠাল মেহগনি, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, চম্পাফুল, বেল, নারকেল, কাঠ বাদাম, পুন্যাল।

নদী বক্ষে জেগে ওঠা নতুন চরে : শিশু, বাবলা, মান্দার, পলাশ, জিয়লভাদি, খৈয়া বাবলা।

উপকূলীয় চরাঞ্চলে : কেওড়া, বাইন, কাঁকড়া।

কাঠের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১. **নির্মাণ কাঠ** (Construction wood or timber)

মানুষের কর্মজীবনে কাঠের গুরুত্ব খুবই বেশি। উপযুক্ত কাঠ দীর্ঘস্থায়ী ও আরামপ্রদ, অথচ তুলনামূলকভাবে ব্যয় কম। শালকাঠ, লোহাকাঠ, গর্জন, গামার, সুন্দরী, কাঁকড়া, তাল প্রভৃতি নির্মাণ কাঠের উদাহরণ।

২. **আসবাব কাঠ** (Furniture wood)

চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি প্রভৃতি তৈরিতে কাঠের ব্যবহার অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। আসবাবপত্র তৈরির প্রধান প্রধান বনবৃক্ষের মধ্যে রয়েছে সেগুন, চাম্বল, মেহগনি, কড়ই, জাম, চন্দন, পারুল প্রভৃতি।

৩. **ডেকোরেশন কাঠ** (Decoration wood)

উপযুক্ত মানের সেগুন প্রভৃতি কাঠে অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য করা, ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য তৈরি করা যায়। ইলেকট্রিক লাইনিং, সুইচ ও সুইচ বোর্ড এর কাজে শুকনো কাঠ সবচেয়ে নিরাপদ ও টেকসই।

৪. **যন্ত্রপাতি তৈরির কাঠ** (Implement wood)

লাঙল, জোয়াল, মই, যন্ত্রের আচাড়, তাঁত এবং ক্রীড়া যন্ত্রপাতি তৈরিতে জারুল, পিতরাজ, তাল, ঝাউ,বাবলা, গাব, লটকন প্রভৃতি গাছ খুবই উপযোগী।

৫. **প্যাকেজিং কাঠ** (Packaging wood)

প্যাকেজিং কাঠে ব্যবহারোপযোগী কাঠের মধ্যে রয়েছে কেরোসিন কাঠ, চাকোয়া কড়ই, ইউক্যালিপ্টাস, কৃত্রিম স্তরভূত কাঠ, বট, রেইনট্রি প্রভৃতি।

৬. **জ্বালানি কাঠ** (Fuel wood)

বর্তমানে বাংলাদেশে জ্বালানি কাঠের চাহিদা ৩০ কোটি ঘনমিটারের বেশি। স্থানীয় বাজার দরে এর আর্থিক মূল্য ১৫ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা। সচরাচর ব্যবহৃত জ্বালানি অর্থাৎ কাঠ,

বাকল, লতা-পাতা, শিকড়, শাখা-প্রশাখা সংবলিত জ্বালানি কাঠের গাছের মধ্যে রয়েছে আম, মান্দার, বট, পিতরাজ, নারকেল, সুপারি, ঝোপ গাছ ও আগাছাসহ বিবিধ গাছ।

৭. **যানবাহন তৈরির কাঠ** (Vehicle wood)

বাস, ট্রাক, ট্রেন, নৌকা, গাড়ী, রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, গরু মহিষের গাড়ি প্রভৃতি তৈরির জন্য কাঠের ব্যবহার খুবই বেশি। জারুল কাঠের নৌকা ভাল। ধারমারা কাঠ দিয়ে ট্রাকের বডি ও তলনা তৈরি হয়। বাবলা কাঠ গাড়ির চাকার জন্য উত্তম।

বাঁশের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১। **নির্মাণ কাজে বাঁশের ব্যবহার** (Construction bamboo)

বাঁশের নির্মাণ কাজে ব্যয় কম হয় এবং অতিশিক্ষিত মিস্ত্রির প্রয়োজন হয় না। নির্মাণ কাজের উপযোগী বাঁশের মধ্যে রয়েছে বরাক ও এজাতীয় শক্ত বাঁশ।

২। **আসবাব বাঁশ** (Furniture bamboo)

চেয়ার, সোফা, শেলফ, কাঠামো তেরি প্রভৃতি কাজে বাঁশের ব্যবহার বেশ সমাদৃত হয়ে আসছে। আসবাব তেরিতে প্রধানত মুলী বাঁশ, মরাল বাঁশ ও তল্লা বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

৩। **সাজানোযোগ্য বাঁশ** (Decoration bamboo)

ঘর, বাড়ি, দোকান, অফিস প্রভৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা ডেকোরেশনেও বাঁশজাত দ্রব্যের ব্যবহার রয়েছে। সাধারণত মরাল ও তল্লা বাঁশ ও সূক্ষ্ম আঁশসম্পন্ন বাঁশ এ কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়

৪। **যন্ত্রপাতি তৈরির বাঁশ** (Implements bamboo)

কৃষি যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ যথা-- লাঙল, জোয়াল, মই, বিদা/আঁচড়া, প্রভৃতি তৈরিতে শক্ত ধরনের বরাক বাঁশের ব্যবহার বেশ লাভজনক।

৫। **জ্বালানি বাঁশ** (Fuel bamboo)

সব ধরনের বাঁশ, বাঁশের অংশবিশেষ যথা- বর্জ্য অংশ কঞ্চি, পাতা, গোড়া, শিকড়, খোল প্রভৃতি জ্বালানি হিসেবে গ্রামে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৬। **যানবাহন তৈরির বাঁশ** (Vehicle bamboo)

গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, ভ্যানগাড়ি, গরু-মহিষের গাড়ি, রিক্সা, নৌকা প্রভৃতিতে বাঁশের অত্যাবশ্যক ব্যবহার রয়েছে।

কাঠজাত শিল্প কাঁচামালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১। **কাগজ শিল্প** (Paper industries)

বাংলাদেশের দুটি প্রধান বৃহৎ কাগজ কলের নাম হচ্ছে কর্ণফুলী পেপার মিল (KPM) ও খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল (KNM)।

২। **রেয়ন শিল্প** (Rayon industries)

বাংলাদেশে রাঙামাটি জেলার রেয়ন শিল্পের জন্য বছরে প্রচুর পরিমাণ বিশেষ ধরনের বাঁশ ও কাঠ প্রয়োজন হয়। কারখানা চালু রাখার জন্য প্রাকৃতিক বন থেকে এই কাঁচামালের সরবরাহ আসে।

৩। ম্যাচ শিল্প (Match industries)

বাংলাদেশে ছোট বড় অনেক ম্যাচ কারখানা রয়েছে। এসব কারখানার ম্যাচ বাক্স ও কাঠি তৈরির জন্য প্রচুর কাঠ প্রয়োজন হয়। ইউক্যালিপটাস, বট, চাকোয়া প্রভৃতিজাতীয় অনেক গাছ এসব কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

কুটির শিল্পের কাঁচামালের গুরুত্ব

বাংলাদেশের গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে বাঁশ, কাঠ, শাখা পাতা, বেত মুর্তা প্রভৃতি। বাঁশ, কাঠ, বেত মুর্তা থেকে তৈরি হস্তশিল্পগত পণ্য দেশে ব্যাপক ব্যবহার ছাড়াও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

বনভেষজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

পৃথিবী সৃষ্টি আদিকাল থেকে বনজ উদ্ভিদ বা এদের বাকল, পাতা, শিকড়, ফুল, ফল ভেষজ ওষুধ Herbal Medicine) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমলকি, বহেরা, হরিতকি, উলট-কম্বলসহ অধিকাংশ ভেষজ গাছ বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়।

মোম ও মধুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের সুন্দরবন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বনাঞ্চল থেকে দেশের সিংহভাগ মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়। মোম ও মধু দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পণ্য।

বনের জীববৈচিত্র্যগত গুরুত্ব

সাধারণভাবে প্রাকৃতিক অবস্থায় সুষম সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের সক্রিয় উপস্থিতি, বিস্তৃতি ও পারস্পারিক সহাবস্থানকে সাধারণভাবে জীববৈচিত্র্য বলা হয় (In general, the active presence, distribution and parallel habitation of different types of plants, animals and microorganisms at balanced population in natural condition is usually known as biodiversity)।

জীববৈচিত্র্যের প্রধান প্রধান গুরুত্ব

১। বর্তমানে চাষকৃত উচ্চ ফলনশীল অনেক জাতের জার্মপ্লাজম (Germplasm) বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২। উদ্ভিদ প্রজনন সংক্রান্ত কাজের জন্য বন্য উদ্ভিদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩। প্রাণীর খাদ্য শিকল রক্ষার জন্য বন্য জীবকুল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪। ভবিষ্যতে ভেষজ উদ্ভিদের সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য বনে জীববৈচিত্র্য রক্ষা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

৫। ভবিষ্যতে জৈবিক উৎপাদনশীলতা রক্ষার্থে বন্য জীবের গুরুত্ব অনেক বেশি।

৬। বনাঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে ক্ষতিকর প্রাণীর আবাস এলাকায় চলে আসে। কীট-পতঙ্গ অধিক হারে ফসল বিনষ্ট করে।

৭। বিশ্বের জীবকুলের অনেক প্রাণী বা উদ্ভিদ একত্রে সঠিকভাবে সনাক্ত বা মূল্যায়নই হয়নি। অথচ এদের মধ্যে ভবিষ্যৎ মানব কল্যাণের নিয়ামক থাকতে পারে। তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮। বিশ্বের প্রতিটি জীবের কোনো না কোনো উপকারী দিক রয়েছে। তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা সকলের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

চিত্তবিনোদনগত গুরুত্ব

মানব সমাজের জন্য চিত্ত বিনোদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও চিত্তবিনোদনের অবদানটুকু আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না, তবুও উল্লেখ করা যায়, নির্মল আনন্দের জন্য বন বিহারের তুলনা নেই। চিত্তবিনোদনের জন্য বাংলাদেশে কতকগুলো নির্দিষ্ট উদ্যান ও বনভোজন স্পট (picnic spot) রয়েছে। যেমন–

(১) জাতীয় উদ্যান (National Park) — ভাওয়াল ও মধুপুর

(২) বোটানিক্যাল গার্ডেন — ঢাকা

(৩) হিরন পয়েন্ট — সুন্দরবন

(৪) রামসাগর — দিনাজপুর

(৫) হিমছড়ি — কক্সবাজার।

এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বেসরকারি বহু বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের বন

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি হিসেবে মোট বনভূমির আয়তন প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ হেক্টর। ভূমির উচ্চতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের বনভূমির অধিকাংশ দেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে নিম্নলিখিত ভাগে করা যায়। যথা-

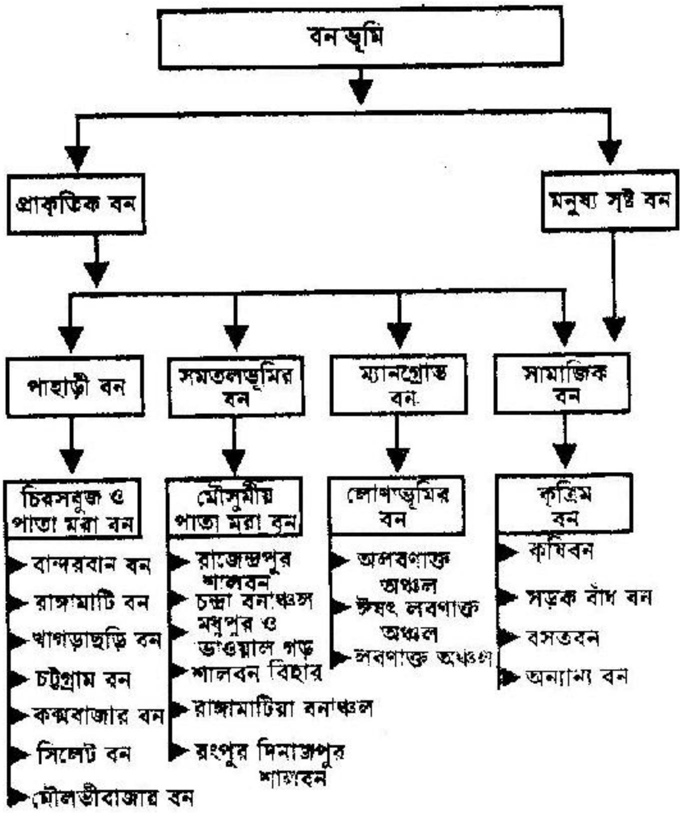

ক. পাহাড়ি বন (Hill forests) : বাংলাদেশের বনাঞ্চলের মধ্যে পাহাড়ি বনের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। দেশের পূর্বাঞ্চলে ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ এই পাহাড়ি বনের আয়তন প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশের পাহাড়ি বনের এলাকাগুলো হচ্ছে--

বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের বন

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি হিসেবে মোট বনভূমির আয়তন প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ হেক্টর। ভূমির উচ্চতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের বনভূমির অধিকাংশ দেশের পূর্ব, দক্ষিণ–পূর্ব ও দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে নিম্নলিখিত ভাগে করা যায়। যথা–

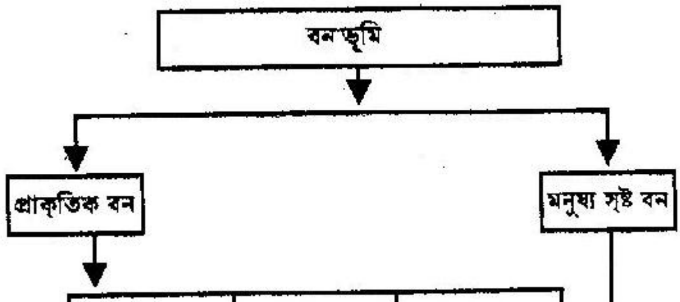

ক পাহাড়ি বন (Hill forests) : বাংলাদেশের বনাঞ্চলের মধ্যে পাহাড়ি বনের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। দেশের পূর্বাঞ্চলে ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ এই পাহাড়ি বনের আয়তন প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশের পাহাড়ি বনের এলাকাগুলো হচ্ছে - -

(১) সিলেট — সদর, খাদিমনগর, জয়ন্তিয়াপুর
(২) মৌলভীবাজার — শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ
(৩) হবিগঞ্জ — পাহাড়ি এলাকা
(৪) চট্টগ্রাম — অধিকাংশ জায়গা
(৫) রাঙ্গামাটি — অধিকাংশ
(৬) খাগড়াছড়ি — অধিকাংশ
(৭) বান্দরবান — অধিকাংশ
(৮) কক্সবাজার — অধিকাংশ

বাংলাদেশের পাহাড়ি বনের প্রধান প্রধান গাছ গর্জন, চাপালিশ (চাম্বল), তেলশুর, কড়ই, গামার, চম্পা, ধারমারা, বাদী, সিভিট, চাকেয়া কড়ই, বন্য আম। বাংলাদেশের পাহাড়ি বন এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বহু প্রকার বাঁশ পাওয়া যায়। এসব বাঁশের মধ্যে রয়েছে বরাক, মূলী, উরা, মরাল, তল্লা, কেইটা, নলী প্রভৃতি। পাহাড়ি বনাঞ্চলে সচরাচর প্রাপ্ত বন্য প্রাণীর মধ্যে রয়েছে হাতি, বানর, শূকর, ভালুক, বন মুরগি, সাপ, শিয়াল, নেকড়ে, কাঠবিড়ালী, নেউল প্রভৃতি। এছাড়া ও রয়েছে বিচিত্র ধরনের পাখি ও কীট–পতঙ্গ। পাহাড়ি বন এলাকায় বৃহদাকার বৃক্ষ ছাড়াও রয়েছে লতা গুল্ম ও অসংখ্য প্রকার আগাছা। পাহাড়ি বনের মধ্যে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এলাকায় রয়েছে শ্রেণিকৃত ও অশ্রেণিকৃত ঘন বন (Classified and unclassified dense forest) বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রামের বন সে তুলনায় হালকা।

খ. **সমতল ভূমির বন** (Plain land forest) : বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা জেলাসমূহের বনকে সমভূমির বন বলা হয়। এসব এলাকা (উদাহরণ) হলো :

ঢাকা — সাভার
গাজীপুর — সদর, শ্রীপুর, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ
টাংগাইল — মধুপুর
ময়মনসিংহ — ভালুকা, মুক্তাগাছা
জামালপুর - সীমান্তবর্তী এলাকা
শেরপুর — সীমান্তবর্তী এলাকা
নেত্রকোনা — সীমান্তবর্তী এলাকা
রংপুর — মিঠাপুকুর
দিনাজপুর — সদর, বিরামপুর ও হাকিমপুর
রাজশাহী — বরেন্দ্র এলাকা
কুমিল্লা — লালমাই
ব্রাহ্মণবাড়িয়া — কসবা, আশুগঞ্জ

বাংলাদেশের সমতল ভূমির বনের আয়তন প্রায় এক লক্ষ হেক্টর। সমতল ভূমির বনের প্রধান বৃক্ষ হচ্ছে শাল, গজারী। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে কড়ই, রেইনট্রি, জারুল, ইত্যাদি। সমতল ভূমির বনের কাছাকাছি বসত এলাকা রয়েছে। এজন্য সমতল ভূমির বনের উপর কর্তন চাপ বেশি।

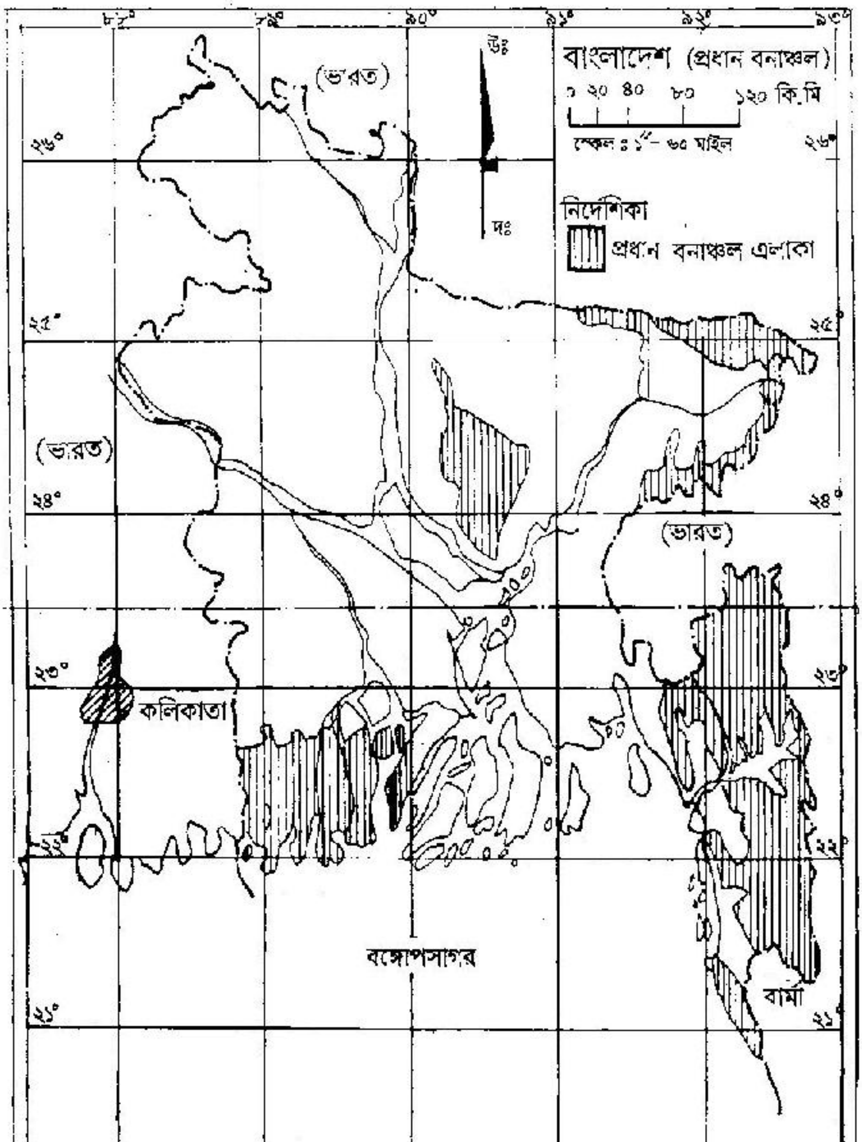

চিত্র ৪.১ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল।

মানুষ সব সময় সেখান থেকে শাখা-প্রশাখা, গোড়া শিকড় ও পাতা আগাছা সংগ্রহ করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। এসব এলাকায় অবৈধ বসতি ও গাছ কাটা হচ্ছে অধিক হারে। সেজন্য সমতল ভূমির প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের আয়তন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। অনেক স্থান বৃক্ষ শূন্য হয়ে পড়েছে। এসব এলাকায় সরকারি পরিকল্পনার অধীনে শালসহ ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি, ম্যানজিয়াম, প্রভৃতি গাছের বন বাগান করা হচ্ছে। কোনো কোনো স্থানে স্থানীয় জনগণ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বন বাগান প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে সমতল ভূমির বনে বন্য পশু পাখির প্রকার ও সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রধান প্রধান পশু-পাখির মধ্যে রয়েছে নেকড়ে, হরিণ, বানর, সাপ, নেউল, ঘুঘু, দোয়েল, শালিক প্রভৃতি। সমতল ভূমির বনের মধ্যে শাল কাঠের গুরুত্ব বাংলাদেশে খুবই বেশি। কারণ নির্মাণ কাজে এই কাঠের ব্যবহার ব্যাপক।

গ. **ম্যানগ্রোভ বন** (Mangroove forests) : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণের বিস্তীর্ণ এলাকা সমন্বয়ে ম্যানগ্রোভ বা লোনা পানির বন সৃষ্টি হয়েছে। এই বন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবন (Sundarban) নামে পরিচিত। জানামতে সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন, সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী বন। সুন্দরবন বাংলাদেশের মূল স্থলভূমি থেকে শুরু হয়ে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিনিয়ত সামুদ্রিক জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় বলে সুন্দরবনকে লোনাপানির বন বলা হয়। সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষের নাম সুন্দরী বৃক্ষ। সুন্দরী বৃক্ষের নামানুসারেই এই বনাঞ্চলের নাম হয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গাছের মধ্যে রয়েছে পশুর, গরান, গেওয়া, কেওড়া, বাইন; বাদাম, গোলপাতা, মোটা বেত প্রভৃতি। দেশীয় কাঁচা ঘর নির্মাণে ব্যবহারের বিবেচনায় গোলপাতা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গোলপাতা দেখতে অনেকটা পরিপুষ্ট নারকেল পাতার মতো। ঘরের ছাউনি ও বেড়া তৈরিতে গোলপাতার ব্যবহার দেশের দক্ষিণাঞ্চলে খুবই বেশি। সুন্দরবন থেকে প্রত্যেক বছর বিপুল পরিমাণ মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়।

সুন্দরবনের প্রধান প্রধান প্রাণীর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতা বাঘ, হরিণ, বানর, অজগর সাপ, বিচিত্র পাখি ও কীটপতঙ্গ সুন্দরবনের ফাঁকে ফাঁকে বহমান খালে রয়েছে কুমির, জলজ প্রাণী ও পাখি। বর্তমানে সুন্দরবনের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে জেগে ওঠা চরে উপকূলীয় বন হিসেবে নতুন নতুন বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এসব কৃত্রিম বনে প্রধানত কেওড়া গাছ রোপণ করা হচ্ছে।

সুন্দরবনের এলাকা

সাতক্ষীরা	শ্যামনগর ;
খুলনা	কয়রা, দাকোপ, পত্নী দ্বীপ ;
বাগেরহাট	মংলা, শরণখোলা, দিকচর এবং
বরগুনা	পাথরঘাটা (সামান্য অংশ)

সামাজিক বন (Social forests)

সরকারি সংবিধিবদ্ধ আইনের অধীন প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ছাড়াও বসতবাড়ি, প্রতিষ্ঠান, সড়ক ও বাঁধ, পতিত জমি প্রভৃতিতে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র পরিসরভিত্তিক বন বাগানকে সামাজিক বন বলা হয়।

সামাজিক বনের অধিকাংশই কৃত্রিম বনের অন্তর্ভুক্ত। আয়তন ও গাছের সংখ্যার তুলনায় সামাজিক বনের পরিমাণ অন্যান্য বনের চেয়ে বেশি। নিম্নরূপ বনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক বনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন—

(ক) **কৃষি বন** (Agro forestry) : মাঠ ফসলের অন্তর্বর্তী গাছ যেমন– কড়ই, বাবলা, তাল, খেজুর, খয়ের, ইউক্যালিপটাস।

(খ) **বাঁধ ও সড়ক বন** (Embankment and road side plantations) : প্রধানত রেইনট্রি, কড়ই, বাবলা, শিশু, আকাশমনি, ম্যানজিয়াম, অর্জুন।

(গ) **প্রাতিষ্ঠানিক বন** (Institutional plantation) : প্রতিষ্ঠানিক বনের মধ্যে রয়েছে অফিস, আদালত, শিক্ষা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, মাঠ প্রভৃতিতে লাগানো গাছ, যথা– কৃষ্ণচূড়া, সোনালী, ইউক্যালিপটাস, নারকেল,সুপারী,আম, জাম, কাঁঠাল, বোটল ব্রাশ, তাল, ঝোপ তাল, কড়ই প্রভৃতি।

(ঘ) **বিবিধ বন :** বর্তমানে দেশের উঁচু স্থান আর ফাঁকা নাই , সেখানে কোনো না কোনো গাছ রোপণ করা হচ্ছে। এসব স্থানে মূলত বহু ব্যবহারমুখী (multipurpose) গাছ লাগানো হয়ে থাকে।

পাহাড়ি বনভূমি

(১) **পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি :** বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমির আয়তন প্রায় ৩৭০০ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৩৭০ লক্ষ হেক্টর)। এই এলাকার প্রধান গাছ গর্জন, গামার, কড়ই, জারুল, শিরিষ ও শিমুল। এখানে পাতাঝরা বৃক্ষের প্রাধান্য রয়েছে।

(২) **চট্টগ্রামের বনভূমি :** চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বনভূমির আয়তন প্রায় ৯০০ বর্গ কিলোমিটার (৯০ লক্ষ হেক্টর) পার্বত্য চট্টগ্রামের চেয়ে চট্টগ্রাম এলাকায় বৃষ্টিপাত কিছুটা বেশি বলে (২৫৪০ মিমি) এখানে চিরসবুজ, পাতা ঝরা ও বাঁশবনের মিশ্র প্রাধান্য রয়েছে। গাছের মধ্যে রয়েছে মেহগনি, বৈলাম, কড়ই , জাম , গামার, সেগুন, চরলতা, মূলী, দলু,ও মিতেঙ্গা বাঁশ। বই এলাকায় রাবার বাগান, চা বাগান ও তৃণভূমি রয়েছে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ সৈকতে ঝাউ গাছের প্রাধান্য রয়েছে

(৩) **সিলেটের বনভূমি :** সিলেট, মৌলভীবাজার ও এতদসংলগ্ন বনভূমির আয়তন প্রায় ৩৪০ বর্গ কিলোমিটার (৩৪ লক্ষ হেক্টর)। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০০০ মিলিমিটারের বেশি। তাই এখানে অনেক প্রজাতির (লিগুমসহ) চিরসবুজ বৃক্ষ রয়েছে। এখানকার পাহাড়গুলোতে প্রচুর বাঁশ ও জন্মে। বেত ও শীতল পাটির কাঁচামালও সিলেটের বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

(৪) **রাজেন্দ্রপুর ও চন্দ্রশাল বন :** শাল গাছের পরিমাণ প্রায় ৮০%। অন্যান্য গাছের মধ্যে রয়েছে ফাইলেনথাস, রেন্ডিয়া, স্যাইলেস, এলবিজিয়, আর্টোকারপাস।

(৫) **মধুপুর ও ভাওয়াল গড় :** এই বনের আয়তন প্রায় ২৮০ বর্গ কিলোমিটার (২৮ লক্ষ হেক্টর) এখানকার প্রধান গাছ শাল ও গজারী। অন্যান্য গাছের মধ্যে রয়েছে—ডিলেনিয়া, টের্মিনালিয়া, মেলেটাস, ডিজিপাস প্রভৃতি।

(৬) **অন্যান্য শাল বন :** অন্যান্য শালবনের মধ্যে রয়েছে শালবন বিহার (কুমিল্লা লালমাই পাহাড়, গারো পাহাড়ের পাদভূমির বন, রাঙ্গাটিয়া বনাঞ্চল (শেরপুর জেলা), রংপুর, দিনাজপুর, শালবন এলাকা। এসব অঞ্চলের মোট আয়তন প্রায় ২০০ বর্গ কিলোমিটার (২০ লক্ষ হেক্টর)। শাল ছাড়াও এখানে রয়েছে সেগুন, জাম, নিম, শিমুল, বাবলা, খয়ের, আলপাইন, ইত্যাদি।

মৃত্তিকা ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্ট উদ্ভিদের কাঠামো, গড়ন, শাখা, পাতা, শিকড়, ইত্যাদি অনুসারে বনভূমিকে প্রধান চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সরল বর্গীয় বনভূমি
২. চিরসবুজ (Evergreen) বনভূমি
৩. পাতাঝরা (Desiduous) বনভূমি
৪. মিশ্র বনভূমি

১. **সরল বর্গীয় বনভূমি :** বর্গীয় বনভূমির কাঠ নরম। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক উদ্ভিজ্জ দ্রব্য (biomass) বর্গীয় বনভূমি থেকে আসে। উত্তর আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ও ইউরোপে (৫০–৭০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে) এই বনভূমি পাওয়া যায়। এ বনের প্রধান প্রধান কাঠের মধ্যে রয়েছে সিডার, জুনিপার, বার্চ, ফার ও পাইন। এখানে রজন, আলকাতরা, পীচ তারপিনজাতীয় পদার্থ উৎপাদনকারী গাছও জন্মে। বাংলাদেশে এ ধরনের বনের উপস্থিতি নেই।

২. **চিরসবুজ বনভূমি :** চিরসবুজ বনবৃক্ষের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মেহগনি, কাঁঠাল, তাল, গর্জন, সেগুন, বৈলাম, কর্ক– সিডার প্রভৃতি। এসব বৃক্ষের তাপ চাহিদা বার্ষিক গড়ে ২০ থেকে ২৫ সেঃ এবং বৃষ্টিপাত ২০০০ থেকে ২৫০০ মিমি.। নাতিশীতোষ্ণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং আর্দ্র – গ্রীষ্মমণ্ডলীয় (Humid tropics) এলাকার এসব গাছ বেশি জন্মে।

এসব গাছের পাতা স্বাভাবিকভাবে সারা বছরই ঝরতে থাকে, আবার নতুন পাতা গজায়, এক সাথে সব পাতা ঝরে পড়ে না।
বাংলাদেশে চিরসবুজ বৃক্ষের ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে।

৩. **পাতাঝরা বনভূমি :** পাতাঝরা বৃক্ষের মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছে শাল, জিগা, রেইনট্রি, বাদাম, ওক, বীচ, বার্চ, অ্যাশ, ইত্যাদি। শীত বা শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে গাছের পাতা ঝরে গিয়ে বসন্তের আগমনে পুনরায় পাতা জন্মায়। এভাবে গাছ সবুজ সতেজ হয়ে উঠে। সারা বিশ্বের প্রায় ৭০% ভাগ বনভূমিতে পাতাঝরা গাছ জন্মায়। উষ্ণমণ্ডলে ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মাঝারী বৃষ্টিপাতের এলাকায় এসব গাছ বেশি জন্মে। পাতাঝরা গাছের অনেক প্রজাতির কাঠ হয়। বাংলাদেশে পাতাঝরা বৃক্ষের উপস্থিতি বেশ বেশি।

৪. **মিশ্রবনভূমি :** নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মিশ্রবন বেশি পাওয়া যায়। সাধারণত বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০০ মি.মি.–র বেশি ও তাপমাত্রা ৩৫^{0} থেকে ৪০^{0} সে: থাকে, সেখানে মিশ্রবনের প্রাধান্য রয়েছে। মিশ্রবনের জন্য প্রধান প্রধান গাছ যথা– পাইন, ফার, ওক, ম্যাপল, শাল, সেগুন প্রভৃতি ভাল জন্মে

বাংলাদেশে চিরসবুজ ও পাতাঝরা বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি রয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক বনায়ন, কৃষিবন ও বসত বনে মিশ্রবনের প্রাধান্য বাংলাদেশের গ্রামীণ বনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের পরিবেশ

পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ, এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৮০০জন লোক বসবাস করে। বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় আয় ২২০ মার্কিন ডলার। ১৯৯৪ সনের পৃথিবীর অর্থনৈতিক মানচিত্রে এর অবস্থান ছিল নিচ থেকে ১২তম দরিদ্র দেশ। তবে গত কয়েক বছরে এদেশে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়েছে। গত দশ বছরে খাদ্যোৎপাদন প্রায় ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৯২ সনে এদেশ খাদ্যোৎপাদন প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সমর্থ হয়। বর্তমানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ২.২ হতে ১.৯ হারে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। রফতানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থানীয় সম্পদ থেকে এখন উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৩৮ ভাগ অর্থায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। বেসরকারি সংস্থাসমূহ বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে পরিবেশ পুনরুদ্ধারে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

মানবিক উন্নয়ন

এতসব প্রশংসনীয় সফলতা সত্ত্বেও এদেশে সামগ্রিক জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগেরও বেশি চরম দরিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে । তারা মাথাপিছু ১৮০০ ক্যালোরির কম খাদ্য গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মানবিক উন্নয়ন নির্দেশক অবস্থা এখনও শোচনীয়ভাবে কম। শিক্ষার হার ৩০%, মানুষের গড় আয়ু ৫২ বছর, শিশু ও প্রসূতি মা'র মৃত্যুর হার অত্যধিক বেশি এবং শহরে বস্তিতে লোক সংখ্যা বাড়ছে।

কর্মসংস্থান

কৃষি সেক্টরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার কোনোভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হারের সাথে তাল মিলাতে পারছে না। নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা এখনও অপ্রতুল এবং পানিবাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। অপরিকল্পিত তবে দ্রুত নগরায়ন সত্ত্বেও এদেশে ৮০ ভাগেরও বেশি লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। আনুপাতিকভাবে কম বয়সী ছেলেমেয়ে, যুবক–যুবতীর সংখ্যা বেশি বিধায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকুরির বাজারে নিকট ভবিষ্যতে অত্যধিক চাপ পড়বে।

বন্যা ও খরা

বন্যার কারণে দেশের প্রায় ৩০ ভাগ এলাকা প্রতি বছরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৯১ সালের এপ্রিলের সাইক্লোনে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সম্পদ ছাড়াও প্রায় এক লক্ষ ৪০ হাজার মানব সন্তান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সাধারণভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল খরার কবলে এবং উত্তর–পূর্ব অংশ পুনঃপৌনিক বন্যার কবলে নিপতিত হয়।

কৃষি

উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এখানে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন

হয়। তবে অপরিকল্পিতভাবে এগুলো ব্যবহারের কারণে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা মানুষসহ জীবজন্তুর স্বাস্থ্য সংকটের কারণ হতে পারে।

পানি

পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবই বাংলাদেশের প্রধান পরিবেশগত সমস্যা। হিমালয় পর্বত অঞ্চল হতে নেমে আসা পলিমাটি, অন্যান্য মাটি ও বালুকণা বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে জমা হয়ে হয়ে বাংলাদেশ নামক বদ্বীপ তথা অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ও ব্যাপক ব্যবহারের কারণে পানির স্তর শুষ্ক মৌসুমে স্থানে স্থানে অনেক নিচে নেমে যায়। পানি দূষণ দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করে বর্তমানে অতি বড় সমস্যার সৃষ্টি করছে। মলমূত্র, আবর্জনা দূষণ প্রক্রিয়ায় পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে, শিল্প দূষণে স্থলগত এবং জলজ উদ্ভিদ-প্রাণী ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে এবং রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি খাদ্য দূষণের কারণ ঘটাচ্ছে।

মৎস্য সম্পদ

বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং সেচের জন্য নির্মিত বিভিন্ন বাঁধ, অবকাঠামো, নালা ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ একদিকে যেমন মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ব্যাহত করছে ও মৎস্যের উৎসভূমি কমিয়ে ফেলছে এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে মৎস্যের স্বাভাবিক বিচরণ বিঘ্নিত করছে, অন্যদিকে নদী এবং খালের তলদেশে পলি জমে জমে ভরাট হওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল কার্যক্রম ব্যাহত করছে। গত দুই দশক মৎস্য সম্পদ আহরণের পরিমাণ অত্যধিক হয়েছে (মাছ ধরা অনেক ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে ভূমিহীনদের একমাত্র পেশা হিসেবে পরিগণিত)। ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং ভূমি স্বত্বের বহুমুখী জটিলতার কারণে পুকুরে এবং বদ্ধ ডোবা- বিলে মাছ উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মিত অবকাঠামোর কারণে পানি প্রবাহ বিভিন্ন স্থানে বিঘ্নিত এবং ফলে মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ বন্যাপ্লাবিত জলভূমিতে প্রায় ৭০ ভাগ কমে গেছে। চিংড়ি সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ সম্ভাবনাময়, তবে এজন্য কৃষি ও বনায়ন জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ভূমি সমস্যা

ভূমি সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ইস্যুসমূহ, পৌনঃপৌনিক (Cross sectoral) যেহেতু সকলেই এর ব্যবহারে সমান উৎসাহী। নদী ভাঙনের ফলে একদিকে ভূমিহীনদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে তেমনি এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। মালিকানা স্বত্বের জটিলতার কারণে জেগে ওঠা নতুন চর সুসংহতকরণ ও সুব্যবহারে সমস্যা হচ্ছে।

বনায়ন

জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য কাঠ আহরণ এবং সরকারি বনাঞ্চলে অবৈধ দখলদারদের উৎপাতের কারণে গত বিশ বছরে বাংলাদেশে সংরক্ষিত বনাঞ্চল প্রায় ৫০ ভাগ বিলুপ্ত তথা ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যদিকে নদী ও খালের পানিতে লবণাক্ততা ক্রম আধিক্যের কারণে সুন্দরবনসহ উপকূলীয় ' ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট' ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবশ্য সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ডে এনজিওদের সম্পৃক্ততা সাম্প্রতিককালে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৯৯৩ থেকে ৯৪ সন পর্যন্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহ প্রায় দু মিলিয়ন বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা করেছে।

শিল্প

শিল্প স্থাপনের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় এবং মানুষের কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তবে দ্রুত শিল্পায়নের ফলে শিল্প ও পানি দূষণের ব্যাপকতা বেড়ে যায়। বিভিন্ন কল-কারখানার অশোধিত বর্জ্য পদার্থ খাল-বিল, নালা ও নদীতে ফেলার কারণে মৎস্য খাত সরাসরি ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের পরিবেশ নীতিমালা

উপরোক্ত বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনায় (১৯৯০–৯৫) নিম্নবর্ণিত নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে :

১. বায়ু, পানি ও মাটি সংশ্লিষ্ট দূষণ ও অবক্ষয় রোধকরণ,
২. উন্নয়ন কর্ম প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সম্মত কর্মকাণ্ডের বিকাশসাধন,
৩. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন,
৪. টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি খাতের পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধনে সহায়তা প্রদান,
৫. পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ,

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ।

১. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর স্থাপন,

২. ১৯৯২ সনে 'জাতীয় পরিবেশ নীতি' ঘোষণা এবং 'পরিবেশ কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা' প্রণয়ন,

৩. জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (নেমাপ), জাতীয় সংরক্ষণ কার্যক্রম (NCS) এবং বন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (FMP) সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

৪. সকল বড় বড় উন্নয়ন কার্যক্রম শুরুর আগে EIA (Environment Impact Assessment) পরিচালনা অবশ্য করণীয় ঘোষণা,

৫. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুমোদন।

স্থানীয় ও আঞ্চলিক নীতিমালার সমন্বয়ে জাতীয় পরিবেশ নীতি কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি যে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, সেগুলো হলো :

ক) পরিবেশ উন্নয়ন সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক (জীববৈচিত্র্য) ভারসাম্য সংরক্ষণ, ও দেশের সামুদ্রিক গতি অব্যাহত রাখা,

খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করা,

গ) পরিবেশের অধোগতি ও বিভিন্ন দূষণ থেকে দেশকে রক্ষাকল্পে এতদসংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড চিহ্নিতকরণ ও বন্ধ করা,

ঘ) সকল খাতে পরিবেশ সম্মত ব্যবহার,

ঙ) পরিবেশ বিষয়ক সকল প্রকার আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে জাতীয় কার্যকরী সহযোগিতা প্রদান।

বাংলাদেশের জাতীয় বননীতি

জাতীয় বননীতি-১৯৯৪

বাংলাদেশ প্রথম ১৯৭৯ সালে জাতীয় বননীতি প্রণয়ন করে। কিন্তু আর্থসামাজিক কারণে দেশের বন সম্পদের দ্রুত অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে উক্ত বননীতি সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এই বননীতি, ১৯৯৪ প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনায় আনা হয়েছে, যথা–

(১) সংবিধানে বর্ণিত জনকল্যাণের মূলনীতিসমূহ;

(২) পরিবেশসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বনখাতের ভূমিকা;

(৩) কৃষি, শিল্প, কুটির শিল্প ও অন্যান্য খাতের উন্নয়নে জাতীয় নীতিসমূহ এবং

(৪) বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত দেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা সংরক্ষণে এবং সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বনখাতের সুদূরপ্রসারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃতিক্রমে, বন মাটি এবং এতদসংক্রান্ত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সংরক্ষণ করে নদীনালা, বাঁধসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণপূর্বক ঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড গতি হ্রাস করে বায়ু ও পানি ইত্যাদি দূষিতকরণের কার্যকারিতা নষ্ট এবং জীবনমণ্ডলে পরিবেশগত সমতা রক্ষা করে তা উপলব্ধিক্রমে।

বন, কাঠ ও জ্বালানি উপকরণ উৎপাদন করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফলমূল জাতীয় খাদ্য, পশু খাদ্য তৈরি বীজ, মসলা আঁশ, রাবার, ওষুধজাতীয় দ্রব্য ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য পণ্য উৎপন্ন করে।

প্রচলিত বনায়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র ও আগ্রহী জনগোষ্ঠীকে অংশীদারিত্ব (Share-Mechanism) ও মুনাফা প্রদানের ভিত্তিতে সারা দেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন (Social Forestry) কৃষিবন (Agro Forestry) সৃজনে সম্পৃক্ত করে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক বন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, বন বিদ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা, কলাকৌশল প্রয়োগ এবং বন্যপ্রাণী, পশুপাখি ও বন্যজীবের নিরাপদ আশ্রয়স্থল স্থাপন ও সংরক্ষণের ক্রমবর্ধমানশীল প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাক্রমে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হিসেবে যে কোনো দেশের ভূখণ্ডের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বনাঞ্চল পরিবৃত্ত থাকা প্রয়োজন,– এই স্বীকৃত সত্য অনুধাবন করিয়া এবং সর্বোপরি,

উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে জনগণকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে বনায়ন, বৃক্ষরোপণ, বন নার্সারি স্থাপন ও উন্নয়ন, পরিচর্যা সংরক্ষণের জন্য বর্তমান বননীতি ১৯৭৯ সংশোধনপূর্বক জাতীয় বননীতি ১৯৯৪ হিসেবে সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে

(১) বনখাতে উন্নয়নের পূর্বশর্ত,

(২) জাতীয় বননীতি উদ্দেশ্য,

(৩) জাতীয় বননীতি ঘোষণা,

বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত

(১) বাড়ি ঘর, নৌকা ইত্যাদি তৈরির জন্য কাঠ, রান্নাবান্না কাজে জন্য জ্বালানি কাঠ, গবাদিপশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ঔষধিজাতীয় লতাপাতা, গুল্ম ও ফলমূল এবং মৃত্তিকা আবরণী, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সেবা সহযোগিতা পূরণ করা হবে।

(২) বন খাতে উন্নয়নের সুফলসমূহ জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করে এবং বিশেষ করে যাদের জীবন জীবিকা বৃক্ষ, বন, ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে এ খাতের সুফল প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

(৩) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৃক্ষচাষীর মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

(৪) বনায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মকাণ্ড বিধায় বন খাতের উন্নয়নে সরকারের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অঙ্গীকার অব্যাহত থাকবে।

(৫) জৈব পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে যাতে এই সম্পদ গ্রামীণ ও জাতীয় উন্নয়নের অবদান রাখতে পারে।

জাতীয় বননীতির উদ্দেশ্য

(১) দেশের বিভিন্ন খালি জায়গা, কৃষি ফসল উৎপাদনের অনুপোযুক্ত পতিত ও প্রান্তিক ভূমি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বনবিহীন এলাকায় সরকারি বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(২) দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ ও জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৃক্ষ ও বনভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা হবে।

(৩) পশুপাখির বিদ্যমান প্রাকৃতিক বিচরণ ক্ষেত্র ও আবাসস্থলসমূহ পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণপূর্বক পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা হবে।

(৪) বন উন্নয়নের সাথে মাটি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ এবং কৃষি বনায়নের মাধ্যমে কৃষি খাতকে শক্তিশালী করা হবে।

(৫) বনাঞ্চলে অবৈধ দখলকারী, গাছ চুরি, শিকার করা, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় জনসাধারণের মাধ্যমে রোধ করা হবে।

জাতীয় বননীতির ঘোষণা

(১) ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির শতকরা বিশ ভাগ সরকারি ও বেসরকারি বনায়নের আওতায় আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

(২) গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিকে, পুকুর পাড়ে এবং গৃহাঙ্গনে বৃক্ষায়ন ও বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। এবং গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা– ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুল, ঈদগাহ, মসজিদ–মক্তব, মন্দির ক্লাব, এতিমখানা, মাদ্রাসা, ইত্যাদি প্রাঙ্গনে এবং আশেপাশে খালি জায়গায় বৃক্ষায়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৩) প্রান্তিক ভূমি যথা- সড়ক, রেলপথ ও সকল প্রকার বাঁধের উভয় পার্শ্বে, খাস পুকুরের চারপাশে জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(৪) শহর এলাকার পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্য দেশের প্রতিটি পৌর এলাকায় সরকারি উদ্যোগে বিশেষ বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(৫) রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলে বৃক্ষবিহীন পাহাড়ি এলাকায় ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(৬) মাটি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা উন্নয়নের নিমিত্তে সরকারি মালিকানাধীন সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

(৭) বন, পানি, মাছ ও বন্যপ্রাণী সম্বলিত সুন্দরবনের বিশেষ ধরনের জীব পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে এইসবের বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

(৮) পাহাড়ি বন ও শাল বন অঞ্চলে সরকারি মালিকাধীন সংরক্ষিত বনভূমির মাটি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বনজদ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে।

(৯) সংরক্ষিত বনভূমির যে সব এলাকা প্রায় বৃক্ষশূন্য স্থানে কৃষি বন পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত করা হবে।

(১০) পল্লী এলাকায় বনজ সম্পদভিত্তিক শ্রম নিবিড় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

(১১) দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় প্রাপ্ত তহবিল হতে ব্যক্তিখাতে বনায়ন ও বৃক্ষভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমকে কারিগরি, আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;

(১২) গৃহাঙ্গন ও খামার ভিত্তিক গ্রামীণ বনায়নে এবং অংশীদারিত্বভিত্তিক বনায়ন কার্যক্রমে মহিলাদের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে;

(১৩) বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় বন, কাঠ, জ্বালানি কাঠ ও অকাষ্ঠ-উপকরণের উৎপাদন ছাড়াও ফলমূলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লোকালয়ে ফলের গাছ রোপণের জন্য ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন কার্যক্রম

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

১৯৮৯ সনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় এবং সে সাথে পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়। জাতীয় ভিত্তিতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং উন্নয়ন প্রকল্পে মতামত দেয়ার দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয় পালন করছে. পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়াও বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন বিভাগ সংক্রান্ত কার্যক্রমও এ মন্ত্রণালয় দেখা-শেনা করে।

জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত 'পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫' এর আওতায় বায়ু-জনিত দূষণ, ভূমি, পানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদসহ জীবজন্তু সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্ব পালন পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর অর্পিত।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
জাতীয়ভিত্তিক আন্তঃসেক্টরাল সমস্যা	প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পরিবেশ কাউন্সিলের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিকরণ	পবম ও প্রধান-মন্ত্রীর কার্যালয়	নেমাপ সুপারিশ বাস্তবায়নার্থে জাতীয় কাউন্সিল এবং কার্যকরী কমিটিসমূহের সভা আহ্বান
স্থানীয়ভাবে আন্তঃ সেক্টরাল সমস্যা নিরসনে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর অভাব	বিভাগীয় পরিবেশ কমিটিসমূহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ কমিটি গঠন	ঐ	কিছু আর্থ পরিবেশ চিহ্নিত এলাকায় স্থানীয় পরিবেশ কমিটি গঠনপূর্বক পাইলট ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ।
			বিভিন্ন গ্রুপ কার্যক্রমের মাধ্যমে নেমাপ সুপারিশ বাস্তবায়নে কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।
			নেমাপ সুপারিশ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন লক্ষ্যে সেক্টরাল ও অন্যান্যভাবে অর্থনৈতিক ও আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সক্ষম করার জন্য এগুলোকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে ক্রমবর্ধিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদারকরণ	পবম নেমাপ সুপারিশ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন লক্ষ্যে সেক্টরাল ও অন্যান্যভাবে অর্থনৈতিক ও আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ	পরিবেশ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন ক্ষমতা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আন্তঃসেক্টরাল সমস্যা

পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিভিন্ন সেক্টরে বিস্তৃত এবং স্বাভাবিকভাবেই এগুলি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতা বহির্ভূত। সেকারণেই আন্তঃমন্ত্রণালয়, বিভিন্ন পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিরসনকল্পে কমিয়ে আনার জন্য যথাযথ কাঠামো সম্পন্ন 'সেটআপ' উদ্ভাবন প্রয়োজন।

স্থানীয় পরিবেশ

স্থানীয় এমন কোনো ব্যবস্থা বর্তমানে নেই, যাতে স্থানীয় পরিবেশ–সংশ্লিষ্ট আন্তঃসেক্টরাল সমস্যাসমূহ সুরাহা করা যেতে পারে। বিভাগীয় পর্যায়ে অবশ্য পরিবেশ কমিটি আছে, কিন্তু সেগুলো প্রায়ই কার্যকরি দায়িত্ব পালন করছে না।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

শুধু সরকারের পক্ষে এককভাবে পরিবেশসংশিষ্ট সমস্যাসমূহ সমাধান করা সম্ভব নয় বিধায় এ বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষসহ বেসরকারি সংস্থাসমূহকে কার্যকরি ভূমিকা ও অবদান রাখতে হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও পেশার মানুষের মধ্যে পরিবেশ সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা আনয়ন ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে এদেরকে এসব কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা দরকার।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে জোরদারকরণ .

১. জাতীয় পরিবেশ নীতির আওতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে ব্যাপক কর্তব্য পালনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২. পরিবেশ আইন–এর (১৯৯৪ পর্যন্ত) অপর্যাপ্ত এবং কার্যকারিতার অভাবের কারণে পরম ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এর বাস্তবায়ন খুব একটা ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারছে না। এমতাবস্থায় মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে আরও কার্যকরিভাবে জোরদার করা দরকার।

৩. বর্তমান পরিবেশ নীতিতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, পরিবেশ আইনে (১৯৯৫) উক্ত অধিদপ্তরকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ সব ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের জন্যও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ :

সাইক্লোন, বন্যা, খরা, টর্নেডো এবং মরুময়তা ইত্যাদি বাংলাদেশের পরিবেশকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিপদসমূহ বর্তমান সরকারি নীতিতে প্রতিফলিত আছে , তবে এ সব বিষয়াদি মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক যে ব্যবস্থা থাকা দরকার,তা অত্যন্ত অপ্রতুল।

দুর্যোগ পূর্বাভাস প্রদান এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা সংক্রান্ত দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ কবলিত হয় এমন সব এলাকায় অপরিকল্পিত এবং কম স্থায়িত্বসম্পন্ন ঘরবাড়ি ইমারত নির্মাণ , প্রাকৃতিক দুর্যোগ অবনতিশীল পরিবেশ , নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব অত্যন্ত প্রকট।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
সময়মতো ও সঠিকভাবে বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস বিষয়ে পূর্বাভাস ঘোষণার ব্যবস্থা	প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে পূর্বাভাস প্রদানের কারিগরি ক্ষমতা উন্নয়নের ব্যবস্থা এবং কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন	ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, আবহাওয়া অফিস এবং SPARSO	দুর্যোগ পূর্বাভাস প্রদানকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন
			FAP–১৯, FAP–২৫ এবং SWMC'র আওতায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উন্নীত বিষয়াদির সাথে বন্যার পূর্বাভাষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন
দুর্যোগ	পাইলট প্রকল্প	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, ত্রাণ মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান এবং দুর্যোগ কবলিত এলাকায় পাইলট প্রকল্প
দুর্যোগ পরবর্তী দুর্বল ও অসমন্বিত ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন	ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এডাব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	এনজিও অন্যদের সমন্বয়ে আন্তঃএজেন্সী সমন্বয় সেল স্থাপন ও এর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
	বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে তা মোকাবেলার জন্য জিও এনজিওদের কার্যক্ষমতার ব্যাপারে ডাটাবেস স্থাপন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, এডাব	বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেস স্থাপন

শিল্প, পানিসম্পদ ও জ্বালানি

(ক) শিল্প

কৃষি ও বনভূমিতে শিল্প স্থাপনের কারণে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তিমূলে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কারণ ঘটাচ্ছে। ইতোপূর্বে স্থাপিত শিল্পসমূহ ইতোমধ্যে বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যার কারণ ঘটাচ্ছে, যদিও শিল্পসমূহ মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে অবস্থিত। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আশেপাশের যে সব এলাকায় বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশ দূষণের কারণ ঘটাচ্ছে শিল্প সেক্টরে পরিবেশ দূষণের মূল কারণ হলো শিল্পসমূহে দূষণ রোধকরণ সংক্রান্ত সুবিধার অভাব। শিল্পপতিদের অনেকের মধ্যেই পরিবেশ সচেতনতার অভাব অত্যন্ত তীব্র, সম্পদের সুষম এবং যথাযথ ব্যবহারের কারিগরি সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা এবং সর্বোপরি, শিল্প স্থাপন একক চিহ্নিতকরণে যথাযথ নীতিমালার অভাব। তাছাড়া, Pollution Abatement Regulation এবং Environment Quality Standards এবং নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশ নীতি এবং পরিবেশ আইন– ১৯৯৫ কে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না।

শিল্প

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিবর্গ/সংস্থা
শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট দূষণ	যথাযথ নীতিমালার আওতায় নির্গত ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি শোধনের ব্যবস্থাকরণ	সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটসমূহ
		শিল্প মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিল্প সেক্টর
শিল্প দূষণে প্রতিরোধ কমানোর জন্য যথাযথ কারিগরি সুযোগ–সুবিধা	কারিগরি জ্ঞান সম্প্রসারণ	শিল্প মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিল্প সেক্টর
		শিল্প মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিল্প চেম্বার
শিল্প বর্জ্য আবর্জনা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা/আইনের অভাব	বেসরকারি সেক্টরকে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও ঋণ বিতরণকারী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
	নীতিমালা এবং দূষণ সংক্রান্ত মাত্রা নির্ধারণ	পরিবেশ অধিদপ্তর/শিল্প মন্ত্রণালয়

(খ) পানিসম্পদ

পানি সম্পদের সুষম ব্যবহার এমনভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার স্থায়ী চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। তবে এ সেক্টরে উন্নয়ন এমনভাবে করতে হবে যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয় কিংবা ক্ষতি কম হয়। বিভিন্ন বাঁধ, ড্যাম ইত্যাদি কারণে মৎস্য সম্পদ, কৃষি, নৌ-চলাচল পথ, হাওড় বাওড়, জনবসতি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে। এ সব সমস্যা নিরসনে প্রয়োজন ভরাটকৃত নদী, নালা ইত্যাদি পুনঃখনন, সেচের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা, অবৈধভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস ও গাছ কাটা বন্ধকরণ, বন্যার পানি চলাচল সুগম করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক কালভার্ট, ব্রিজ নির্মাণ, বন্যা সেচ সংক্রান্ত বাঁধ, ইত্যাদি নির্মাণ।

পানিসম্পদ

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
বন্যা এবং বন্যাজনিত কারণে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি	জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশসম্মত বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্প প্রণয়ন/বাস্তবায়ন
			কতিপয় চিহ্নিত/মনোনীত প্রকল্পে কেস স্টাডি ব্যবস্থা
নীতিমালার অভাবে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প প্রণয়নের সময় পরিবেশ বিষয় বিবেচনায় না আনা	পানি সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবেশগত বিষয়াদি পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান	FAP-১৬ নীতিমালা পুনঃপরীক্ষা এবং এর উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে নতুন নীতিমালার প্রণয়ন
FAP প্রণয়নে জনগণের অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ	FAP বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যবিধি প্রণয়ন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পবম,	এডাব, সিইএন ইত্যাদির সহযোগিতায় নীতি কার্যবিধি প্রণয়ন
			জিও এনজিও সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণে প্রচারধর্মী কার্যক্রম প্রণয়ন

বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহ প্রণয়নে দুর্বল ডিজাইন ও পরিকল্পনা	প্রকল্পের ডিজাইন ইত্যাদি পুনঃপরীক্ষা বর্তমান চালু প্রকল্পসমূহসহ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পবম	পরিবেশগত বিষয় বিবেচনায় এনে বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ডিজাইন পুনঃপরীক্ষা
বিভিন্ন বিল, হাওর ইত্যাদি পানি প্রবাহের জন্য নালার ব্যবস্থা, জলাবদ্ধতা, বন্যা, নদীর তলদেশে পলি জমা ও জীববৈচিত্র্য	সমস্যার যথাসম্ভব সমাধানের ব্যবস্থা	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পবম	পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন
পানি প্রবাহ ও বন্যার তথ্যের অপর্যাপ্ততা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব	পানি সেক্টরে সার্বিক তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ	পবম	এর সহযোগিতায় পানি সম্পদ
মাটির নিচের পানি সম্পদ আহরণে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ যার ফলে পানি উত্তোলনের সমস্যা	নীতিমালা প্রণয়ন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ পবম	নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রভাব সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনাসহ

(গ) জ্বালানি

গৃহে রান্নাবান্না ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত জৈবিক পদার্থ (biomass) পরিমিতভাবে ব্যবহার না করার জন্য জ্বালানি সমস্যা বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজকর্মেও জ্বালানি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

জ্বালানি

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যকর
জৈবিক জ্বালানি কাঠ, গোবর ও কৃষিজাত খড় ইত্যাদির উপর অতি নির্ভরতা	কৃষি বর্জ্য এবং গোবর ইত্যাদির বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে গণসচেতনা সৃষ্টি	সামাজিক সংস্থা এনজিও, পবম	বিকল্প জ্বালানি ব্যবস্থা সম্পর্কে গণ প্রচারণা, সমাবেশ ইত্যাদির আয়োজন
	বিকল্প জ্বালানির উদ্ভাবন	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান	জৈবিক গ্যাস সৌর জ্বালানি ইত্যাদির উপর প্রকল্প প্রণয়ন

ব্যাপকভাবে বনাঞ্চল উজাড়	সমাজের লোকদেরকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ	বনবিভাগ, স্থানীয় সরকার, এনজিও, সামাজিক সংস্থা	জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন, সমিতি-ভিত্তিক বনায়ন, কৃষিবন সৃজন
জ্বালানি সংরক্ষণ বিষয়ে জনসচেনতার অভাব	জনসচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ	পরিবেশ অধিদপ্তর সামাজিক সংগঠন এনজিও	তথ্য মাধ্যমের সহযোগিতায় জনসচেতনা বৃদ্ধি কার্যক্রম
			রেডিও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান আয়োজন
জ্বালানি সংস্থান	উন্নতমানের চুল্লীর প্রচলন	গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরিদপ্তর, অধিদপ্তর, সামাজিক সংগঠন এনজিও	পাইলট প্রকল্প
			উন্নতমানের সস্তা চুল্লী তৈরির জন্য গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ

বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য

বাংলাদেশে বনাঞ্চলের ক্রমবিকাশ ঘটছে এবং বর্তমানে তা নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে। মানবজীবন সমৃদ্ধতর করা ছাড়াও বন্যসম্পদ, জীবজন্তু পশুপাখি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বৃক্ষসম্পদ প্রভূত উপকার করে থাকে।

বনায়ন, বন্যপ্রাণী ও জীব বৈচিত্র্যের বিষয় হলো বনভূমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তর এবং ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য বনাঞ্চল জবর দখল, বনসম্পদের অবক্ষয়, প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ধ্বংস করে বাণিজ্যিক বিবেচনায় বনাঞ্চল সৃজন, বনজঙ্গলে অবস্থিত জলাধার, বিল ইত্যাদির দুর্বল ব্যবস্থাপনা।

বনায়ন এবং জীববৈচিত্র্য (ক)

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থা	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
বনায়ন : জাতীয় বন নীতিমালা	পরিবেশগত চাহিদার আলোকে একটি জাতীয় বননীতি ও যথাযথ আইন প্রণয়ন	বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন, ভূমি, সংস্থাপন, আইন ও বিচার কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বর্তমানের বননীতি/কার্যক্রম, আইন, বিধি, বন মহা পরিকল্পনা, খসড়া এনজিএস, জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ইত্যাদি পর্যালোচনা, পুনঃ পরীক্ষা এবং জনগণের মতামত নিয়ে জাতীয় বনায়ন নীতি প্রণয়ন

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার	সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এর বাস্তবায়ন কাজ পৃথকীকরণ, বাস্তবায়ন	বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার	খসড়া ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা পুনঃ পরীক্ষা/পর্যালোচনা, সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে আলোচনাক্রমে পিসিপি প্রণয়ন
বনজ সম্পদের অবক্ষয়	বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, পল্লী অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ কার্যাদি বৃদ্ধিকরণ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/ বন অধিদপ্তর/ সামাজিক সংস্থাসমূহ/এনজিও	জনগণকে সম্পৃক্ত করে, টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে জাতীয় বননীতি প্রণয়ন ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
			সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বনাঞ্চলের উন্নততর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাযথ পরিবেশ সংরক্ষণে ও বন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এসব কাজে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ
			পরিবারভিত্তিক বনায়ন/বৃক্ষায়ন কর্মকাণ্ড বিস্তৃতিকরণে সহযোগিতা প্রদান এবং বেসরকারী খাতে নার্সারি স্থাপন কর্মকাণ্ডে সমর্থন প্রদান
			বনায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি আপটুডেট করণ, বন ও বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার সঠিক ও হালনাগাদ মানচিত্র প্রণয়ন ভিত্তিক তথ্যাদি সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য (খ)

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
	সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, তথ্য মাধ্যম সামাজিক সংস্থাসমূহ এনজিও	সব তথ্য মাধ্যমের সহযোগিতায় বনায়ন জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ, পাশাপাশি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এতদবিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা
বন্যপ্রাণী : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ	বন্যপ্রাণী, পশুপাখি, ব্যাঙ, চিতাবাঘ, সাপ ইত্যাদি সংরক্ষণে অগ্রাধিকার প্রদান	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, তথ্য মাধ্যম সামাজিক সংস্থাসমূহ এনজিও	বন্যপ্রাণী, পশুপাখি, এবং সাপ, চিতা ইত্যাদি সম্পর্কে জরিপ কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সবের বর্তমান অবস্থা/ সংখ্যা সম্পর্কিত মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন। বন্যপ্রাণী নিধন সম্পূর্ণরূপে বন্ধকরণ। বন্যপ্রাণীর চামড়া, কাঁকড়া কচ্ছপ ইত্যাদির রপ্তানি বন্ধকরণ, মৌসুমী পাখি নিধন না করা এবং এজন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন
জীববৈচিত্র্য : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ	পরিবেশ ও বন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, বন গবেষণাগার	বীজাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ স্থাপন, নতুন নতুন বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং চিড়িয়াখানা স্থাপন ও এগুলোর উন্নয়ন সাধন। বিভিন্ন তথ্য ও প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা
	আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ/ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর	পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য কমিশন গঠন এবং অভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত তথ্যের আদান-প্রদান

মৃত্তিকা সম্পদ

মৃত্তিকা বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং এর অতি ব্যবহারের কারণে এর অবক্ষয় সুবিদিত। বাংলাদেশের প্রায় সব ভূমি, শস্য উৎপাদন, নগরায়ন, বনায়ন এবং মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত থাকায় খালি ভূমি প্রাপ্তিতা বর্তমানে একটি বড় সমস্যা। ভূমির সুষ্ঠু ও উৎপাদনশীল

ব্যবহার বিষয়ক সার্বিক কোনো জাতীয় ভূমি নীতি এখন পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। কৃষিজমির ক্রম সংকোচন, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, খাস ভূমি বরাদ্দে পুরানো আমলের নীতি প্রয়োগ, ইত্যাদি প্রচুর সমস্যা রয়েছে।

মৃত্তিকা

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থা	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
অটেকসই মৃত্তিকা ব্যবহার	টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ	কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও	কার্যকরী এবং মাঠভিত্তিক গবেষণা
			উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক বিষয়ে সমীক্ষা এবং তার বাস্তবায়ন
জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস	ভূমির উর্বরতার বর্তমান অবস্থা জরিপ, জমির উর্বরতা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের ব্যবস্থা গ্রহণ	এস আর ডি আই গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ	উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক বিষয়ে সমীক্ষা এবং তার বাস্তবায়ন ভূমির উর্বরতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে জরিপ ও মানচিত্র প্রণয়ন
অবক্ষয়িত ভূমি, ভূমির ব্যবস্থাপনা	অবক্ষয়িত ভূমির ইনভেনটারি ব্যবস্থাকরণ, মানচিত্র প্রণয়ন এবং ভূমির যথাযথ ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা	এস আর ডি আই, স্পারসো, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ	জরিপ এবং মানচিত্র প্রণয়ন
ভূমি সম্পদের বর্তমান অবস্থা ইনভেনটরি, শ্রেণীবিন্যাস এবং আইনগত অবস্থা।	জাতীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপকরণ জি আইএস ও অন্যান্য আধুনিক কম্পিউটার পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবস্থা	ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ	বাস্তব ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার ও তার শ্রেণীবিন্যাস, আইনগত অবস্থা এবং পরবর্তীতে একইভাবে ভূমি পুনঃ-ব্যবহারে সুপারিশকরণ
সনাতন ও পুরানো আমলের ভূমি রেকর্ড ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি	পদ্ধতির উন্নয়ন	ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ	পাইলট স্টাডি এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য ক্ষেত্রে তা প্রচলনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন

ভূমি ভোগদখল, ভূমি ব্যবহার ইত্যাদি সমস্যা নিরসনে ভূমি নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন	সার্বিক ভূমি নীতি প্রণয়ন	ভূমি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন। ভূমি স্বত্বাধিকার এবং ব্যবহার কাঠামোভিত্তিক ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা। পরিবেশসম্মত ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে ভূমিহীনদেরকে খাস জমি বরাদ্দকরণ
ভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ	চট্টগ্রাম/মধুপুর ও সিলেট অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালুতে ভূমি ক্ষয়জনিত সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা	কৃষি মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর, সামাজিক সংগঠনসমূহ, এনজিও	কৃষি বন সৃজন পদ্ধতি, বৃক্ষায়ন ও যথাযথ ভূমি ব্যবহার পাইলট প্রকল্প প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে

মৎস্য, পশু সম্পদ

পুষ্টি সরবরাহ, কাজের সংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মৎস্য সেক্টর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের মোট প্রাণিজ আমিষ খাদ্যের প্রায় ৮০ ভাগ চাহিদা মৎস্য থেকে মেটানো হয়। অন্যদিকে পশু ও হাঁস মুরগী 'সাব সেক্টর' ও কৃষিভিত্তিক এ দেশের অর্থনীতিতে এটি বড় ভূমিকা পালন করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বাঁধ, ব্যারেজ, ড্যামসহ বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণের কারণে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াসহ মুক্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাছাড়া, ক্রমবর্ধিত জমিতে কীটনাশক, রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারসহ অপরিশোধিত শিল্প বর্জ্যপদার্থ নদী ও খাল-বিলে নিক্ষেপ উৎক্ষেপণের ফলে মৎস্য সম্পদের ক্ষতিসাধিত হচ্ছে।

মৎস্য ও পশু সম্পদ (ক)

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
জলজ জীববৈচিত্র্যের বিনাশ	মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ, ইত্যাদি প্রাণীর মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় এনজিও	মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এতদসংক্রান্ত কনসেপ্ট পেপার প্রণয়ন
মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আধারসমূহের দুর্বল ব্যবস্থাপনা	বাণিজ্যিক ও আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসবের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিজ্ঞানসম্মত মৎস্য আহরণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সরকারি মালিকানাধীন জলাধারসমূহের জন্য) প্রণয়ন

উপকূল অঞ্চলে/সমুদ্রে অধিকহারে মৎস্য আহরণ	অধিকহারে মৎস্য আহরণজনিত নেতিবাচক প্রভাবের বিচার বিশ্লেষণপূর্বক সময়, মৌসুম ও পরিমাণগত আহরণ	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন এজেন্সি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ

মৎস্য ও পশুসম্পদ (খ)

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ব্যক্তি	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
উদ্ভিদ/জীবজন্তুর স্বাভাবিক আবাস ক্ষেত্রের ক্ষতিসাধন	মৎস্য ও জলজ বিভিন্ন সম্পদ এবং বৃক্ষ ইত্যাদির প্রবৃদ্ধির জন্য জলাভূমির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	পবম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ অধিদপ্তর	মৎস্য, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর লালন পালন ও প্রবৃদ্ধির স্থায়ী মুক্ত জলাধার বরাদ্দের জন্য পবম প্রয়োজনীয় মাধ্যম প্রণয়ন
			মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের ব্যবস্থা
			সমাপ্তকৃত কিছু পানি সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের কেইস স্টাডির ব্যবস্থা (নেমাপ পদ্ধতির অনুসরণে)
বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ ইত্যাদির কারণে নদীর মোহনায় মৎস্য সম্পদের উপর প্রতিকূল প্রভাব	অপরিশোধিত শিল্প বর্জ্য ফেলা নিষিদ্ধকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত প্রতিরোধ আইন/বিধি বাস্তবায়ন	পানি সম্পদ, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, এনজিও ও জনগণ	সামুদ্রিক মৎস্যের উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের প্রভাব সম্পর্কে দুই মন্ত্রণালয় কর্তৃক যুগ্মভাবে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

মুক্ত জলাভূমির দূষণ ও ক্ষতিসাধন	প্রতিটি শিল্পে পরিশোধনকারী ও বাস্তবায়ন সকল নতুন শিল্প স্থাপনে বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন প্লান্ট স্থাপন	পবম/শিল্প, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
	বিভিন্ন বিষাক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক পদার্থ নদী ও খাল-বিলে যাতে নির্গত না হয় তার ব্যবস্থাকরণ এবং কম ক্ষতিকর কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার সংক্রান্ত	পবম	বিভিন্ন অয়েল ট্যাংকার থেকে তেল জাতীয় পদার্থ নির্গমন সম্পর্কে পরিমাপের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
	সমন্বিত পোকামাকড় বিনাশকারী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ	পবম ও স্থানীয় সরকার বিভাগ	পবম কর্তৃক এতদসংক্রান্ত যথাযথ আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন
		পবম ও স্থানীয় সরকার বিভাগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন জৈব রসায়ন বর্জ্য পদার্থ যা বিভিন্ন জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত করা হয় তার মনিটরিং-এর ব্যবস্থাকরণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন
		কৃষি, মৎস্য ও পবম	বিভিন্ন মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত রাসায়নিক পদার্থ কি কি ধরনের ক্ষতিসাধন করছে সে বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

গৃহায়ন ও নগরায়ন

অপরিকল্পিতভাবে শহর এলাকার বিস্তৃতি, জনসংখ্যার অতি ঘনত্ব, অপ্রতুল পয়ঃনিষ্কাশন সুযোগ-সুবিধার কারণে বিভিন্ন রোগের প্রসার, পয়ঃপ্রণালীর অব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গৃহায়ন ও নগরায়ন

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ব্যক্তি	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
অপরিকল্পিত নগরায়ন	শহর এলাকায় জমি ব্যবহারে নীতিমালা প্রণয়ন	পূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নগর উন্নয়ন অধিঃ	যথাযথ ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন
			অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব
			ইমারত নির্মাণের জন্য কঠোর নীতি ও বিধিমালা প্রণয়ন
			মলমূত্র, আবর্জনা এবং পয়ঃবর্জ্য ইত্যাদি পরিশোধনের ব্যবস্থা
শহরাঞ্চল প্লাবিত হওয়া	প্লাবন নিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ	রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, স্থানীয় সরকার প্রকৌঃ ব্যুরো	ছোট বড় নগর ও শহরের জন্য বন্যা প্রতিরোধক কার্যক্রম গ্রহণ
মলমূত্র, আবর্জনা ও পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা	ময়লা আবর্জনা পরিশোধন ও ময়লা আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থা	পৌরসভাসমূহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা	এনজিও, সামাজিক সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করে সরকার কর্তৃক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ
			বহুতলা ইমারত নির্মাণের জন্য নতুন আঞ্চলিক এলাকা পরিকল্পনা
অপর্যাপ্ত ও অস্বাস্থ্যকর গৃহায়ন সুবিধা	সমাজের দরিদ্রতর উন্নত গৃহ বাসস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি	রাজউক	গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য এনজিও ও বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা
			কমমূল্যে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

			যথাযথ পানি সরবরাহ পরিকল্পনা
			রোজগার করার জন্য গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ
			প্রচার, প্রচারণা নীতি সম্পর্কিত কার্যক্রম

কৃষি

নিবিড় চাষাবাদ এবং সেচ এলাকার ক্রমবৃদ্ধি বেশ কিছু পরিবেশ সমস্যারও উদ্ভব ঘটিয়েছে। বনভূমিকে কৃষি জমিতে পরিণত করার কারণে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন, উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনের ফলে দেশের কৌলিক (genetic) সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি, কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস, বিল হাওর অঞ্চলের পশুপাখির বিনাশ, ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষি

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ব্যক্তি	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারজনিত কারণে বীজ সম্পদের বিলুপ্তি	বংশগত প্রজনন বীজের সংরক্ষণ	জিওবি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	বীজ ব্যাংক স্থাপন ও স্থানীয় বিভিন্ন বন্য বীজের উপর তথ্য সংগ্রহ
	বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ও ভূমির বহুবিধ ব্যবহারের ব্যবস্থা।	জিওবি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শস্য উৎপাদন প্যাটার্ন-এর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ
বিভিন্ন কৃষি রাসায়নিকের অতি ও অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস	রাসায়নিক কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার সংক্রান্ত যথাযথ বিধি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন	জিওবি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সামাজিক সংস্থাসমূহ, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান	আইন, বিধি, উপবিধি প্রণয়ন
শস্য উৎপাদনের জন্য ক্রমবর্ধিত ব্যবহারের প্রবণতা	কৃষিতে টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার	কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সামাজিক সংস্থা, এনজিও	পাইলট স্টাডি, মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম ও সম্প্রসারিত কার্যক্রম।

BANSDOC Library Dhaka

শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাবার কারণে নদী, খাল-বিল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে সেচের পানি প্রাপ্তির অপর্যাপ্ততা	সেচকাজে মাটির নিচের এবং খালবিল নদীনালার পানির টেকসই ব্যবহার	জিওবি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ	যথাযথ এবং উপযুক্ত বিধি উপবিধি প্রণয়ন
		সামাজিক সংস্থাসমূহ, এনজিও	ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম টেকসই, কার্যক্রম গ্রহণ
জমিতে পোকামাকড়ের উপদ্রব/আক্রমণ ও অন্যান্য রোগবালাই	সমন্বিত পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	জিওবি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক সংস্থাসমূহ, এনজিও জনগণ	পাইলট প্রকল্প, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ
			কর্মভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ
অধিক ফসল উৎপাদন প্রবণতা ইত্যাদি কারণে জমির উর্বরতার উপর প্রতিকূল প্রভাব	মাঠ পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে যথাযথ জমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রণয়ন	জিওবি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক সংস্থাসমূহ, এনজিও, জনগণ	যথাযথ জমি ব্যবহার, ব্যবস্থাপনার উপর মাঠ পর্যায়ে গবেষণা
মাটির উর্বরতা নষ্ট করে এমন ধরনের কৃষি বর্জ্য অপসারণ	কৃষি বর্জ্য ব্যবহার উপযোগী উন্নতমানের চুল্লী তৈরির ব্যবস্থা, কাঠের বিকল্প জ্বালানি সংস্থান	গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক সংস্থাসমূহ, এনজিও	গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যুগোপযোগী কারিগরি ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় বিষয় ও কার্যক্রম

স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইস্যু হিসেবে একীভূত করে নিচে বর্ণিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়।

ক) চর এলাকার সমস্যাবলী ;

খ) মধুপুর গড়ের সমস্যা ;

গ) বরেন্দ্র এলাকার সমস্যা ;
ঘ) জলাশয় সমস্যা ;
ঙ) পাহাড় কাটা ;
চ) লবণাক্ততা সমস্যা ;
ছ) চিংড়ি ও উপকূলীয় সামুদ্রিক সম্পদ ;
জ) প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যা ;

চর এলাকার সমস্যা

নদীতে পলি জমে এবং নদীর এক পাড় ভেঙে অন্য পাড় জেগে উঠার ফলে চরাভূমির সৃষ্টি হয়। এতে চরাভূমির স্থায়িত্ব লাভ করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগে যায়। বড় বড় নদী যেমন– মেঘনা, পদ্মা, যমুনা নদীর অনেক চরেই জনবসতি গড়ে উঠেছে। আবার এ সব চরাভূমি বিভিন্ন পাখি এবং জলজ প্রাণীর চারণভূমিও বটে। এ সব চরাভূমির বিজ্ঞানসম্মত, পরিবেশসম্মত উন্নয়ন সাধনের জন্য কার্যকরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন দরকার।

চর এলাকা

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
ক্রম ভাঙনের কারণে চরাভূমির অস্থায়িত্ব	কারিগরি কার্যক্রম, সীমিত জমি ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, বনায়নের মাধ্যমে ভূমি ভাঙন রোধকরণ	ভূমি মন্ত্রণালয়	নির্বিচারে ভূমি ব্যবহার রোধ
			উপকূলের তীর ঘেঁষে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহণ
গাছপালা গুল্ম ইত্যাদির অভাব	বনায়ন কার্যক্রম	সামাজিক সংগঠন সমূহ, এনজিও, বন অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার	উপকূলের তীর ঘেঁষে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
অবারিত ভূমি ব্যবহার	চরাভূমি ব্যবস্থাপনা এবং নির্বিচার ভূমি ব্যবহার রোধ	ভূমি মন্ত্রণালয়	ভূমি ব্যবহার কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে চরাভূমি ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রণয়ন
			ভূমি জরিপ ও সেটেলমেন্ট পদ্ধতির সংশোধন
			জনগণকে সম্পৃক্ত করে চরাভূমির সেটেলমেন্ট কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থাকরণ

মধুপুর গড় ও বরেন্দ্র অঞ্চল বিষয়াবলী

মধুপুর গড় বনাঞ্চলে পরিবেশ অবনতি রোধকল্পে জরুরি ব্যবস্থা নেয়া দরকার। মাটির উর্বরতা শক্তি, আর্দ্রতা ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। উৎপাদন ক্ষমতা বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে অনেক কমে গেছে। প্রাকৃতিক গাছপালা, উদ্ভিদ, গুল্ম ইত্যাদির পরিমাণও খুব কম। বসতি এলাকায় ও গাছ এতো দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং সে অঞ্চলে এখন জ্বালানি কাঠের সংকট চলছে। তবে বৃক্ষ পুনঃরোপণের কোনো উদ্যোগ আয়োজনও সেখানে পরিলক্ষিত হয় না। ভূমি সংরক্ষণ উদ্যোগের অভাবে মাটির উপরিভাগ অহরহ ক্ষয় হচ্ছে।

পরিবেশগত অবক্ষয়রোধ এবং স্থায়ী ও টেকসই কৃষি উৎপাদনের স্বার্থে সেখানে ভূমিক্ষয় প্রবণতা রোধ করতে হবে, গাছপালা, গুল্ম ইত্যাদির বিস্তৃতি ঘটাতে হবে এবং উঁচুভূমিতে কৃষি উৎপাদন সম্প্রসারিত করতে হবে।

মধুপুর গড়

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কতৃপক্ষ/সংস্থা	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
সরকারি বনের জমি অবৈধ জবরদখল	বিভিন্ন জোনে বিভক্তকরণ এবং নিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবহার	পবম ও ভূমি মন্ত্রণালয়	নিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবহার এবং অঞ্চলীকরণের (Zoning) মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন
বনভূমি উজাড়, কৃষিজমিতে রূপান্তর, শিল্পস্থাপন ইত্যাদি	বনভূমি জোনে বিভক্তকরণ এবং নিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবহার	পবম ও ভূমি মন্ত্রণালয়	নিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবহার এবং অঞ্চলীকরণের (Zoning) মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন
জীববৈচিত্র্যের বিনাশসাধন (উদ্ভিদ ও প্রাণী)	সংরক্ষিত বন এলাকা গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ	পবম, বন অধিদপ্তর, এনজিও	মধুপুর গড়ের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সংরক্ষণ এলাকা চিহ্নিত করে ব্যবস্থাপনার নিশ্চিতকরণ
ভূমি অবক্ষয় ও জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস ভূমিক্ষয়	বনায়ন, বিভিন্ন জোনে বনাঞ্চল বিভক্তি এবং ভূমি সংরক্ষণ	পবম, বনঅধিদপ্তর, এনজিও	বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহার ও ভূমি অঞ্চলীকরণের (Zoning) ব্যবস্থাকরণ
জমি এবং বন সম্পদ বিষয়ে আইনগত জটিলতা	বনভূমি মালিকানা সংক্রান্ত জটিল সমস্যার নিরসন	পবম, বন অধিঃ ভূমি মন্ত্রণালয়	প্রয়োজনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায়/ আলোচনাক্রমে বনভূমি সংক্রান্ত জটিলতার নিরসন

বরেন্দ্র ভূমি

রাজশাহী, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জে অবস্থিত বরেন্দ্র এলাকা আবহাওয়াগতভাবে দেশের সবচেয়ে চরমভাবাপন্ন এলাকা। উক্ত এলাকা প্রায় প্রতিবছরই খরার কবলে পড়ে এবং মরুময়তার অবস্থা সেখানে দৃশ্যমান। উক্ত এলাকা প্রতিবেশগতভাবে অত্যন্ত নাজুক এলাকা হিসেবে পরিচিত এবং এ অঞ্চলের গাছপালা, লতাগুল্ম ইত্যাদির পরিমাণ খুবই কম। উক্ত এলাকা প্রায়শই ভূমিক্ষয়ের কবলে নিপতিত। মাটির নিচ হতে পানি আহরণজনিত কারণে জমিতে সেচের উপর নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত প্রকট।

বরেন্দ্র অঞ্চল

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
ব্যাপকভিত্তিক বন উজাড়	ব্যাপকভিত্তিক বনায়ন	বন অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার ইউনিটসমূহ, সামাজিক সংগঠন	জনগণকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ
			ভূমির নিচের পানির পরিমাণ জরিপ
মাটির নিচের পানি উত্তোলন	মাটির নিচের পানির জরিপ এবং পরিবেশসম্মত পানির দক্ষ ব্যবস্থা	বরেন্দ্র উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার পানি উন্নয়ন বোর্ড	ভূমির নিচে অবস্থিত পানি আহরণ, পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
পুকুর, খালবিল, মৌসুমভিত্তিক জলাধার ভরাট	মৎস্য চাষ ও সেচের পানি প্রাপ্তির জন্য পুকুর খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন	বরেন্দ্র উন্নয়ন বোর্ড, মৎস্য অধিদপ্তর	কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় পুকুর খালবিল পুনঃখনন কর্মসূচি গ্রহণ
			মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান
ভূমির অবক্ষয়	মাটির সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ	এস আরডি আই বরেন্দ্র উন্নয়ন বোর্ড	যথাযথ ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ
মরুময়তার পূর্বাভাস	গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ	গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ	মরুকরণ প্রক্রিয়া/মরুময়তার উপর বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ

জলাভূমির বিষয়াবলী

জলাভূমির ক্রমসংকোচন পরিবেশ অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। এটি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট ঘটনার কারণে ঘটেছে। জলাধারসমূহ সংকুচিত হওয়ার ফলে মাছের ডিম পাড়ার মুক্ত জলাশয় এলাকা বিলুপ্ত হয়েছে। যে সব কারণে জলাভূমি সংশ্লিষ্ট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো হলো,

কৃষিকাজ বৃদ্ধিজনিত কারণে, জলাশয়গুলোর সংকোচন, জলাশয় সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি, অপরিকল্পিত কালভার্ট, বাঁধ, অবকাঠামো ইত্যাদি নির্মাণের কারণে বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি এবং বন্যার পানি নিষ্কাশনের জটিলতা।

জলাভূমি

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
জলাভূমির জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	কিছু চিহ্নিত জলাশয়ের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ
			জলাশয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অভয় জলাশয় ঘোষণার ব্যবস্থাকরণ
সমন্বিত জলাভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অভাব	সামগ্রিক জলাশয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নীতি প্রণয়ন	পরিবেশ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এনজিও	সমন্বিত জলাশয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রণয়ন

পাহাড় কাটাজনিত বিষয়

শহর/নগর এলাকা নির্মাণ বা সম্প্রসারণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কারণে পাহাড় কাটার ঘটনা ঘটছে এবং এর ফলে নালা, ড্রেইন ইত্যাদিতে মাটি, পলি ও বালি ইত্যাদি জমে জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং জমাট পানি উপচে পড়ে বিভিন্ন সমস্যার কারণ ঘটাচ্ছে। তাছাড়া পাহাড় কাটার কারণে স্থানে স্থানে ধস নামছে, সে পাহাড়গুলোসহ আশেপাশের পাহাড়গুলো ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ায় এদের স্থায়িত্ব হুমকির সম্মুখীন। পাশাপশি নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হচ্ছে, বন্য প্রাণীর অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির শেষ পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে পাহাড় কাটা, পাথর আহরণ ইত্যাদি কারণে বন উজাড় হয়ে যাচ্ছে, পানি চলাচল তথা ঢালুতে পানি নামার যে প্রাকৃতিক নালাগুলো ছিল, সেগুলোর অধিকাংশই ভরাট হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

পাহাড় কাটা

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
পলি জমার মাত্রা বৃদ্ধি, নালা, ড্রেইন, ভরাট হয়ে প্লাবন সৃষ্টি	পাহাড় কাটা বন্ধকরণ আইন/বিধির প্রয়োগ	পরিদপ্তর অধিদপ্তর, পৌর সভাসমূহ	পাহাড় কাটা বন্ধকরণ সংক্রান্ত আইনের কার্যকরী প্রয়োগ

মাটি ভাঙার মাত্রা ভিত্তি, বনাঞ্চল নষ্ট হয়ে যাওয়া	বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পাহাড়গুলো সংরক্ষণ	সরকারি সংস্থা, দপ্তর, বন অধিদপ্তর, বেসরকারি সেক্টর	পাহাড়ি অঞ্চলে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রমের আওতায় অধিক হারে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা
বনাঞ্চল উজাড়, পাহাড় থেকে নির্বিচার পাথর আহরণ	পরিবেশ নষ্ট হয় না। এমন ধরনের শর্তে পাথর আহরণের সুযোগ প্রদান	পরিবেশ অধিদপ্তর, সামাজিক সংগঠন-সমূহ, এনজিও	তথ্য মাধ্যম, টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র, সামাজিক সংগঠনসমূহ কর্তৃক গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা
	যে সব পাহাড় বৃক্ষহীন হয়ে পড়েছে সেগুলোতে পুনঃবনায়ন	বন অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়	সরকারি খাস জমিতে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ, বনভূমিতে বন অধিদপ্তর ও সামাজিক সংগঠন-সমূহের মাধ্যমে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ

লবণাক্ততা ও চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত বিষয়

বিগত বছরগুলোতে চিংড়ি চাষ উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তবে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ এলাকা সম্প্রসারণের কারণে স্থানে স্থানে পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত পানি বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লবণাক্ততা ও চিংড়ি চাষ

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির সংকোচন	চিংড়ি চাষের জন্য এলাকা চিহ্নিতকরণ	পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়	নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন
কৃষি উৎপাদন ও চিংড়ি চাষের মধ্যে দ্বন্দ্ব	চিংড়ি চাষের জন্য এলাকা চিহ্নিতকরণ	পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়	নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন
অবাধ চিংড়ি রেণু সংগ্রহের কারণে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন	চিংড়ি চাষের জন্য এলাকা চিহ্নিতকরণ	পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়	নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন

	সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিংড়ি চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা	মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্যজীবী সংগঠন,	চিংড়ি রেণু সংগ্রহ বিষয়ক পরিবেশ সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ।
			সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন
	চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন	মৎস্য অধিদপ্তর, বেসরকারি সেক্টর	বেসরকারি সেক্টরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ ব্যবস্থা

উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়

এর মধ্যে রয়েছে পৌরসভা ও শিল্প ইউনিটসমূহ থেকে নিক্ষিপ্ত বর্জ্য ও আবর্জনাসমূহ—যা উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার পরিবেশ দূষণ করছে, জাহাজ ও অন্যান্য নৌযান কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ/ফেলার বিষয় কার্যকরী নিয়ন্ত্রণমূলক, আইনের অভাব, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কেটে চিংড়ি চাষ এলাকা সম্প্রসারণ, উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অনুপস্থিতি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের অবক্ষয় এবং সংকোচন এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল অবস্থা।

উপকূলীয় সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যবস্থাপনার অভাব	সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ	পরিঃ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়	সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ এবং পাইলট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বৃক্ষরাজির ধ্বংস	বনায়ন	বন অধিদপ্তর, এনজিও	জনগণকে সম্পৃক্তকরণ বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
জাহাজ ও অন্যান্য নৌযানের মাধ্যমে উপকূলীয় পানি দূষণ	সমুদ্র সীমানায় প্রচলিত আইনের প্রয়োগ	নৌ–মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের আইন প্রয়োগ ক্ষমতা ও সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধিকরণ

জাহাজ ভাঙার কারখানাসহ দূষণযুক্ত বিভিন্ন শিল্প ইউনিটের একই অঞ্চলে স্থাপন	ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, এনজিও	উপকূলীয় জোন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় ভূমি ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কার্যক্রম গ্রহণ
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির প্রকোপ	প্রাকৃতিক বিপদ সংকেত ব্যবহারের আধুনিকায়ন	তথ্য মাধ্যম এনজিও,	সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ
নতুন সৃষ্টি চর এলাকায় ক্রমবর্ধনশীল চিংড়ি মাছের চাষ	উপকূলীয় জোন ব্যবস্থাপনার বিধি প্রণয়ন	পরিবেশ অধিদপ্তর	উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন যাতে জমি ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি থাকবে
			নতুন জেগে উঠা চরাঞ্চলের জন্য পরিবেশসম্মত ভূমি বরাদ্দ/ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন
পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ এবং এর ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব	বিবেচনাধীন সব পানি সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশ ইস্যুসমূহ সম্পৃক্তকরণ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পানি উন্নয়ন বোর্ড	পরিবেশ নীতিমালাকে উন্নয়ন সাধন
			উপকূলীয় অঞ্চলে কিছু বাস্তবায়িত সেচ, পানি প্রকল্পের উপর সমীক্ষার ব্যবহার
বন্য জীবজন্তুর বিনাশ/অবলুপ্তি	বিভিন্ন চরাঞ্চলকে বন্যপ্রাণী নিরাপদ অঞ্চল ঘোষণা	বন অধিদপ্তর	বন্য প্রাণী ও এদের বাসস্থান সম্পর্কে জরিপ
			তথ্য মাধ্যম, রেডিও, টিভির মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা
			সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন
			জনগণকে সম্পৃক্ত করে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ

দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা ও কার্যক্রম : জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রস্ফীতি

গত প্রায় শতাধিক বছরে বাংলাদেশকে ঘিরে যে অঞ্চল বিস্তৃত, তার তাপমাত্রা প্রায় ৩.৫ সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর গোলার্ধব্যাপী এ তাপমাত্রার বৃদ্ধি প্রায় পূর্বাপর একই রকম। বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে ২০৩০ সন নাগাদ বাংলাদেশের তাপমাত্রা বর্তমানের তুলনায় ০.৫ থেকে ২.০ সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেতে পারে।

এ প্রেক্ষাপটে গ্রীনহাউজ, গ্যাস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের পরিমাণ নিরূপণের ব্যাপারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমান জলবায়ুগত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশের জন্য সমন্বিত প্রভাব সংশ্লিষ্ট মডেল করা জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রস্তরের বিস্তৃতি

বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ কর্তৃপক্ষ	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম
সমুদ্রস্তর বৃদ্ধিজনিত প্রভাব	সমুদ্রস্তর বৃদ্ধিজনিত কারণ ও প্রভাবের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ব্যবস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান	সমীক্ষার ভিত্তিতে সমুদ্র স্তর বৃদ্ধি/ স্ফীতিজনিত বিষয়ে সমীক্ষাকাজ
খরা এবং মরুকরণ প্রক্রিয়ার কারণে বিভিন্ন খাতে অনিশ্চয়তর উদ্ভব	খরা ও মরুকরণ প্রক্রিয়া। মরুময়তার প্রভাব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরিচালনা	পরিবেশ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান	মডেলিং সমীক্ষা
			জনগণের মধ্যে প্রচারের লক্ষ্যে পুস্তক প্রণয়ন এবং তথ্য মাধ্যমকে ব্যবহার

পঞ্চম অধ্যায়

বনের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বনের বর্তমান অবস্থা

যে কোনো ভৌগোলিক অবস্থানের বা এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি ন্যূনতম পরিমাণ বন থাকতে হয়। বনভূমির এ পরিমাণ এলাকার মোট আয়তনের ২৫% থেকে ৪০% হতে পারে। তবে বনের পরিমাণ ২৫% এর কম হলে জলবায়ু, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীব বৈচিত্র্য বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশে এক শতাব্দী আগেও ২৫% এর বেশি বনভূমি ও বন ছিল। কিন্তু বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ ও বনজ এলাকার পরিমাণ খুবই কমে গেছে। সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের বনের আয়তন ১৫% থেকে ১৬%। তবে বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী এদেশে প্রকৃত বনের পরিমাণ এর চেয়ে অনেক কমে গেছে, ১০% এর নিচে নেমে গেছে। যাহোক, বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বর্তমান অবস্থা বনের প্রকারভেদে নিচে উল্লেখ করা যায়।

পাহাড়ি বন

১. পাহাড়ি বনের পরিমাণ ও বড় গাছের সংখ্যা দ্রুত হারে কমছে;

২. পাহাড়ি বনভূমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা কমছে;

৩. পাহাড়ি এলাকায় ভূমিক্ষয় ও মাটি কাটা বেড়ে গেছে;

৪. ভূমি ধস ও খরায় পাহাড়ি বনের ক্ষতি হচ্ছে;

৫. পাহাড়ি বনের উপর জীবন নির্বাহ নির্ভরতা বেড়ে গেছে।

বনজ সম্পদ ও বনভূমির বিবরণ (১৯৮৯ সালের হিসাব)

বনজ সম্পদের নাম	বনজ সম্পদের পরিমাণ
কাঠ	৩৫০ হাজার ঘন মিঃ
জ্বালানি	৭৮৮ হাজার ঘন মিঃ
গোলপাতা	৮৬ হাজার মেঃ টন
বাঁশ	৫২৭৪ হাজার টন
কুচিভ পাতা	১৮ টন
বেত	৬০৮০ হাজার টন
মধু	১০০টন

বাংলাদেশের বনভূমির বিবরণ (১৯৮৮ সালের হিসাব)

বনভূমির ধরন	পরিমাণ (বর্গ কিলোমিটার)
সংরক্ষিত বনভূমি	১৪২৭৩
দখলকৃত বনভূমি	১২৫১
অর্পিত বনভূমি	৯৮
আশ্রিত বনভূমি	৫৭৮
পানি উন্নয়ন বোর্ড ও খাস বনভূমি	১৫৩
মোট	১৯২১৮ বা ১৩.৩৫%
চিরসবুজ ও পাতাঝরা বনভূমি	৪৯৫০
পাতাঝরা বনভূমি	৯২০
ম্যানগ্রোভ বনভূমি	২১৯১
তৃণভূমি	৪০
মোট	৮১০০

সূত্র : SPB. 1990

সমতল ভূমির বনের বর্তমান অবস্থা

১. সমতল ভূমির বনের পরিমাণ দিন দিন কমছে ;

২. সমতল বন ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেছে ;

৩. সমতল বনাঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে ;

৪. সমতল বনাঞ্চলের ভূমি অনাবরিত হয়ে যাচ্ছে ;

৫. সমতল বন ভূমিতে ভূমিক্ষয় বেড়ে গেছে ;

৬. সমতল বনাঞ্চলে অনেক স্থানে সরকারি পরিকল্পনার অধীনে বহু ব্যবহারমুখীসহ ফল গাছ ও লাগানো হচ্ছে ;

৭. সমতল বনাঞ্চলে ঝোপ-ঝাড় কমে গিয়ে বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে।

ম্যানগ্রোভ বনের বর্তমান অবস্থা

১. ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবনের আয়তন দ্রুত না কমলে ও গাছের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে ;

২. খালের পাড় ভূমিক্ষয়ে ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ;

৩. বনের বন্য প্রাণীর প্রকার ও সংখ্যা কমে গেছে ;

৪. রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও হরিণের সংখ্যা কমে গেছে ;

৫. বছরের সময়ে সময়ে সেখানকার পানির লবণাক্ততা বেড়ে যায় ;

৬. সুন্দরবনের খালের গভীরতা কমে যাওয়ায় এবং যান্ত্রিক যানবাহনের চলাচলে জলজ প্রাণীর প্রকার ও সংখ্যা কমে গেছে।

সামাজিক বনের বর্তমান অবস্থা

১. সামাজিক বনের মধ্যে বসত বনের আয়তন ও বৈচিত্র্য কমছে ;

২. প্রাতিষ্ঠানিক বৃক্ষ রোপণের হার বেড়েছে তবে সেক্ষেত্রে বৃক্ষের বৈচিত্র্যতা কম ;

৩. সড়ক ও বাঁধে বনায়নের কাজ জোরদার করা হয়েছে;

৪. বেসরকারি বন বাগান প্রতিষ্ঠার হার বাড়ছে;

৫. আকস্মিক বন্যায় অনেক সামাজিক বন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে;

৬. সামাজিক বনায়ন বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সাড়া পড়েছে;

৭. প্রধানত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে সামাজিক বন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বন ধ্বংসের কারণ

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সব ধরনের বনই ক্রমধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে। এখানে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধ্বংসের প্রধান প্রধান কারণ উল্লেখ করা হলো—

১. **জ্বালানি ব্যবহার :** দেশের জ্বালানি চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে বন থেকে অধিক হারে গাছ কাটা।

২. **নির্মাণ কাঠ :** দেশে ঘর নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য গাছ কাটার হার বেড়ে যাওয়া।

৩. **আসবাবপত্র :** আবাসিক প্রয়োজনে আসবাবপত্র তৈরির জন্য মূল্যবান গাছ কেটে ফেলা।

৪. **আবাসস্থল :** বর্ধিত আবাসস্থলের প্রয়োজনে বন কেটে ঘরবাড়ি তৈরি করা।

৫. **ফসল চাষ :** মাঠ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন কেটে মাঠ ফসলের চাষাবাদ সম্প্রসারণ করা।

৬. **ঝড় ঝঞ্জা :** ঝড়-ঝঞ্জার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় গাছপালা বিনষ্ট হওয়া।

৭. **বন্যা :** বন্যায় মাঝারি উঁচু ও নিচু জমির বন বিনষ্ট হওয়া।

৮. **খরা :** খরায় বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

৯. **ভূমিক্ষয় :** ভূমিক্ষয় বনভূমি নষ্ট হওয়া ও ভূমির উর্বরতা কমে যাওয়া।

১০. **বন্য প্রাণীর বিলুপ্তি :** বন্য প্রাণীর বিলুপ্তি বা সংখ্যা কমে যাওয়ায় অনুপ্রবেশকারীর কার্যাবলী বেড়ে যাওয়া।

১১. **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বনায়ন :** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনায়ন না করা।

১২. **সামাজিক বনায়ন :** সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণ না থাকা।

১৩. **বন ও বন্য প্রাণী আইন :** বন ও বন্য প্রাণী আইনে সীমাবদ্ধ থাকা।

বাংলাদেশের বনবিধি

বন, বনভূমি ও বন্য প্রাণী বনাঞ্চলের জন্য বিশ্বের সকল দেশেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনকানুন রয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাকৃতিক ও তৈরি সম্পদ হিসেবে বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশে দুটি সুনির্দিষ্ট আইন প্রচলিত রয়েছে। বনভূমি ও বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে ১৯২৭ সালে প্রথম আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন শুরু হয়। কিন্তু যুগের চাহিদা ও পরিস্থিতি মোকাবেলার সুবিধার্থে এই আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক

১৯৯০ সালে সংশোধিত হয়। বনভূমি ও বনজ সম্পদের পাশাপাশি বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭৪ সালে একটি আইনের প্রচলন করা হয়। তারপর ১৯৯২ সালে সরকার কর্তৃক বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বনবিধি ও বন্য প্রাণী বিধি বাস্তবায়ন করা হয়।

বনবিধির উদাহরণ

বাংলাদেশ বনবিধি অনুসারে নিম্নলিখিত কার্যাবলী শাস্তিযোগ্য অপরাধ–

১. বিনা অনুমতিতে সরকারি বনভূমিতে প্রবেশ করা ;
২. বনভূমি জবরদখল করা ;
৩. বনভূমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ ;
৪. বনভূমিতে চাষাবাদ করা ;
৫. বনভূমিতে বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা ;
৬. বনভূমি থেকে বিনা অনুমতিতে গাছ অপসারণ বা পরিবহণ করা ;
৭. বন বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তি না মানা ;
৮. বন বিভাগীয় কর্মকর্তার নির্দেশ অমান্য করা।

বনবিধির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আইন, নির্দেশ ও বিজ্ঞপ্তি অমান্য করার জন্য নিম্নরূপ শাস্তি হতে পারে :

ক. কম পক্ষে এক বছরের জেল ;
খ. এক বছরের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ;
গ. উর্ধ্বে দুই বছরের জেল ;
ঘ. দু' বছরের জেলসহ সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা।

সাধারণত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বন অপরাধের বিচার হয়ে থাকে।

বন্য প্রাণী বিধি

বাংলাদেশে প্রণীত বন্য প্রাণী বিধি অনুসারে নিম্নলিখিত কার্যাবলী অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। যথা–

১. বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশের যে কোনো বন্য প্রাণী ধরা ;
২. বিনা অনুমতিতে বন্য প্রাণী শিকার করা ;
৩. বন্য প্রাণী বিষ প্রয়োগে হত্যা করা ;
৪. বিনা অনুমতিতে বন্য প্রাণী পোষা ;

বন্য প্রাণী বিধি অমান্যের জন্য নিম্নবর্ণিত শাস্তি হতে পারে ;

যথা–

১. কমপক্ষে ৬ মাসের জেল ;
২. ছয় মাসের জেলসহ ২ হাজার টাকা জরিমানা ;
৩. উর্ধ্বে ২ বছরের জেল ;

প্রথম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বন্য প্রাণী বিধি অমান্যের বিচার।

বাংলাদেশে বনায়নের সম্ভাবনা

১. বাংলাদেশের মাটির গুণাবলী ও জলবায়ু বনায়নের অনুকূল।

২. এখানে অসংখ্য প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করা সম্ভব।

৩. পাহাড়ি বনের পুনর্বাসন করে বনের উৎপাদন ২ থেকে ৩ গুণ করা সম্ভব।

৪. বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবনের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও বন সংরক্ষণের মাধ্যমে কাঠের উৎপাদন কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব।

৫. বাংলাদেশের উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে উপযুক্ত প্রজাতির সমন্বয়ে বনায়ন করে বনজ সম্পদ অনেক বাড়ানো সম্ভব।

৬. বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। বনভূমির পরিমাণ ২০% থেকে ২৫% এ উন্নীত করা সম্ভব।

৭. বাংলাদেশে সরকারি পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব।

থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প এবং উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী মডেল

কৃষি বাগানের মডেল

১৯৯২ সালের থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প দলিলে ৬টি মডেল অনুমোদিত হয়। বর্তমানে নিচে প্রদত্ত ৬টি মডেল অনুসারে ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রংপুর রাজশাহী, কুমিল্লা বনবিভাগে কৃষিবন বাগান সৃজনের কাজ চলছে।

(১) **কৃষিবন বাগানের উদ্দেশ্য :** কাঠ, জ্বালানি কাঠ ফল ও পশুখাদ্যের গাছ এবং খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকের চাহিদা পূরণ করা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন।

(২) **অংশগ্রহণকারী :** গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র (যার ০.২০ হেক্টর জমি আছে)।

(৩) **ভূমি বরাদ্দ ও ভূমি ব্যবহারের বিন্যাস**

(ক) প্রতিটি অংশগ্রহণকারী পরিবার ১.২১ হেক্টর (৩.০ একর) জমি কৃষি বন বাগানের জন্য পাবেন।

(খ) ০.২০ হেক্টর (০.৫০ একর) জমি বসতবাড়ির জন্য বরাদ্দ দিতে হবে যাতে ফলফলাদি ও সবজির বাগান সৃষ্টি করতে পারেন।

(গ) বসতবাড়িতে উন্নত ফলের গাছ লাগাতে হবে যদি কৃষক উৎসাহী হন তাহলে বাঁশ, সেগুন, গামার, মেহগনি বসতবাড়ির সীমানায় লাগাতে পারেন।

(ঘ) অবশিষ্ট ১.০১ হেক্টর (২.৫একর) জমিতে মডেল অনুসারে সারিবদ্ধভাবে (alley cropping) বাগান ও শস্যের চাষ করতে হবে।

(৪) **টেন্ডিং অপারেশন:** ১ম বছর ৩ বার। ২য় বছর থেকে কৃষক নিজে আগাছা পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবেন।

(৫) **রিজেনারেশন** (Regeneration): সাত বছর আবর্তকাল শেষে কৃষক নিজ খরচে গাছ কর্তন করবেন। ৪র্থ বছর কৃষক থিনিং, কপিজ কর্তন, দোডালা ছাঁটাই–এর কাজ করবেন।

বনায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ১.০১ হেক্টর জমিতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গাছ ও কৃষি ফসলের চাষ করা হয় ঃ-

মডেল ১ : কুঞ্জগলি শস্য উৎপাদান (Alley cropping)

মডেল ২ : কুঞ্জগলি শস্য উৎপাদান (Alley cropping)

মডেল ৩ : কুঞ্জগলি শস্য উৎপাদান (Alley cropping)

মডেল ৪ : সীমানা ঘেরা বনায়ন (Boundary planting)

মডেল ৫ : সীমানা ঘেরা ও ব্লক বনায়নের মিশ্র পদ্ধতি (Boundery planting &Block plantaion mixed model)।

মডেল ৬ : কন্টর প্লান্টিং/কুঞ্জগলি ক্রপিং (Contour planting/ Alley cropping)।

কুঞ্জগলি শস্য উৎপাদন

মডেল ১ : কুঞ্জগলি শস্য উৎপাদন

(১) স্ট্রিপে ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি, করই, অর্জুন, ম্যানজিয়াম, শিশু, বকাইন, খয়ের, ঝাউ গাছের চারা ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে।

(২) ২য় বছর চারার নিচের শাখাসমূহ ধারালো কাঁচি দ্বারা প্রুনিং করা হয় যাতে গাছের উচ্চতায় বৃদ্ধি তরান্বিত হয়।

(৩) ৪র্থ বছর পর্যায়ক্রমিকভাবে এক স্ট্রিপ গাছ রেখে অন্য স্ট্রিপের গাছ সম্পূর্ণ কেটে ফেলতে হবে।

(৪) যে সব স্ট্রিপ ৪র্থ বছরে কাটা যাবে সেখানে কপিজ ব্যবস্থাপনায় পুনরায় গাছ জন্মাতে হবে।

(৫) সাত বছর আবর্তকাল (rotation) শেষ হলে অবশিষ্ট স্ট্রিপের গাছ সম্পূর্ণভাবে কাটা যাবে।

মডেল ২: কুঞ্জগলি শস্য উৎপাদন

(১) ব্যবস্থাপনা মডেল-১ এর অনুরূপ।

(২) প্রতি হেক্টরে ১১১১টি চারা অর্থাৎ প্রতি একরে ৪৫০টি চারা রোপণ করা হয়ে থাকে।

মডেল ৩: কুঞ্জগলি শস্য উৎপাদন

(১) ব্যবস্থাপনা মডেল -১ এর অনুরূপ।

(২) প্রতি হেক্টর ৯৫২টি অর্থাৎ প্রতি একরে ৩৮৬টি চারা রোপণ করা হয়।

মডেল ৪: ঘেরা বনায়ন

যদি ২টি প্লট পাশাপাশি হয় তাহলে প্লটের মালিকগণ সংযুক্ত স্ট্রিপসমূহে ও ৩ সারি চারার পরিবর্তে ২ সারি চারা লাগাবেন।

(১) ব্যবস্থাপনা মডেল ১ এর অনুরূপ।

(২) প্রতি হেক্টরে ১৫০০টি অর্থাৎ প্রতি একরে ৬০৭টি চারা লাগানো হয়ে থাকে।

মডেল ৫: সীমানা ও ব্লক কৃষিবন মডেল

(১) এ মডেল উঁচু নিচু পাহাড়ি একালার উঁচু সমতল স্থানের জন্য উপযোগী।

(২) এ মডেলে জমির সীমানায় মডেল নং-৪ এর মতো চারা লাগানো হয়।

(৩) ব্লক বনায়ন সমোন্নতি রেখা বরাবর হতে হবে এবং গাছের লাইনের মাঝে অড়হর/ বগামেডুলার বীজ বপন করে বেড়া দেওয়া হয়।

(৪) গাছের ফাঁকে বা জমিতে কৃষকগণ আনারস, লেবু, ইপিল ইপিল, পেয়ারা ইত্যাদি চাষ করতে পারে।

(৫) প্রতি হেক্টরে ১০০০টি অর্থাৎ প্রতি একরে ৪৫০টি চারা লাগানো হয়ে থাকে।

মডেল ৬: কন্টুর প্লান্টিং/ এলি ক্রপিং

(১) এ মডেল সমতল ভূমিবিহীন উঁচু পাহাড়ি এলাকার জন্য উপযোগী।

(২) গাছের স্ট্রিপ সমূহ সমোন্নতি রেখা (contour lain) বরাবর হবে।

(৩) প্রতিটি স্ট্রিপে ৩ সারি গাছ লাগানো থাকে।

(৪) গাছের সারির মাঝে অড়হর/ বগামেডুলা/ ইপিল ইপিল এর বেড়া সৃষ্টি করতে হবে।

(৫) ২টি স্ট্রিপের মাঝে জমি চাষ করে শস্যের আবাদ করা যাবে না।

টনগিয়া : এ পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন যাবৎ পাহাড়ি বনাঞ্চলে উপজাতীয় ফরেস্ট ভিলেজারদের মাধ্যমে বাগান সৃজন করা হয়েছে। ঝুম ফসলের মাঝে ৬ থেকে ৬ দূরত্বে গাছের চারা লাগানো হয়। ঝুমিয়ারা ১ম ও ২য় বৎসর ধান, ভুট্টা, তুলা মরিচ ও সবজি উৎপাদন করে। গাছের চারা বড় হলে আর সেখানে কোনো ফসল হয় না। এ পদ্ধতি পাহাড়ি বনাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

উডলট বাগানের মডেল

১। **বাগানের অবস্থান :** অবক্ষয়িত শাল বন, পতিত ও সরকারি খাস ভূমি।

২। **উদ্দেশ্য :** স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহার ও কুটির শিল্পের জন্য জ্বালানি কাঠ, খুঁটি ও ছোট-খাট কাঠ সরবরাহ।

৩। **বাগানের নমুনা :** দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির গাছের চারা ২ মি. থেকে ৩ মি. দূরত্বে প্রতি হেক্টরে ১৬৬৭টি লাগানো হয়ে থাকে।

৪। **চারা :** প্রস্তাবিত বাগানের নিকটে অস্থায়ী নার্সারিতে ১০-৬ (২৫ সেঃ মিঃ -১৫ সেঃ মিঃ সাইজের) পলিব্যাগে বছরের শুরুতে (জানুয়ারি/ ফেব্রুয়ারি) চারা উত্তোলন করা হয়।

৫। **প্রজাতি :** শালবন একালায় আকাশমনি, ম্যানজিয়াম, ইউক্যালিপটাস, কড়ই, অর্জুন (নিচু এলাকায়), লোহাকাঠ, টুন, ঝাউ, মেহগনি শাল ইত্যাদি ব্লকে বা মিশ্রিতভাবে লাগাতে হবে। পলি ও অম্লত্ববিহীন মাটিতে শিশু, ইপিল ইপিল, তরুল, বকাইন ইত্যাদি প্রজাতির চারা ও অন্যান্য গাছের সাথে লাগানো হয়।

৬। টেন্ডিং অপারেশন

প্রথম বছর : চারার গোড়ার চারদিকে ১-০ (৩০সেঃ মিঃ) ব্যাসার্ধে চক্রাকার ফালি করে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। তারপর প্রতি চারার গোড়ায় ১০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয়। এ কাজ ১ম বছর ৩বার করতে হবে। ১ম দফা জুলাই-আগস্ট, ২য়

দফা সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ও ৩য় দফা পরবর্তী বছরের মে–জুন মাসে করতে হয়। ১ম ও ২য় দফা টেন্ডিং এর সময় শূন্যস্থান পূরণের কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হয়।

দ্বিতীয় বছর : ১ম বছরের মতো ২ (দুই) দফায় চারার গোড়ায় থালি করে মাটি আলগা ও আগাছা বাছাই এর কাজ করতে হয়। টেন্ডিং এর সময় চারার গোড়ার ডালা–পালা কেটে দিতে হবে যাতে চারার বৃদ্ধি ব্যাহত না হয়। এ সময় দ্বৈত ডালাও কাটতে হয়। ১ম ও ২য় দফা টেন্ডিং যথাক্রমে জুলাই–আগষ্ট ও পরবর্তী বছরের মে-জুন মাসে করতে হয়।

সারিবদ্ধ বনায়ন

সারিবদ্ধ বনায়ন বা স্ট্রিপ বনায়ন সামাজিক বনায়নের একটি উল্লেখযোগ্য উৎপাদন কৌশল। এ পদ্ধতিতে রাস্তা রেলপথ, বাঁধ ও সংযোগ সড়কের দু'পাশে এক বা একাধিক লাইনে বনায়ন করা হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সারিবদ্ধ বনায়ন কর্মসূচী ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করার সুযোগ রয়েছে। Statistical Year Book of Bangladesh, 1991 এ প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় আমাদের দেশে ১২,৯৬০.১৫ কিঃমিঃ মহাসড়ক ও সংযোগ সড়ক, ২,৭৪৬.০ কিঃ মিঃ রেলপথ, ৪,৮০০ কিঃ মিঃ বাঁধ এবং ২–৩ লক্ষ কাউন্সিল সড়ক হয়েছে। ১৯৮২ সাল থেকে কমিউনিটি ও বন সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় ৩,৯০৮ মাইল স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছিল। বন বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য এনজিও যেমন— RDRS BRAC, PROSHIKA, TMSS, POUSH ইত্যাদি সংস্থা বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির খাদ্য সহায়তায় এবং নিজস্ব কর্মসূচির আলোকে সারা দেশে ব্যাপকভাবে সারিবদ্ধ বাগান সৃজন করছেন। ১৯৯০ সাল থেকে থানা বনায়নও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের (পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প) আওতায় স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সারিবদ্ধ বনায়ন পদ্ধতিতে বাগান সৃজন কর্মসূচী চালু আছে। ১৯৯২–৯৩ সাথে পূর্বের মডেলসমূহ আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে প্রকল্প দলিলে ৩টি মডেল অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১) মডেল ঃ (বড় সড়ক, রেলপথ ও বাঁধ বনায়ন)

২) মডেল ঃ (সংযোগ সড়ক ও গ্রামীণ রাস্তা বনায়ন)

৩) মডেল ঃ (মহাসড়ক ও উঁচু রেলপথ বনায়ন)

প্রজাতি নির্বাচন ঃ রাস্তার পাশের কৃষি জমিতে যাতে অধিক ছায়া না পড়ে এবং ফসল যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রজাতি নির্ধারণ করতে হয়। সেজন্য ছোট মুকুট সম্পন্ন, ছোট পাতাযুক্ত ও ডালা–পালা কর্তন সহনীয় (Lopping hardy) গাছ নির্বাচন করতে হয়। যেমন– শিশু, বাবলা, কড়ই, ইউক্যালিপটাস, ঝাউ, খেজুর ও তাল ইত্যাদি।

টেন্ডিং অপারেশন ঃ মডেল ১–এর অনুরূপ।

মডেল–৩

অবস্থান ঃ উঁচু বাঁধ ও রেল রাস্তার জন্য প্রযোজ্য এবং ঢালসমূহ যথেষ্ট প্রশস্ত হতে হয়।

বর্ণনা

১। এ মডেলটির নিচের ও উপরের সারির গাছ ও জীবন্ত বেড়া মডেল ১ এর অনুরূপ। তবে যথেষ্ট জায়গা থাকায় গাছের দুই সারির মাঝে তৃতীয় বা ততোধিক সারিতে গাছ রোপণ করা হয়। তবে ৩ সারি চারা ধরে মডেলটি বর্ণনা করা হয়েছে।

২। এ মডেল ১ কিলোমিটারে সর্বমোট ২৪০০টি চারা লাগানো হয়।

৩। রোপণ পদ্ধতি, পরিচর্যা, টেন্ডিং আপারেশন ইত্যাদি মডেল ১-এর অনুরূপ।

সারিবদ্ধ বাগানের গাছের বৈশিষ্ট্য

১। গাছের ডালসমূহ যেন শক্ত হয়।

২। চিরহরিৎ হয় (অর্থাৎ একসাথে পাতা না ঝরে)।

৩। ঝাঁকড়া মাথাবিশিষ্ট হয় (বসতিপূর্ণ এলাকায় সরু মাথাওয়ালা গাছ উপযুক্ত)।

৪। গাছের আকৃতি প্রকৃতিতে পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

৫। গাছের ফুল যেন সুন্দর হয় ও ফলসমূহ সুস্বাদু হয়।

৬। মাটির প্রকৃতি ও এলাকার অবস্থানের উপর বিবেচনা করে প্রজাতি নির্বাচন করতে হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষি বনায়ন

সংজ্ঞা ও ধারণা

কৃষি বনায়ন (Agroforestry) আজকাল একটি জনপ্রিয় বিষয়। কিন্তু এই বিষয়টির বহুল ব্যবহার থাকায় বৈজ্ঞানিকগণ একে সংজ্ঞায়িত করতে পার্থক্যপূর্ণ মতামত পোষণ করেছেন। নিচে এ বিষয়ক কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

বিজ্ঞান হিসেবে : কৃষি বনায়ন

যে বিজ্ঞান মূলত কাষ্ঠল গাছ, বন্য পশু–পাখি অথবা ফসল উদ্ভিদের আন্তঃক্রিয়া নিয়ে চর্চা করে তাকে কৃষি বনায়ন বিজ্ঞান বলা যায় (As a science, agroforestry is the study of interaction between woody vegetation and other animals and or crop plants)।

পদ্ধতি হিসেবে : কৃষি বনায়ন

যে পদ্ধতি বহু বর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে পরিবেশগত আন্তঃক্রিয়ার অনুকূলে বন্য পশু–পাখি এবং/অথবা ফসল উদ্ভিদের ব্যবস্থাপনা পরিচর্যাসহ সুনির্দিষ্টভাবে একক জমির ভূমি ব্যবহার করা হয় তাকে কৃষি বনায়ন পদ্ধতি বলা যায় (An agroforestry system is a specific land use and management practics on a unit of land where at least one perennial woody species is involved for ecological interactions with animals and/or crop plants)।

ICRAF, (1995)-এর মতে, কৃষি বনায়ন বলতে, সম্মিলিত ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি ও পরিচর্যা ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে একই জমির কৃষি ফসলে স্থান ও স্তর বিন্যাসে বহু বর্ষজীবী পরিকল্পিত কাষ্ঠল উদ্ভিদ ও পশুপালন করা হয় (All land use systems and practices where woody perennials are deliberately grown on the same land management unit as agricultural crops or animal in same form of spatial arrangement or temporal sequence)।

ধারণাগতভাবে কৃষি বনায়ন হচ্ছে সমন্বিত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যাতে কৃষি ফসল, পশু, মৎস্য এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবসা সহযোগে বহু বর্ষ কাষ্ঠল উদ্ভিদ জন্মানো অন্তর্ভুক্ত থাকে (By concept, agroforestry is an integrated land use system where woody perennials are grown in association with crops, livestock, fishes and any other agricultural enterprizes)।

কৃষি বনায়নের ধারণা

কৃষি বনায়নের ধারণাসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. কৃষি বনায়ন একটি প্রাচীন পদ্ধতি।

২. কৃষি বনায়নে প্রাচীন অভিজ্ঞতার সাথে আধুনিক প্রযুক্তি কৌশল সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৩. কৃষি বনায়নে একাধিক বিজ্ঞানী একসাথে কাজ করেন (যেমন— মৃত্তিকা বিজ্ঞানী, কৃষিতত্ত্ববিদ, উদ্যানতত্ত্ববিদ, পরিবেশ বিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ, ইত্যাদি)

৪. বর্তমানে কৃষি বনায়নের সাথে কৃষি পরিবেশগত (Agro-ecological) ধারণা যুক্ত হয়েছে।

৫. কৃষি বনায়নের পরিকল্পনা এককভাবে কোনো বিজ্ঞানী করতে পারেন না।

৬. কৃষি বনায়নের ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা সমাধান এককভাবে কোনো বিজ্ঞানী করতে পারেন না।

৭. মরুকরণ ও ভূমির অবক্ষয় রোধের জন্য কৃষি বনায়ন ইকরাফের (ICRAF-International Council for Research in Agroforestry) একটি অনুমোদিত নীতি।

৮. মিশ্র ফসল ও সীমনা গছ, বায়ুরোধী গাছ প্রভৃতি দিয়ে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

৯. টাংগিয়া, এলি ফসল, সবুজ বেড়া, বসত আশ্রয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষক গাছ কৃষিবন বৃক্ষের অন্তর্ভুক্ত।

১০. ফসলের মাঠে আন্দাজে গাছ লাগানো হলেই কৃষি বনায়ন হয় না, বরং কৃষি বনায়ন সুশৃংখল খামার পদ্ধতির একটি অংশ।

কৃষি বনায়নের পরিধি ও সুবিধা

কৃষি বনায়নের কার্য পরিধি অনেক ব্যাপক। পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি যাপন প্রক্রিয়ার সাথে কৃষি বনায়ন নানাভাবে যুক্ত রয়েছে। আধুনিক পরিবেশ ও কৃষি বিজ্ঞানে কৃষি বনায়নের অনেক সুবিধাও রয়েছে। এখানে কৃষিবন প্রক্রিয়ার পরিধি ও সুবিধা উল্লেখ করা হলো।

কৃষি বনায়নের কার্য পরিধি

১. পারিবারিক খাদ্য, জ্বালানি ও নির্মাণ কাঠ সরবরাহের ক্ষেত্রে কৃষি বনায়নের পর্যাপ্ত ভূমিকা রয়েছে।

২. সামাজিক বনায়নে কৃষি বনায়নের নীতি পদ্ধতি পালন করা যায়।

৩. জাতীয় আয়-ব্যয় ও কর্মসংস্থানে কৃষি বনায়নের ব্যাপক অবদান রয়েছে।

৪. বন পুনর্বাসনে কৃষি বনায়ন কৌশলসমূহ অবলম্বন করা যায়।

৫. খামার পদ্ধতির একাধিক উপপদ্ধতির সাথে কৃষি বনায়ন সম্পৃক্ত রয়েছে।

৬. শুষ্ক নিরক্ষীয় অঞ্চলে মরুকরণ নিরুৎসাহিত করার জন্য কৃষি বনায়ন পদ্ধতির বাস্তবায়ন খুবই সুবিধাজনক।

৭. কৃষি বনায়নের উপযুক্ত পদ্ধতি বৃষ্টিবহুল এলাকা ভূমিক্ষয় রোধ ও ভূমির উর্বরতা রক্ষা করে।

৮. প্রাকৃতিক বন ও বনায়নের সাথে কৃষি বনায়ন বিজ্ঞান ও পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৯. প্রাকৃতিক বন থেকে মাঠ ফসল এবং গহীন বন থেকে বসতবাড়ি — এগুলোর মাঝখানে কৃষি বনায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে।

১০. খামার পদ্ধতির আয় বৃদ্ধিকরণে কৃষি বনায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি বনায়নের ইতিহাস

আধুনিক মানব সভ্যতার জনক হচ্ছে কৃষক। প্রাচীন মানুষ থেকে শুরু করে আধুনিক মানুষ জীবন-যাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে ফসল চাষ, পশুপালন, বনায়ন প্রভৃতি কাজের উন্নয়ন সাধন করেছে। মানুষের এই কৃষিকাজভিত্তিক সভ্যতা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে উৎসারিত হয়েছে। দুনিয়ার কৃষি কাজের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে কৃষি বনায়ন। অর্থাৎ ফসল ও বনজ গাছ একই সাথে একই জমিতে আবাদ করা বা রোপণ করা, বন বাগানে পশুপালন করা। কৃষি বনায়নের ঐতিহ্য ও কার্যকারিতা বিষয়ে এলাকাভিত্তিক প্রমাণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

মেসোপোটেমিয়া কৃষি সভ্যতা

কৃষি বনায়ন সভ্যতার বয়স : ইরাক, ইরান, তুরস্ক, সিরিয়া, ও লেবানন সমন্বয়ে মেসোপটেমিয়া কৃষি বনায়ন সভ্যতা শুরু হয়েছে প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে।

প্রাচীন ফসল : মেসোপটেমিয়া এলাকায় ভুট্টা, সরগাম, স্কোয়াস ও শিমজাতীয় ফসলের চাষাবাদ শুরু করা হয়েছে প্রায় ৪ থেকে ৭ হাজার বছর আগে।

খামার পদ্ধতি গঠন : সেখানকার লোকগুলো বনে প্রথম উপযুক্ত গাছ নির্বাচন করে সেই গাছের পাতা ও ফল খায় এমন পশু নির্বাচন করে। তারপর ছোট ছোট দল হিসেবে সেখানে খামার পদ্ধতি গড়ে তুলতো।

সমন্বিত খামার স্থাপন : সময়ের ব্যবধানে ছোট ছোটি দলগুলো বড় হয়ে গেলে তা ক্রমে বড় খামার বা গ্রামে পরিণত হতো। এখন ছোট ছোট একাধিক খামার মিলিত হয়ে সমন্বিত খামার পদ্ধতি (Integrated jarring) গঠন করতো।

খামারের আধুনিকায়ন : উপস্থিত বৃক্ষের নিচে ভাল জন্মে এমন ফসলের চাষ দিন দিন বাড়তে থাকে। ফসল ও গাছের পরিচর্যা কাজের উন্নয়ন ঘটে। খাল কেটে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস সেচ সভ্যতা : টাইগ্রিস (Tigris) ও ইউফ্রেটিস (Eupherates) নদী থেকে শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে সেচের ব্যাপকতা বাড়তে থাকে। শুরু হয় ব্যাপকভাবে গাছ রোপণ ও ফসল চাষ। এসময়ে কৃষি বনায়নের পর্যাপ্ত উন্নয়ন ঘটে।

মিশরীয় নীলনদ সভ্যতা (Egypt Nile Civilization)

জলাভূমি পরিস্কার করা ও কৃষি উন্নয়ন সাধন : মিশরের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে নানারূপ ও বন্য গাছ জন্মাতো। এই জঙ্গল পরিষ্কার করে উন্নত ধরনের ফসল, গাছ ও পশুপালন শুরু হয়।

খামার স্থাপনে অগ্রাধিকার : মিশরে প্রথমে পশু পালন, তারপর পশু খাদ্য চাষ এবং সাথে সাথে দানা ফসলের চাষ ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে।

গ্রাম তৈরি : বিভিন্ন এলাকায় কৃষি বনায়নকে যেমন- বৃক্ষ রোপণ, পশু পালন ও ফসল চাষকে ভিত্তি করে অনেকগুলো খামার মিলে সমন্বিত খামারভিত্তিক গ্রাম গড়ে উঠে।

নীল নদ ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য : নীল নদ উপত্যকার কৃষি বনায়নভিত্তিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথমে ফল বৃক্ষ ও কাষ্ঠল বৃক্ষের চারা রোপণ, তারপর ক্রমে পশুপালন, পশু খাদ্য চাষ, মাঠ ফসল চাষ ও সবজি চাষ।

সিন্ধু সভ্যতা (Indus Valley Civilization)

পশু পালন : সিন্ধু সভ্যতার শুরুতেই মহিষ, গরু, ছাগল ভেড়া পালন গুরুত্ব পেয়েছিল।

কৃষি বনায়ন : পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সেখানে ফসলের মাঠে প্রথম উপযুক্ত বৃক্ষ রোপণ কাজ শুরু হয়।

ভূমি সংরক্ষণ : ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য সেখানেও কৃষি বনায়ন ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে।

গাছের প্রকার : এখানকার কৃষি বনায়নে আম, নারকেল, অ্যাকাশিয়া, বেল, বরই, খেজুর, লিউকেনা, কেশিয়া, গ্লিরিসিডিয়া, হেভিয়া, তেঁতুল প্রভৃতি গাছ অগ্রাধিকার পায়।

ফসলের প্রকার : সিন্ধু কৃষিবন এলাকার প্রধান ফসলের মধ্যে ছিল আদা, হলুদ, কলা, আনারস, গোলমরিচ, ক্যাসাবা, গাছ আলু বা ইয়াম ও ডাল ফসল।

চীন সভ্যতা : শাং (Shang) রাজ্য কৃষি বনায়ন কাজ শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সালে।

ভূমি সংরক্ষণ : ভূমির উর্বরতা রক্ষাকল্পে কৃষি বনায়নকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই কৃষি বনায়নে পলোনিয়া (Paulownia) গাছের ব্যবহার খুব বেশি।

কৃষি বনায়ন স্থান : সড়ক বাঁধ, নদীতীর, বসতবাড়ি ও ফসল মাঠে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

ইউরোপ সভ্যতা (European Civilization)

কৃষি বনায়ন : খ্রিষ্টপূর্ব ৪থেকে ৭ হাজার বছর আগে ইউরোপে ফলজ বৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ, ভেড়া, শূকর ও গবাদি পালন এবং ভুট্টা , গম ও বার্লি চাষ শুরু হয়।

সমন্বিত খামার : প্রারম্ভিক পর্যায়ে একই জমিতে বৃক্ষ, পশুপালন ও খাদ্য ফসল চাষের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আফ্রিকা সভ্যতা (African Civilization)

পশু শিকার ও পালন : খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ৬০০০ বছর আগে জঙ্গলে পশু শিকারের মাধ্যমে সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

কৃষি বনায়ন : এঙ্গোলা, চাদ, ইথিওপিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, নাইজার, সোমালিয়া, সুদান প্রভৃতি দেশে মরুকরণ হ্রাসের জন্য কৃষি বনায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেক্সিকো সভ্যতা (Mexican Civilization)

মিল্‌পা পদ্ধতি (Milpa) : পাহাড়ি ঝুম চাষের অনুরূপ পদ্ধতির মাধ্যমে আধুনিক কৃষিবনের উন্মেষ ঘটে।

কৃষি বনায়নের ব্যাপকতা : বর্তমানে মেক্সিকোতে কৃষি বনায়নের প্রক্রিয়া খুবই জোরদার করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

কৃষি বনায়ন খামারের বৈশিষ্ট্য

১. একই জমি থেকে অধিক আয়।
২. ফসল ও গাছের বৈচিত্র্য, তাতে উৎপাদন ঝুঁকি কম।
৩. খামার স্থায়িত্বশীল (sustainable)।
৪. খামারের কর্মসংস্থান বেশি।
৫. অনুন্নত খামার উন্নয়নের উপায়।
৬. একই জমি থেকে অধিক উৎপাদন।
৭. সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে (ecologically) গ্রহণযোগ্য।
৮. প্রান্তিক ভূমিজ সম্পদ ব্যবহার করা যায়।
৯. একাধারে ফসল খামার মালিক, মিশ্র খামার মালিক ও বন বাগান মালিকের চাহিদা পূরণ করে।
১০. স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করা যায়।
১১. উৎপন্ন দ্রব্য স্থানীয়ভাবে বিক্রি করা যায়।

কৃষিবন একটি প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি। তবে বর্তমান যুগে এর চাহিদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি বনায়ন পদ্ধতির দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশ রক্ষা,জ্বালানি সরবরাহ, কাঠ ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য কৃষিবন দেশে দেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করছে। বাংলাদেশে যুগের চাহিদার নিরিখে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কৃষি বনায়নের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষি বনায়নের সুবিধা

কৃষি বনায়নের মূল সুবিধাগুলো হচ্ছে –

১. এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা বেশি থাকে বলে নানা ধরনের খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত হয়। সাথে সাথে জ্বালানি ও কাষ্ঠল দ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করে।
২. উৎপাদিত সবুজ লতা-পাতা শিকড় সহজে পচে গিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়ায়।
৩. মাটির সংযুক্তি উন্নত করে, পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।
৪. লিগ্যুমজাতীয় উদ্ভিদ মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়।
৫. গভীরমূলী উদ্ভিদ মৃত্তিকা পুষ্টি উপাদানের অপচয় রোধ করে।
৬. মাটির অনুকূল তাপ বজায় রাখতে সহায়তা করে।
৭. বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয় রোধ করে।
৮. জলাভূমি পরিশোধনে সহায়তা করে।
৯. কৃষকের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ায়।
১০. কৃষকের ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে আনে।
১১. পরিবেশ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি বনায়ন শ্রেণিবিন্যাস

সারা বিশ্বে মৃত্তিকা ও জলবায়ুভেদে বহু ধরনের কৃষি বনায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও চালু হয়েছে। নানাভাবে এগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করা যায়। নিচে এসব শ্রেণিকরণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

১. **গাঠনিক শ্রেণিকরণ** (Structural classification)

গঠনের ভিত্তিতে কৃষি বনায়ন প্রধানত চার প্রকার হতে পারে।

ক. **কৃষিবন পদ্ধতি** (Agro silvicultural system)

১. কৃষি ফসল

২. বনজ উদ্ভিদ

উদাহরণ—মিশ্রফসল : খেজুর গাছ/কাঁঠাল গাছ এবং ধান।

আন্তঃ (Inter-croping) ফসল : ইউক্যালিপটাস/তেলিকদম এবং ধান।

খ. **বন-তৃণ পদ্ধতি** (Silvipastoral system)

১. বৃক্ষ

২. পশুখাদ্য

উদাহরণ—বন বাগান ও ঘাস উদ্ভিদ জন্মানো।

গ. **কৃষি-বন-তৃণ পদ্ধতি** (Agrosilvopastoral system)

ক. কৃষি ফসল (কৃষিবন পদ্ধতি)

খ. বনজ উদ্ভিদ (কৃষিবন পদ্ধতি)

গ. পশুখাদ্য (Grass/fodder)

ঘ. বহু ব্যবহারমুখী বৃক্ষ রোপণ পদ্ধতি (Multi purpose tree plantation system)

ক. কাষ্ঠল ও ফল গাছ–কাঁঠাল, আম

খ. জ্বালানি ও পশুখাদ্য — ইপিল ইপিল/গ্লিরিসিডিয়া

গ. অন্যান্য গাছ

উপপদ্ধতির প্রাধান্য অনুসারে শ্রেণিকরণ

ক. বনকৃষি (Silvi agriculture) পদ্ধতি : প্রধান বন বৃক্ষ। যেমন– ঝুম চাষ, টাংগিয়া পদ্ধতি।

খ. কৃষি বন (Agro silviculture) পদ্ধতি : প্রধান কৃষি ফসল। যেমন– এলি ফসল, ফসল মাঠে আন্তঃসারিতে বনজ গাছ।

গ. বন–তৃণ (Silvi pasture) পদ্ধতি : প্রধান বন বৃক্ষ যেমন– ঘাসী বন (Grazing forest)।

ঘ. কৃষি–বন–তৃণ (Agrosilvo pasture) পদ্ধতি : প্রধান কৃষি ফসল।

ঙ. বন–কৃষি–তৃণ (Silvo agropasture) পদ্ধতি : প্রধান বনজ বৃক্ষ। যেমন– বন বাগান ঘাস।

চ. তৃণ–বন (Pastoral silviculture) পদ্ধতি : প্রধান তৃণ ঘাস যেমন– তৃণ বা ঘাসী বন বাগান।

উপপদ্ধতির বিন্যাসভিত্তিক শ্রেণিকরণ (Arrangement of components)

বিভিন্ন উপপদ্ধতির স্থান ও সময় বিন্যাস অনুসারে কৃষি বনায়ন পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত শ্রেণিকরণ করা যায়।

ক. **স্থানবিন্যাস** (Space arrangements)

১. ঘন মিশ্র (Mixed dense) : গাছ খুব ঘন করে লাগানো হয়। যেমন– বসতবাড়ির জঙ্গল।

২. হালকা মিশ্র (Mixed sparse) : কৃষি ফসলের মাঝে মাঝে হালকাভাবে লাগানো গাছ। যেমন– মাঠ ফসল বনজ বৃক্ষ।

৩. ডোরা বৃক্ষ রোপণ (Strip plantation) : ফসল মাঠের চারদিকে ডোরা বা সারি লাগানো বৃক্ষ। মাঠ ফসল ও বনজ বৃক্ষের আন্তঃফসল ডোরা চাষ।

খ. **সময়বিন্যাস** (Time arrangements)

১. সমাবস্থান (Coincident) : একই সময়ে একাধিক ফসলের অবস্থান। যেমন– চা বাগানে ছায়া গাছ, তৃণভূমিতে বড় বৃক্ষ।

২. সহাবস্থান (Concomidant) : ক্রমান্বয়ে একের পর এক ফসলের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান। যেমন– টাংগিয়া পদ্ধতিতে কয়েক বছরের জন্য কৃষি ফসলের চাষাবাদ করা হয়।

৩. আন্তঃফসল (Intermittent) : যেমন– নারকেল বাগানে ধানের চাষ।

৪. পৃথকীকৃত (Separate) : ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ফসল। যেমন– ঝুম চাষ।

স্তরভিত্তিক বিন্যাস (Stratification of components)

ক. উলম্ব স্তর (Vertical stratification)

১. একস্তরবিশিষ্ট (Single layered) : যেমন বন বাগান, সীমানা গাছ।

২. দ্বিস্তরবিশিষ্ট (Double layer) : যেমন– কৃষিবন পদ্ধতি (Agrosilviculture), আকাশিয়া গাছের ফাঁকে ধানের চাষ।

৩. বহুস্তরবিশিষ্ট (Multi layered) : যেমন– মিশ্র বন বাগান, উঁচু স্তরে নারকেল, মধ্য স্তরে লেবু, নিচু স্তরে আনারস; আদা বসতবাড়িতেও এমন বিন্যাস থাকে।

কার্যভিত্তিক শ্রেণিকরণ (Functional classification)

কৃষি বনায়নের বহুবিধ কার্যাবলী রয়েছে যেমন– খাদ্য জ্বালানি ও নির্মাণ কাঠ সরবরাহ, ভূমির উর্বরতা রক্ষা ইত্যাদি। এখানে এসব কার্যাবলীর ভিত্তিতে কৃষি বনায়নের শ্রেণিকরণ উল্লেখ করা হলো।

১. **উৎপাদনশীল কৃষি বনায়ন পদ্ধতি** (Productive agroforestry system) : অত্যাবশ্যক পণ্য উৎপাদনকারী যথা– ফল, কাঠ, জ্বালানি, পশু ও খাদ্য।

২. **সংরক্ষণী কৃষি বনায়ন পদ্ধতি** (Protective agroforestry system) : -এর প্রধান কাজ হচ্ছে ভূমির উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা।

৩. **বহুমুখী কৃষি বনায়ন পদ্ধতি** (Multipurpose agroforestry system) : উৎপাদনশীল ও সংরক্ষণী উভয় প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থাপিত। যেমন– বসতবাড়ির বন, বহুমুখী বৃক্ষ রোপণ, সড়ক বাঁধ বৃক্ষ রোপণ, ইত্যাদি।

ফিজিওনমিক শ্রেণিকরণ (Physionomic classification)

পানি পরিস্থিতির ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ যেমন–

ক. **জলজ কৃষি বনায়ন পদ্ধতি** (Hydromorphic agroforestry system) : জলজ পরিবেশে খামার স্থাপন যেমন– হিজল বন, ধানের চাষ, মাছের চাষ।

খ. **মরুজ কৃষি বনায়ন পদ্ধতি** ((Xeromorphic agroforestry system) : শুষ্ক অঞ্চলে কৃষি বনায়ন, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় কৃষি বনায়ন।

গ. **আর্দ্রজ কৃষি বনায়ন পদ্ধতি** (Mesomorphic agroforestry system) : মাটি মধ্যম আর্দ্র, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় এ ধরনের কৃষি বনায়ন বেশি।

বাস্তুসংস্থানগত শ্রেণিকরণ (Ecological classification) : জমি, মৃত্তিকা ও জলবায়ুর ভিত্তিতে শ্রেণিকৃত যেমন—

ক. **নিরক্ষীয়** (Tropical) **কৃষি বনায়ন** : তাপ বেশি, আর্দ্রতা কম, পানির ঘাটতি, যেমন– বন–তৃণ পদ্ধতি।

খ. **অবউষ্ণ** (Sub tropical) **কৃষি বনায়ন** : তাপ ও আর্দ্রতা মধ্যম, যেমন– বাংলাদেশে কৃষি বনায়ন।

গ. **নাতিশীতোষ্ণ** (Temperate) **কৃষি বনায়ন** : তাপ কম, যেমন– বন–তৃণ বা তৃণ–বন পদ্ধতি।

ঘ. **সাব–আলপাইন** (Sub alpine) **কৃষি বনায়ন** : মধ্যম বা নিচু পাহাড়ে কৃষি বনায়ন।

ঙ. **আলপাইন** (Alpine) কৃষি বনায়ন : উঁচু পাহাড়ে কৃষি বনায়ন, সেখানে প্রাকৃতিক বন থাকতে পারে।

চ. **জলজ** (Wet) **অঞ্চল কৃষি বনায়ন** : জলাবদ্ধ জমিতে কৃষি বনায়ন, মৎস্য চাযসহ।

ছ. **আর্দ্র** (Moist) **অঞ্চল কৃষি বনায়ন** : সাধারণ জমিতে কৃষি বনায়ন। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি বেশি হতে পারে।

জ. **শুষ্ক** (Dry) **অঞ্চল কৃষি বনায়ন** : আর্দ্রতা কম, শুষ্ক মৃত্তিকাসম্পন্ন বনাঞ্চলের কৃষি বনায়ন।

আর্থ–সামাজিক শ্রেণিকরণ (Socio-economic classification) : আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় কৃষি বনায়নকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা—

ক. পোষণিক (Subsistence) **কৃষি বনায়ন পদ্ধতি :** পারিবারিক মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে রয়েছে বসত বন ও ঝুম চাষ। বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন কম।

খ. বাণিজ্যিক (Commercial) **কৃষি বনায়ন পদ্ধতি :** বাণিজ্যিকভাবে পণ্য উৎপাদনের জন্য, যেমন– নারকেল, পশুপালন, শিল্পের কাঁচামাল। বৃহদাকার খামার।

গ. **মধ্যমাকার** (Intermediate) **কৃষি বনায়ন পদ্ধতি :** পোষণিক ও বাণিজ্যিকের মাঝামাঝি পর্যায়ের খামার। পারিবারিক চাহিদা মিটে ও কিছু পরিমাণ পণ্য বিক্রি হয়।

ব্যবস্থাপনাভিত্তিতে শ্রেণিকরণ (Management base classification)

ক. **নিবিড় কৃষি বনায়ন পদ্ধতি** (Intensively managed system) : যেমন– বসতবাগান, কৃষিবন পদ্ধতি।

খ. **সম্প্রসারিত কৃষি বনায়ন পদ্ধতি** (Extensively managed system) : ব্যবস্থাপনার নিবিড়তা কম তবে এলাকা বেশি, যেমন– ঝুম চাষ, বন–তৃণ পদ্ধতি।

প্রযুক্তিভিত্তিক শ্রেণিকরণ (Technology base classification)

ক. **স্বল্প প্রযুক্তি পদ্ধতি** (Low technology system) : ঝুম চাষ, বন–তৃণ পদ্ধতি।

খ. **উচ্চ প্রযুক্তি পদ্ধতি** (High technology system) : উচ্চ উৎপাদন বাণিজ্যিক খামার, যেমন– উন্নতজাত, টিস্যু কালচার, বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

গ. **মধ্যম প্রযুক্তি পদ্ধতি** (Intermediate technology system) : মধ্যম ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

জমির ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণিকরণ (Land utilization base classification)

ক. **বসত–কৃষি বনায়ন** (Homestead agroforestry) : ফলগাছ, বহু ব্যবহারমুখী গাছ, সুদৃশ্য গাছ, সবজি ও মসলা, ছায়া গাছ সমন্বয়ে সৃষ্ট।

খ. **বনভূমি কৃষি বনায়ন** (Forest land agroforestry) : অবক্ষয়িত বা পতিত বনভূমির কৃষি বনায়ন।

গ. **ফসল খামার কৃষি বনায়ন** (Crop-farm agroforestry) : ফসল মাঠে ফসল ও বৃক্ষ উৎপাদন।

ঘ. **মৎস্য খামার বনায়ন** (Fish-farm forestry)

ঙ. **পশু খামার বনায়ন** (Animal farm forestry)

চ. **সমন্বিত খামার বনায়ন** (Integrated farm forestry) : ফসল, বৃক্ষ, পশু ইত্যাদি সমন্বয়ে সৃষ্ট খামার।

ছ. **সড়ক বাঁধ কৃষি বনায়ন** (Road side agroforestry)

জ. **জনপদ কৃষি বনায়ন** (Public place agroforestry) : নামান্তরে সামাজিক কৃষি বনায়ন।

কৃষি বনায়নের পদ্ধতি ও প্রকার

গাছের প্রজাতি, সংখ্যা ও অবস্থান এবং বনায়নের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কৃষি বনায়নকে শ্রেণিকরণ করা যায়, যেমন—

ক. ফসল বন (Agrisilviculture) খ. তৃণবন (Silvopastoral)

গ. কৃষি তৃণবন (Agro-silvopastoral) ঘ. কৃষি বন মৎস্য (Agro-silvoaquaculture)

ফসল বনের বৈশিষ্ট্য

ক. স্থানভেদে ভিন্ন গাছ, আন্তঃফসল খ. বসত বন এবং অন্তর্ভুক্ত

গ. ক্ষুদ্র প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ঘ. প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য

তৃণ বনের বৈশিষ্ট্য

ক. মিশ্র খামার খ. মধ্যম ও উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা

গ. প্রধান উদ্দেশ্য জ্বালানি, কাঠ ও পশু খাদ্য

কৃষি তৃণবনের বৈশিষ্ট্য

ক. ফসলের ডোরা (Strip) চাষ, মাঝে মাঝে বনজ গাছ

খ. বায়ুরোধী গাছ গ. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত

কৃষিবন মৎস্য খামারের বৈশিষ্ট্য

ক. মিশ্র খামার খ. পানি সংরক্ষণ

গ. পোনিক (Subsistence) খামার ঘ. উঁচু ও নিচু জমির খামার

বাংলাদেশে কৃষিবন

বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও জলবায়ু অনুকূল থাকায় এখানে অসংখ্য ধরনের গাছ সারা বছরই জন্মে থাকে। এদেশের ভূমির উচ্চতা ও মৃত্তিকা গুণাবলীর ভিত্তিতে এলাকাভেদে বিশেষ বিশেষ কৃষিবন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে এবং গড়ে তোলা হচ্ছে। নিচে কয়েকটি প্রধান প্রধান কৃষিবন উল্লেখ করা হলো।

ফসল বন (Corp and forest trees) : উদাহরণ হিসেবে উল্লেখিত

যশোর এলাকা : পুরাতন গঙ্গাবাহিত পলি মৃত্তিকা, প্রধানত উঁচু জমি ;

প্রধান বৃক্ষ হচ্ছে (জাত ও সংখ্যা ভিন্ন) : খেজুর
তাল
বাবলা
কাঁঠাল

প্রধান ফসল (জাত ভিন্ন) : আউশ ধান
পাট
গম
সরিষা
ছোলা
তিল

BANSDOC Library * Dhaka *

কুষ্টিয়া এলাকা : পুরাতন ও নতুন গঙ্গাবাহিত পলি মৃত্তিকা, প্রধানত উঁচু জমি।

প্রধান বৃক্ষ :	আম
প্রধান ফসল :	আউশ ধান
	রোপা আমন ধান
	গম
	শীতকালীন সবজি

ঈশ্বরদী এলাকা : নতুন গঙ্গাবাহিত পলি মৃত্তিকা প্রধানত মাঝারি উঁচু জমি।

প্রধান বৃক্ষ :	খেজুর
(জাত ও সংখ্যা ভিন্ন)	বাবলা
	খয়ের
	কাঁঠাল
	তাল
প্রধান ফসল :	আউশ ধান
(জাত ভিন্ন)	রোপা আমন ধান
	গম
	সরিষা
	তিসি

রাজশাহী এলাকা : নতুন গঙ্গাবাহিত পলি মৃত্তিকা প্রধানত মাঝারি উঁচু জমি।

প্রধান বৃক্ষ :	খেজুর
(জাত ও সংখ্যা ভিন্ন)	খয়ের
	বাবলা
	আম
প্রধান ফসল :	আউশ ধান
(জাত ভিন্ন)	রোপা আমন ধান
	গম

প্রচলিত কৃষি বনায়ন মড্যুল—

১. কৃষি বন ও মাঠ ফসল (দিনাজপুর) মড্যুল

২. ইপিল ইপিল ও মাঠ ফসল মড্যুল

৩. ইপিল ইপিল + বকাইন + মাঠ ফসল মড্যুল

৪. ঢালু জমিতে উদ্যান ফসল মড্যুল

৫. বহুস্তরবিশিষ্ট কৃষি বন মড্যুল

৬. সীমানা বন মড্যুল

৭. বন বাগান মড্যুল

৮. ঘন সীমানা বন + গবাদি + তৃণ ভূমি মড্যুল

৯. বন বাগান ও পশু খামার মড্যুল
১০. নারকেল–কলা–ধান মড্যুল
১১. বড় বৃক্ষ সীমানা ও মাঠ ফসল মড্যুল
১২. বসতবন মড্যুল
১৩. পাহাড়ি ইপিল ইপিল মাঠ ফসল মড্যুল।

১. কৃষি বন ও মাঠ ফসল (দিনাজপুর মডেল) (চিত্র ৭.১)

বৈশিষ্ট্য : দু'সারি বৃক্ষের পরপর মাঠ ফসলের চাষ। আবার বৃক্ষ/কাঠ ও জ্বালানি পাওয়া যায়।

২. ইপিল ইপিল ও মাঠ ফসল মড্যুল

বৈশিষ্ট্য : ইপিল ইপিলের দুটি সারিতে মাঝখানে ধান, ভুট্টা, চীনাবাদাম ও সয়াবিনের চাষ। এতে জমির মোট উৎপাদন বেশি হয়, আবার মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়।

৩. ইপিল ইপিল + বকাইন + মাঠ ফসল মড্যুল (চিত্র ৭.২ক ও ৭.২খ)

৪. বহুস্তরবিশিষ্ট কৃষিবন মড্যুল (চিত্র ৭.৩ক ও ৭.৩খ)

৫. সীমানা বন মড্যুল – (চিত্র ৭.৪)

বৈশিষ্ট্য : বায়ুরোধক ও ভূমি ক্ষয়রোধক

৬. বন বাগান মড্যুল (চিত্র ৭.৫)

পরিকল্পিতভাবে অল্প জায়গায় অনেক গাছ লাগানো যায়। বিনোদন কেন্দ্র হিসেবেও উপযুক্ত।

৭. ঘন সীমানা বন + গবাদি + তৃণ ভূমি মড্যুল (চিত্র ৭.৬)

বৈশিষ্ট্য : সীমানা বনের ভিতরে পশুখামার এবং তৃণভূমি।

৮. বন বাগান ও পশু খামার মড্যুল (চিত্র ৭.৭)

বৈশিষ্ট্য : সারা মাঠে বনজ ও ফলজ গাছ থাকে, মাঝে খামার পশু চড়ে বেড়ায় ও ঘাস খায়।

৯. নারকেল–কলা–ধান মড্যুল (চিত্র ৭.৮)

বৈশিষ্ট্য : খাদ্য উৎপাদন ঠিক থাকে। নারকেল উঁচু স্তর, কলা মধ্যম স্তর ও ধান নিচু স্তরের ফসল।

১০. বড় বৃক্ষ সীমানা ও মাঠ ফসল মড্যুল (চিত্র ৭.৯)

বৈশিষ্ট্য : সীমানা বৃক্ষের কেনোপি অনেক বড়। দু'পাশে সীমানা বৃক্ষ থাকে। মাঠ ফসলের উৎপাদনও বেশি।

১১. বসতবন মড্যুল (চিত্র ৭.১০)

১২. পাহাড়ি ইপিল ইপিল মাঠ ফসল মড্যুল

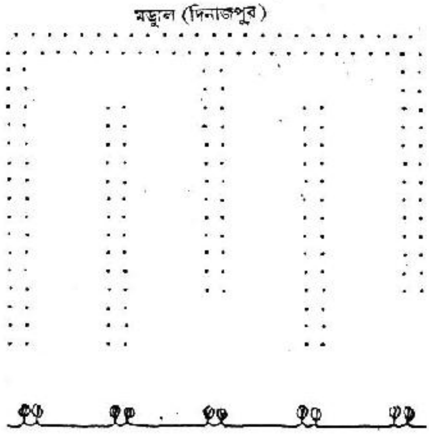

চিত্র ৭.১

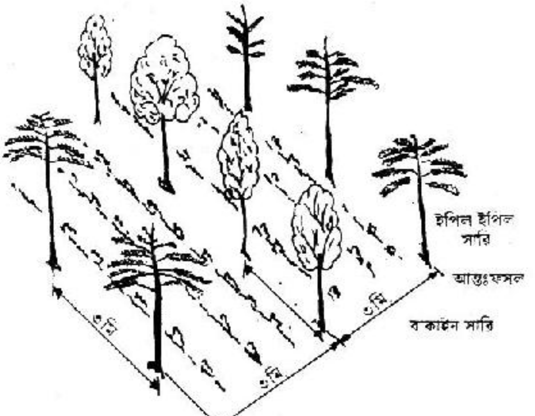

চিত্র ৭.২ক

চিত্র ৭.২খ

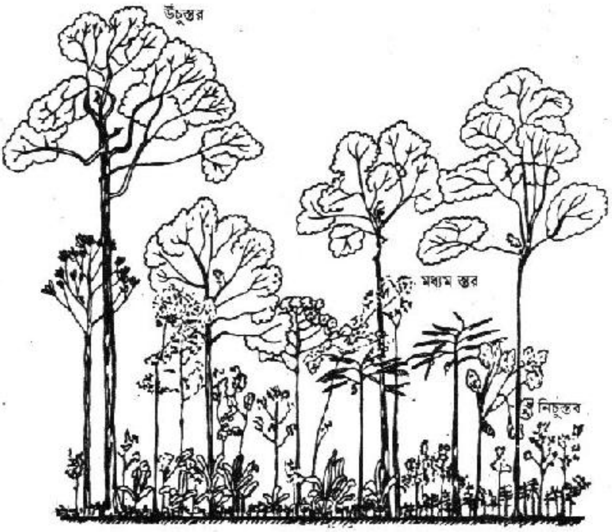

চিত্র ৭.৩ক

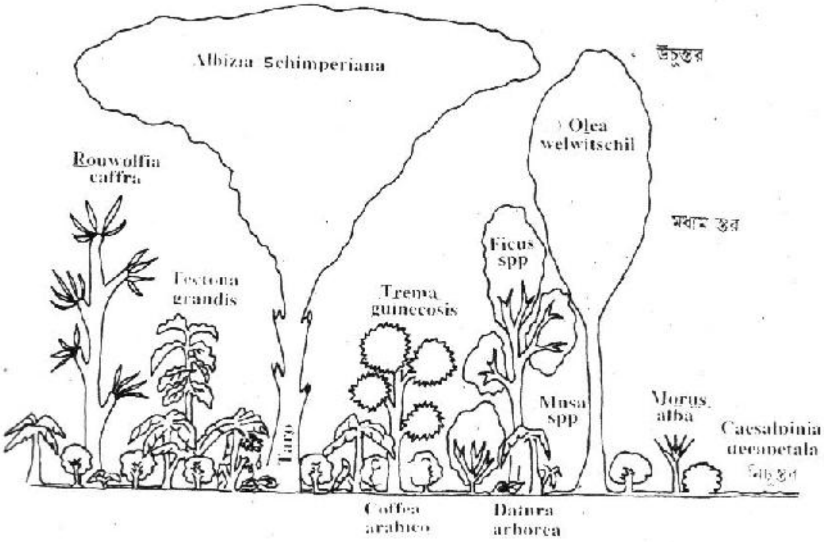

চিত্র ৭.৩খ

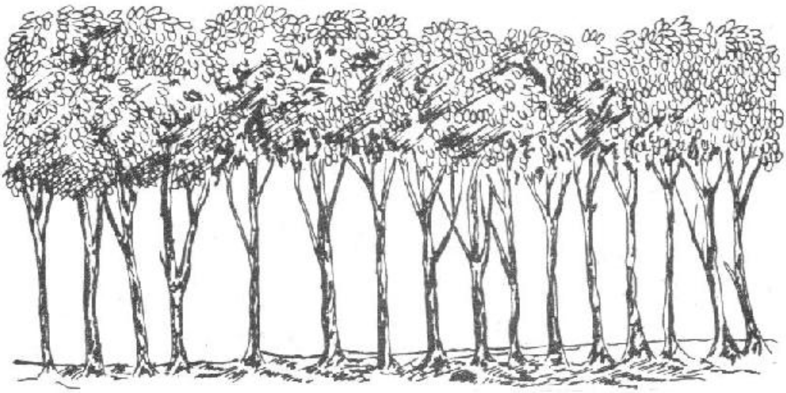

চিত্র ৭.৪

চিত্র ৭.৫

চিত্র ৭.৬

চিত্র ৭.৭

চিত্র ৭.৮

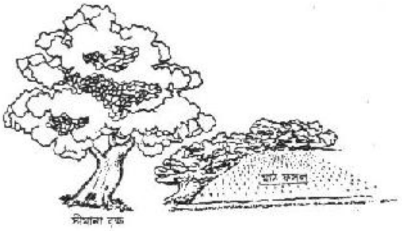

চিত্র ৭.৯

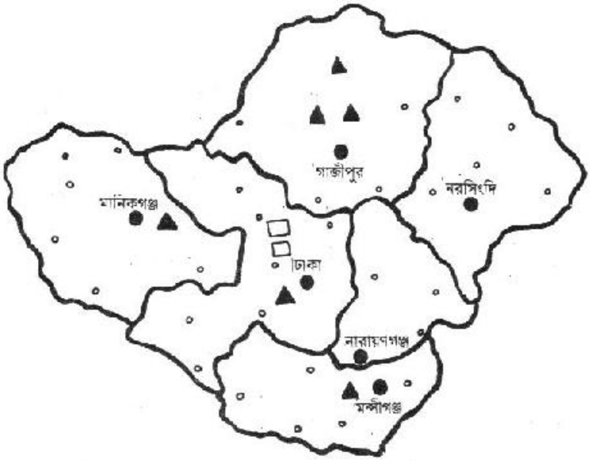

চিত্র ৭.১০

অষ্টম অধ্যায়

সামাজিক বনায়ন

সংজ্ঞা ও ধারণা

সামাজিক বন দেশের প্রাকৃতিক বন ব্যতিরেকে বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ জন অংশগ্রহণে বসত, রাস্তা, বাঁধ ও খাস প্রাতিষ্ঠানিক জমিতে স্থাপিত বনকে সামাজিক বন বলে (The forest established on the homestead, roads, embankments, Government fallow and institutional lands excluding the natural forest by the direct participation of the peoples for the purpose of inreasing forest production is known as social forestry)।

সামাজিক বনায়নের আরো কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করা যায়—

(১) যে বনায়ন বা বন ব্যবস্থাপনায় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরাসরি এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে বা অংশগ্রহণ করে এবং এতে যে লাভ হয় তা অংশগ্রহণকারী জনগণ সরাসরি ভোগ করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে এবং জনগণ সৃষ্ট এ ধরনের বনকে সামাজিক বনায়ন বলে।।

(২) জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার FAO মতে, সামাজিক বনায়ন হলো এমন বন ব্যবস্থাপনা বা কর্মকাণ্ড যার সাথে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিবিড়ভাবে জড়িত। এর মাধ্যমে উপকারভোগী জনগণ জ্বালানি, খাদ্য, পশুখাদ্য ও জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

(৩) বিশ্ব ব্যাংকের মতে, সামাজিক বনায়ন গ্রামের ছোটখাটো উডলট, বিক্ষিপ্ত গাছপালা, রাস্তার পাশে গাছ এবং মাঠে ছড়ানো ছিটানো গাছকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(৪) আরনল্ড (১৯৮৩) এর মতে, সামাজিক বনায়ন বলতে বোঝায় নিজেদের নিজেদের চাহিদা মিটানোর জন্য গাছ জন্মানো ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরকারি সমর্থনের বিধান থাকবে।

সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্র ও গাছের বিবরণ

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে, যেমন—

বাড়ি ও সড়কের ধারে
রেলপথের ধার
নদী খালের পাড় ও বাঁধের পাশে
জমির আইল ও বসতবাড়ির আশেপাশে

পতিত জমি/খাস জমি/অর্পিত জমি
প্রান্তিক জমি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ
অফিসের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি
উদ্যান ও গোচারণ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বন দিনদিন কমছে। যে পরিমাণ বন আছে তাও দেশের সমগ্র অঞ্চলে সুষমভাবে বিস্তৃত নয়। এদেশের বৃহত্তর পাহাড়ি বন কেবল পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের সীমানা ঘেষে বিস্তৃত। দেশের মধ্যাঞ্চল, উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বনের পরিমাণ খুবই কম। তাই জনগণের চাহিদা পরিপূরণের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক বনভূমি ছাড়াও বসতি, সড়ক, বাঁধ ও খাস জমিতে সামাজিক বন হিসেবে বনজ গাছ রোপণ করা হচ্ছে, বন বাগান স্থাপন করা হচ্ছে।

অবস্থান ও প্রকৃতি অনুসারে সামাজিক বন প্রধানত তিন প্রকার হতে পারে। যথা,

১. সড়ক–বাঁধ বন (Roadside forests)

২. বসতবন (Homestead forests)

৩. কৃষিবন (Agroforests)

সড়ক বাঁধ ও খাস জমিতে বনায়ন

বাংলাদেশের পরিপ্রক্ষিতে সড়ক–বাঁধে বনজ গাছ রোপণ খুবই সম্ভাবনাময়। সড়ক–বাঁধ বনায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে —

১. নির্মাণ কাঠের সরবরাহ বাড়ানো

২. জ্বালানি কাঠের সরবরাহ বাড়ানো

৩. সড়ক–বাঁধের পাড় সংরক্ষণ

৪. স্থানীয় শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধি

৫. কুটির শিল্পের সহায়ক কাঁচামাল উৎপাদন।

সড়ক বাঁধে গাছ রোপণ নক্সা

সড়ক বাঁধে বিভিন্ন নক্সা অবলম্বন করে গাছ রোপণ করা যায়। এখানে বাংলাদেশে সচরাচর ব্যবহৃত একটি নক্সা বর্ণনা করা হলো।

একসারি নক্সা

রাস্তা সরু হলে দ্বি–সারির বদলে এক সারি নক্সা অবলম্বন করা যায়। এতে সুদৃশ্য বা কাঠের এক সারি গাছ লাগাতে হয়। গাছ রোপণে একই ধরনের দূরত্ব অনুসরণ করা যায়।

সড়ক বাঁধ বনায়নের প্রজাতি নির্বাচন

সড়ক বাঁধ বনায়নে সফলতা অনেকাংশে প্রজাতি নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। সড়ক বাঁধ বনায়নের প্রজাতি নির্বাচনে নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হয়। যেমন—

১. সড়ক–বাঁধে উচ্চতা :	উঁচু — সেগুন, গামার, রেইনট্রি, কড়ই।
	নিচু — শিশু, জারুল, মান্দার, হিজল।
২. গাছ রোপণের উদ্দেশ্য :	কাঠ — সেগুন, মেহগনি।
	জ্বালানি — রেইনট্রি, পিতরাজ।
	কুটির শিল্প — ভেরেন্ডা, তুঁত, বাবলা।
৩. খুঁটি :	ইউক্যালিপটাস, তেলিকদম, শাল।

দ্বি-সারি নক্সা (প্রশস্ত বাঁধের জন্য)

১. বাঁধের কিনারা থেকে ৩০ সে.মি. দূরে ঘন করে অড়হরের বীজ বপন করতে হয়।

২. অড়হর সারির ১৮০ সে. মি. দূরে সুদৃশ্য গাছ লাগাতে হয়।

৩. সুদৃশ্য গাছের সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ২ মিটার।

৪. সুদৃশ্য গাছের সারি থেকে ১৮০ সে. মি. দূরে কাঠের গাছের সারি রোপণ করতে হয়।

৫. কাঠের গাছের সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৬ মিটার।

৬. কাঠের গাছের সারির ৩০ সে. মি. দূরে ঘন করে ধইঞ্চার বীজ বুনতে হয়।

জায়গাভিত্তিক গাছ নির্বাচন

১। **কৃষিবন বা কৃষি খামারের জন্য :** ইউক্যালিপটাস, বাবলা, বকাইন, কালাকড়ই, শিশু, খয়ের, তাল, শিলকড়ই, আকাশমনি, খেজুর, অর্জুন, ঝাউ ইত্যাদি।

২। **নিচু পাহাড়ি অঞ্চল :** সেগুন, গামার, শীলকড়ই, ছাতিয়ান, শিমুল, মেহগনি, আম, শিরিষ ইপিল ইপিল, আকাশমনি, আমলকি, বহেরা, তরিতকি, গর্জন,

৩। **বাওর ও বিল এলাকা :** হিজল, পিটালী, জারুল, মান্দার, বরুনা পলাশ, শিমুল ইত্যাদি।

৪। **নিচু স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা :** মান্দার, মদম পিটালী, অর্জন, বহেরা, অশোক, শিমূল, ছাতিম, জারুল, বাঁশ, বেত, সোনালু, পিতরাজ, শিশু, মুর্তা হোগলা পলাশ ও চালতা।

৫। **প্রতিষ্ঠান ও অফিস :** নারকেল,আম, জাম, মেহগনি, শিশু, বকুল, কাঁঠাল, কাউ, সোনালু, লিচু, বোতল ব্রাশ,নাগেশ্বর সেগুন জাম্বুরা ও অশোক।

৬। **বসতবাড়ি আশে-পাশে :** আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেল, নিম, সজিনা নারকেল, সুপারি, শরিফা, আমড়া, কামরাঙা, ডালিম, কুল লেবু।

৭। **উপকূলীয় লোনা মাটি :** নারকেল, সুপারী, খেজুর, বাবলা, জিলাপী, পুনিয়াল, ইপিল ইপিল, তেঁতুল আমড়া, করঞ্চা, শীলকড়ই, পিটালী, পলাশ, কাঠ বাদাম, জলপাই, মান্দার ইত্যাদি।

৮। **উপকূলীয় নতুন চর :** কেওড়া, বাইন, কাকড়া, গেওয়া, গড়ান, গুলপাতা, ছইলা, পশুর, করঞ্জা ইত্যাদি।

৯। **উদ্যান, গোরস্থান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য গাছ :** নাগেশ্বর, শিউলী,কামিনী,বকুল, আম,জাম, কাঁঠাল, মেহগনি, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, বেল, নারকেল, চাম্পাফুল, পুনিয়াল, কাঠবাদাম, বোতল পাম, বোতল ব্রাশ।

১০। **বরেন্দ্র এলাকা :** বাবলা, খয়ের, বকাইন, লিচু, আম, বেল, জলপাই, আকাশমনি, মর্জিনা, বাঁশ, খেজুর, শিশু কাঁঠাল, রেইনট্রি।

১১। **মধুপুর ও ভাওয়াল অঞ্চল :** শাল, শিমূল, শিলকড়ই, শিরিষ, চাপালিশ, বহেরা, হরিতকী, বেল, আকাশমনি, সজিনা, কাঁঠাল, ইউক্যালিপটাস, রেইনট্রি পেয়ারা, লেবু, বকুল।

১২। **উঁচু পাহাড়ের শীর্ষদেশ :** গামার, গর্জন, সেগুন, মেহগনি, তুন, চাপালিশ, গর্জন, ঢাকিজাম, উরিআম, কাজোবাদাম, সিভিট, তেলশুর।

১৩। **কৃষি জমির আইলে রোপণের উপযোগী বৃক্ষ :** (ক) প্লাবন মুক্ত ভূমির আইল (গাঙ্গেয় উচ্চভূমি, পাহাড়ি ভূমি, সমতল গড় উচ্চভূমি, পাহাড়ের পাদদেশের সমতল উচ্চভূমি) :

শিলকড়ই, কালাকড়ই, ইউক্যালিপটাস, কাঁঠাল, নারকেল, শিশু, ঘোড়ানিম, খেজুর, বাবলা, খয়ের, তুঁত, জিগা, সোনালু, ইপিল ইপিল ইত্যাদি।

(খ). স্বল্পকালীন অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল (পাহাড়ের পাদদেশের সমতল ভূমি, নদীর খাড়া পাড়, গড় অঞ্চলের সমতল) : সোনালু, খেজুর, খইয়া বাবলা, শীলকড়ই, শিমুল, জারুল, আকাশমনি, তাল, বট ইত্যাদি।

(গ) জোয়ার ভাটায় প্লাবিত ভূমির আইল (উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের বাইরে অবস্থিত ভূমি) : ছইলা, কেওড়া, কাঁকড়া, সুপারি, নারকেল, খেজুর, ইপিল ইপিল, কদম, বাবলা, জারুল, আকাশমনি ইত্যাদি।

(ঘ) অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল (বন্যা বিধৌত অঞ্চলের মাঝারি উচ্চভূমি) : মান্দার, পিটালী, হিজল, জারুল, বরুন, কদম, রাতা ইত্যাদি।

(ঙ) গভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল (ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট, পাবনা ও ঢাকার নিম্নাঞ্চল) : মান্দার, পিটালী, হিজল, বরুন, কেরং ইত্যাদি।

গাছের প্রকৃতি

১। **দ্রুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠ :** ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি, কদম, ম্যানজিয়াম, ঘোড়ানিম, মিনজিরি, ইপিল ইপিল, শিশু, রেইনট্রি, পিটালী ইত্যাদি।

২। **সাধারণ ফল :** আম, কাঁঠাল, নারকেল, লিচু, পেঁপে, কালো জাম, পেয়ারা, কূল, বেল, কলা, আমলকী, আমড়া, সুপারি, আতা, শরিফা, সফেদা, কথবেল, কাজু বাদাম, বাতাবী লেবু, কামরাঙ্গা, ডালিম, জলপাই, তাল, খেজুর, আমলকি।

৩। **শিশু খাদ্য :** ইপিল ইপিল, বাবলা, কাঁঠাল, পাকুড়, শেওড়া, জর‍্যডুমুর, গ্লিরিসিডিয়া, জিগনি, কদম, মান্দার, বট, শিমুল, শিলকড়ই, মিতিঙ্গাবাঁশ, চাকুয়াকড়ই, হিজল, অশ্বথ, ডুমুর, বকফুল, ভেড়েন্ডা, কেওড়া, তেতুইয়া কড়ই, কালা কড়ই, ভোলা, ছইলা, পলাশ, পান্যা মান্দার, মনকাটা, কাইলজাল, আকাশমনি ইত্যাদি।

৪। **আসবাবপত্র :** সেগুন, গামার, শিশু, মেহগনি, পিতরাজ, চাম্পাফুল, চাপালিশ, কাঁঠাল, বড় মেহগনি, শিলকড়ই, নিম,

৫। **ঘরের খুঁটি :** শাল,গর্জন, বাঁশ, বাবলা, সোনালু, জারুল, কড়ই, সুন্দরী লোহাকাঠ, জাম,

৬। **দরজা- জানালার চৌকাঠ ও পাল্লা :** সেগুন, কাঁঠাল, গর্জন, গামার, চাপালিশ, চাম্পা, জারুল।

৭। **ঘরের আদল-রোয়া ও ছাদের কাঠামো :** গর্জন, শাল, কড়ই, জাম, বাবলা, রেইনট্রি গোদা জারুল, গুটগুটিয়া ও ধারমারা।

৮। **ম্যাচ কাঠি ও বাক্স তৈরি :** কদম, ছাতিম, শিমূল, ভুঁইকদম, পিটালী, উদাম, ইউক্যালিপটাস।

৯। **যানবাহন তৈরি :** জারুল, গর্জন, শাল, বাবলা, সুন্দরী, পিতরাজ, বৈলাম, জাম।

১০। **খুব ভাল কপিসিং সম্পন্ন গাছ :** ইউক্যালিপটাস, ইপিল ইপিল, করমজা, রেইনট্রি তুঁতগাছ, ম্যানজিয়াম, সজিনা, কালাকড়ই, ধরঞ্চা, বনফুল, মিনজিরি, গামার, নিম,

অড়হর, বগামেডুলা, গ্লিরিসিডিয়া ও বকাইন, খয়ের বাবলা, শিশু, শিলকড়ই, জাম, শিরিষ, মালাকানা, পেয়ারা ইত্যাদি।

১১। **মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিকারী :** ইপিল ইপিল, বকফুল, গ্লিরিসিডিয়া, শিশু, রেইনট্রি, ধৈঞ্চা, জয়ন্তি, আকাশমনি, ম্যানজিয়াম, মিনজিরি, মালাকানা, ঝাউ, আমলকি, বগামেডুলা, অরহর, শীলকড়ই।

১২। **জীবন্ত বেড়া :** জিগা, দুরন্ত, মান্দার, ফনিমনসা, মেহেদী, জবাফুল, কমলা, কামিনী, চীনা বাঁশ, কুটুকাঁটা, ঢোলকলমি, পুইয়া বকুল, কুন্তলা, জারুল।

১৩। **শুষ্ক আবহাওয়া সহনীয় গাছ :** বাবলা, বকাইন, শিশু, ম্যানজিয়াম, নিম, কাঁঠাল, ইপিল ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, সোনালু, গামার, শিশু, রেইনট্রি, মিনজিরি, খয়ের বাবুল, ঝাউ, শিমুল ও ইউক্যালিপটাস।

১৪। **লবণাক্ততা সহনীয় গাছ :** সুন্দরী, বাইন, কেওড়া, গড়ান, নারকেল, কাঁকড়া, খানা, বাবলা, গেওয়া, রেইনট্রি, ইপিল ইপিল, জিলাপী, শিশু ও মান্দার।

১৫। **বহুমুখী ব্যবহারকারী :** বাবুল, মালাকানা, শিশু, ইউক্যালিপটাস, কালাকড়ই, শিলকড়ই, কাঁঠাল, নারকেল, নিম, ইপিল ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া রেইনট্রি, অরহর, বাঁশ, ঝাউ, বেত ইত্যাদি।

১৬। **কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য গাছ :** বাবলা, খয়ের, কড়ই, শাল, বাটনা, গোদা, জাম, সোনালু, গর্জন, সুন্দরী তেঁতুল, গাব, শিশু, আম, জারুল, পিতরাজ বাঁশ, গামার, আঁশার ধারমারা, নাগেশ্বর ইত্যাদি।

১৭। **মসল্লা উৎপাদনকারী :** দারুচিনি, কর্পূর, তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ, আদা, পেঁয়াজ, রসুন, মৌরী, কালোজিরা, গুলমরিচ, হলুদ, মরিচ, জিরা মেথি।

১৮। **আঁঠা উৎপাদনকারী :** বাবুল, গাম এরাবিক, সেনেগালিস, একাসিয়া, সফেদা, কলম্বিয়া, ওয়াক্সপাম, বুলেট বৃক্ষ, গাম বেঞ্জামিন, শিমুল, বুলি।

১৯। **নৌকা ট্রলারজাতীয় জলযান তৈরি :** জারুল, সুন্দরী, গর্জন, শাল, চাপালিশ, বইলাম, শিলকড়ই, কালাকড়ই, ধারমারা, গুটগুটিয়া, ভাদী বাবলা, আম, তেলশুর নাগেশ্বর।

২০। **গরু ও ঘোড়ার গাড়ি তৈরি :** গর্জন, শাল, বাবলা, জাম, কড়ই, পিতরাজ, গামার, জারুল, শিশু পেডুক, মুস, কাঁঠাল, খয়ের গোদা সুন্দরী, হিউরী কুসুম, তেলশুর, আশার, গাব।

২১। **বাস, ট্রাক ও রিক্সার বডি নির্মাণের জন্য বৃক্ষ :** কড়ই, জারুল, গর্জন, বাবলা, মুস, বহেরা, ধারমারা, সেগুন, চাপালিশ, বাঁশ, চিকরাশি।

২২। **কাগজ ও মণ্ডের জন্য বৃক্ষ :** কদম, গেওয়া, বাঁশ, আঁখ, মালাকান কড়ই, আমড়া, চাকুয়া কড়ই, চন্দুল, বন্দরহোলা, বহেরা, আকাশমনি, ম্যানজিয়াম।

২৩। **রেলওয়ে স্লিপারের জন্য :** গর্জন, শাল, তেলশুর, কনক, চাপালিশ, বর্তা, ধারমারা, টালি, গোদা, নাগেশ্বর, কালাকড়ই, কামদেব, হিউরী।

২৪। **প্যাকিং বাক্স তৈরি জন্য বৃক্ষ :** ছাতিম, শিমূল, আম, কদম, আমড়া, পিটালি, চন্দুল, ভুইকদম, ধূপ/পৈরাগ, উদাল, চাপালিশ, সিভিট রকতন।

২৫। **খেলাধূলার সামগ্রী তৈরির জন্য বৃক্ষ :** মেহগনি, ঘোড়ানিম, তুন, মুস, সিলভার উড, আমুর, বিয়াস, ভূঁইকদম, বিলাস, চামপাতা, দেবদারু গামার, সিভিট, সেগুন।

২৬। **বিভিন্ন যন্ত্রপাতির হাতল তৈরির জন্য বৃক্ষ :** হিউরী, কালাকড়ই, গাব, সুন্দরী, বাবলা, খয়ের, তেলশুর, নাগেশ্বর, বকুল, বাটনা, কুসুম, বাজনা, গোদা, টালি, গর্জন, মহুয়া, হলদু, জারুল, রংকট, শাল, বেল, শিশু, শিলকড়ই, পিতরাজ, তুঁত, ধারামারা, চাপালিশ, কামদেব, কেরং, জাম।

২৭। **কুটির শিল্পের জন্য গাছ :** মূলিবাঁশ, ওরাবাঁশ, ডলুবাঁশ, বরাক বাঁশ, জাই বাঁশ, ভুদুম বাঁশ, ফারুয়া বাঁশ, শিশু, কুল, শিমুল, বেল, কাঁঠাল, সুন্দিবেত, জালিবেত, কেরাক বত, বুদুম বত, গোল্লাবেত, মূর্তা, খয়ের, কদম, তুঁত, তাল, নারকেল, খেজুর, গামারবেত, মুর্তা, খয়ের, কদম, তেঁতুল, তাল, খেজুর গামার।

সামাজিক বনায়ন একটি বৃক্ষ চাষ পদ্ধতি যা ঘনঘন ব্যবহার করতে পারে। তা একটি উৎপাদনমুখী কার্যক্রম যার মাধ্যমে জনগণ বৃক্ষ উৎপাদন, তার ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন দেশে ও অবস্থানে সামাজিক বনায়ন কয়েকটি সম্পূরক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন :

১) কমিউনিটি ফরেস্ট্রি (Community forestry)

২) গ্রামীণ বনায়ন (Rural forestry)

৩) অংশীদারিত্ব বনায়ন (Participatory forestry)

বনজ সম্পদের ঘাটতি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং অবনতিশীল পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে সামাজিক বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক বনায়নের উদাহরণ

১) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বন বিভাগ ও এনজিও কর্তৃক সৃজিত সকল সড়ক ও জনপথ, রেলপথ, বাঁধ সংযোগ সড়ক বনায়ন।

২) বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লাতে বন বিভাগ ও এনজিও কর্তৃক সৃজিত উডলট ও কৃষি বন বাগান।

৩) প্রাতিষ্ঠানিক বনায়ন ও বসতবাড়ি বনায়ন।

৪) জমির আইলে ও জমিতে শিশু, মেহগনি, কাঁঠাল, বাবলা, তাল, খেজুর ইত্যাদি গাছের চাষ।

সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য ও সুবিধা

সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য ও সুবিধা বহুবিধ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জনসাধারণের নিকট উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানি, আসবাবপত্র ও মূলধনের চাহিদা পূরণ করা। এ কর্মসূচি ক্ষয়িষ্ণু বন সম্পদ রক্ষা গাছপালার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে।

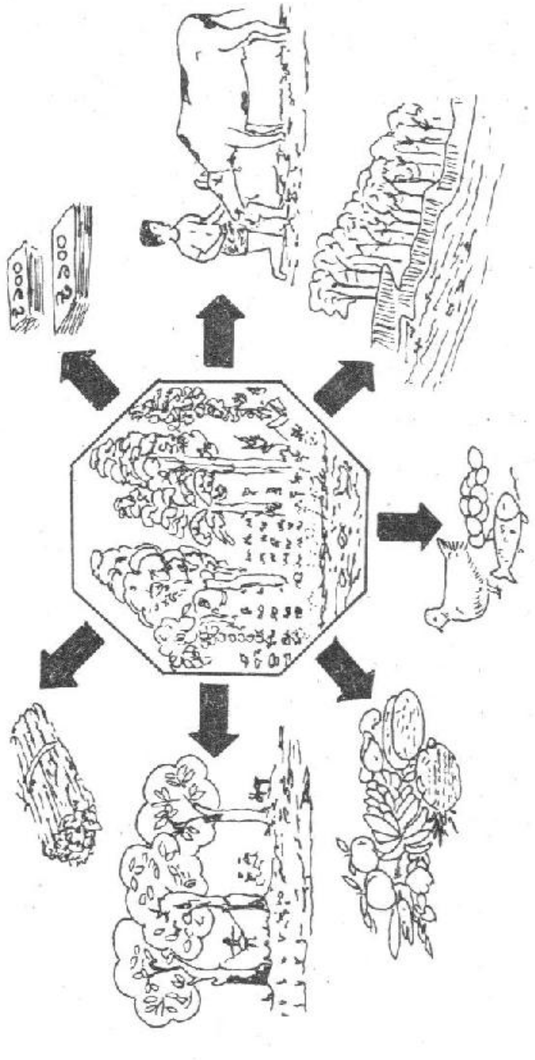

চিত্র ৮.১ : সামাজিক বনায়নের সুবিধা।

সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য

১। জনসাধারণকে বৃক্ষ শূন্য বনভূমিতে বনায়ন কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থান করে কাঠ, জ্বালানি ও খাদ্য চাহিদা নিরসন করা।

২। দুঃস্থ, দরিদ্র ও কর্মহীনদের বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন।

৩। বন সম্পদ ও গাছপালা রক্ষায় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা।

৪। প্রান্তিক ও পতিত জমি যেমন ঃ রাস্তা, রেলপথ, সড়ক, খাল ও বাঁধের ধার, পুকুর পাড়, প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন, বসতবাড়ি জনসাধারণের জন্য জ্বালানি কাঠ, পশু খাদ্য এবং বাড়তি আয়ের মাধ্যমে তাদের জীবনের মান উন্নয়ন সাধন করা।

৫। শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের লক্ষ্যে বসত বাড়ি ও খামার পর্যায়ে গাছপালা উৎপাদন করা।

৬। কৃষি-বন প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৭। নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে চারা উত্তোলন করে সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এলাকায় বনায়ন করা।

৯। ভূমিক্ষয় রোধ করা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা।

১০। ফলের গাছ ও দ্রুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠের গাছ লাগিয়ে জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

১১। ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বায়ু প্রবাহ থেকে কৃষি ফসল ও জমির উর্বরতা রক্ষা করা।

১২। কৃষিজ ফসল, ফল ও সবজি জমিতে গাছ লাগিয়ে আর্থিক উন্নয়ন সাধন করা।

১৩। জমিতে জৈব সারের সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি করা।

১৪। সবুজ গাছপালার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা।

১৫। চিত্ত বিনোদনের পরিবেশ ও স্থান সৃষ্টি করা।

সামাজিক বনায়নের বৈশিষ্ট্য

১। বন তৈরি ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের ভূমিকা প্রাধান্য পেতে পারে।

২। উপকারভোগী জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩। জনগণের জ্বালানি, পশু খাদ্য, কাঠ, ফল, ওষুধ ও তরিতরকারি চাহিদা মিটতে পারে।

৪। জনগণকে গাছ ও কাঠ জাত দ্রব্যের চাহিদা পূরণে স্বনির্ভর হতে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হতে পারে।

৫। বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে পারে।

৬। উপকারভোগী কৃষকদের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে।

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৯৩৫ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২%। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, খাদ্য, জ্বালানি, চাহিদা পূরণ করতে দেশের বনজ সম্পদের

উপর সর্বাত্মক চাপ পড়ছে। দেশের বিরাজমান ঘাটতি পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গ্রামীণ বৃক্ষ সম্পদ অবক্ষয় ক্রমশই বাড়ছে।

দেশে বনভূমির পরিমাণ ২.৬৫ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের আয়তনের তুলনায় ১৮.১৫% এবং বৃক্ষাচ্ছাদিত বনভূমির পরিমাণ মাত্র ৮.৯৮%।

বাংলাদেশে কাঠ ও জ্বালানি কাঠের বাৎসরিক মাথা পিছু ব্যবহারের হার যথক্রমে ০.৩৮ ও ২.৩ ঘনফুট। এ হিসেবে ১৯৮৭-৮৮ সালের পরিকল্পনা কমিশনের এক সমীক্ষায় দেখা যায় দেশে মোট কাঠ ও জ্বালানি কাঠের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট ও ২৪০ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থির থাকলে ২০০৩ সালে কাঠ ও জ্বালানি কাঠের চাহিদা হবে যথাক্রমে ৬.৬ ও ১২.২ মিলিয়ন ঘনমিটার।

দেশে ব্যবহৃত কাঠের ৩৫% আসে সরকারি বন হতে এবং বাকি ৬৫% আসে গ্রামীণ বন হতে। তাছাড়া দেশে ব্যবহৃত জ্বালানি ৯০% আসে গ্রামীণ বন, কৃষি জমি ও গোবর থেকে এবং বাকি ১০% আসে সরকারি বন হতে।

বনজ দ্রব্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা ও সরবরাহের তুলনামূলক তথ্য

(উৎস ঃ Forestry Master Plan)

কাঠের বিবরণ	বর্তমান চাহিদা (মিলিয়ন ঘনমিটার)	বছরভিত্তিক আনুমানিক চাহিদা (মিলিয়ন ঘনমিটার)		বর্তমান সরবরাহ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
		২০০৩ সাল	২০১৩ সাল	
চেরাই কাঠ	৪.৯	৬.৬	১৫.২	০.৫৮ (১২%)
খুটি	০.২৬	০.৩২	০.৩৮	০.১২ (২%)
পাল উড	০.২৬	০.৩৩	০.৩৮	০.১৬ (৩%)
জ্বালানি	৯.৬	১২.২	১৫.১	৪.২৪ (৮৩%)
মোট	১৫.২	১৯.৪৫	৩১.০৬	৫.১৭

বাংলাদেশের পল্লী এলাকার পরিবারভিত্তিক ব্যবহৃত জ্বালানি শক্তি

জ্বালানি ধরন	ব্যবহৃত জ্বালানি শক্তি (% হার)
১। গোলকাঠ থেকে জ্বালানি	৩২.১১
২। গাছের ডালা-পালা ও পাতা	২৮.৮৮
৩। গোবর	১৪.০৯
৪। খরকুটা	৮.১২
৫। ধানের তুষ	৭.৭৩
৬। আখের ছোবরা	৩.১২
৭। কেরোসিন ও অন্যান্য	৩.১১

বাংলাদেশে বনভূমি সুষমভাবে সারা দেশে বিস্তৃত নয়। দেশের ৯০% বন ১২টি জেলায় অবস্থিত। ২৮টি জেলায় আদৌ কোনো বন নেই। কাজেই জ্বালানি কাঠসহ বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা মিটানোর জন্য গ্রামের ও বাড়ি ঘরের আশে–পাশে, পরিত্যক্ত ভূমিতে, রাস্তা, রেলপথ, বাঁধ, খালের পাড়, অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে স্থানীয় চাহিদা মিটানো সম্ভব।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র (০০০, হেক্টর)

ভূমি ব্যবহার শ্রেণী	ভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	শতকরা হার (%)
১। কৃষি জমি	৮,৮৫৭	৫৯.২
২। বনভূমি	১,৯৮৮	১৩.৪
৩। কৃষিযোগ্য প্রান্তিক জমি	২৬৬	১.৮
৪। পতিত জমি	৪০০	২.৭
৫। অকৃষি জমি	৬৭৭২	২২.৩
মোট	১৪,৮০২	১০০

নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশে সামাজিক বনের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি।

১) কাঠ ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি নিরসন করা।

২) দেশের বনসম্পদ বৃদ্ধি এবং কাঠ ও জ্বালানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রান্তিক ভূমি, পতিত জমি, বসত বাড়ির রাস্তা, সড়ক রেলপথ বাঁধ, খাল, পুকুরের ধারে বিভিন্ন অফিস ও প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে সামাজিক বনায়ন প্রয়োজন।

৩) দ্রুতবর্ধনশীল গাছ ও জ্বালানি কাঠ সরবরাহকরণ ও জ্বালানি হিসেবে গোবর ও কৃষি বর্জ্য ব্যবহার সাশ্রয় করা।

৪) কৃষি ফসলের সাথে কৃষিবন পদ্ধতিতে বনায়নের পাশাপাশি সমন্বিত ভূমি ব্যবহার ও ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা।

৫) পতিত অনাবাদী ও প্রান্তিক জমি (২লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর) বনায়ন করা।

৬) গ্রামীণ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের কাঁচামাল ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭) প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা, পরিবেশ দূষণ ও মরু প্রক্রিয়া থেকে দেশকে রক্ষা করা।

৮) কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাঠ, জ্বালানি কাঠ, পশুখাদ্য, তরিতরকারি, ফলমূল, ওষুধ, কুটির শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৯) গ্রামীণ কর্মহীন জনগোষ্ঠীকে নার্সারি তৈরি ও পরিচালনা, চারা রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সামাজিক বনায়নে উপকারভোগী : পল্লীর দরিদ্র জনগণ সামাজিক বনায়নের প্রধান উপকারভোগী। সামাজিক বনায়নে জ্বালানি কাঠ, ফল, পশুখাদ্য, কাঠ ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।

এগুলো নিজের চাহিদা পূরণের পর বিক্রয় করা যেতে পারে। বনায়নের ফলে পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের নামের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো—

১) প্রান্তিক কৃষক ও দরিদ্র জনগণ।

২) দুঃস্থ মহিলা, বিত্তহীন মহিলা ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ।

৩) স্থানীয় সংস্থাসমূহ।

সনাতন বন ও সামাজিক বনায়নের পার্থক্য

সনাতন বন ব্যবস্থা	সামাজিক বনায়ন
১। জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নেই।	১। জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে।
২। বন হতে যে আয় আসে তা জনগণ সরাসরি পায় না।	২। সামাজিক বনায়নে যে লাভ হয় তা জনগণ সরাসরি ভোগ করে।
৩। এ বন ব্যবস্থাপনা সরকারি বনেই সীমাবদ্ধ।	৩। সামাজিক বনায়ন সরকারি বনাঞ্চলসহ দেশের সর্বত্র বিস্তৃত।
৪। শুধু বনজ প্রজাতির চাষ করা হয়।	৪। চাহিদা অনুযায়ী বনজ ও ফলজ প্রজাতি চাষ করা হয়।
৫। এ বন ব্যবস্থাপনায় কেবল বড় শিল্পের কাঁচামাল প্রয়োজন।	৫। এ বন ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেয়ার চেষ্টা করে।

সামাজিক বনায়ন বাস্তবায়নের শর্ত

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত শর্তসমূহের উপর নির্ভর করে।

১। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি/ সরকারি সমর্থন।

২। জনসাধারণের চাহিদা নির্ধারণ।

৩। সঠিক কলাকৌশল প্রয়োগ।

৪। সামাজিক বনায়নে নিয়োজিত জনবলের সংগঠন ও প্রশিক্ষণ।

৫। গণমাধ্যম ও পত্র পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার।

১। রাজনৈতিক/সরকারি সমর্থন

পল্লী উন্নয়নের প্রতি সরকারি বাস্তব সমর্থন থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে আইন করে হলেও জমির মালিকানার বিষয় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।

২। জনসাধারণের চাহিদা নির্ধারণ

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা, চাহিদা, সমস্যা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খাদ্যাভ্যাস কর্মসংস্থান, বনজ সম্পদের প্রাচুর্যতা, ইত্যাদি এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা চিহ্নিতকরণ।

সামাজিক বনায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলীর কৌশলগত সমাধানের ব্যাপারে কয়েকটি নির্দেশিকা এখানে উল্লেখ করা হলো :

ক) **বনভূমির পরিমাণ অপর্যাপ্ত হলে :** কৃষিজ ফসল এবং বৃক্ষের চাষ একযোগে করা যেতে পারে (Agroforestry)। বনজ সম্পদের মাধ্যমে বনাঞ্চলে এবং তার আশে-পাশে বসবাসকারী জনগণের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খ) **কৃষি গোচারণ ভূমির স্বল্পতার মাঝে বনায়ন করতে হলে :** রাস্তা, রেল লাইন এবং বাঁধের ধারে, কৃষি জমির আইলে, নদী ও খালের ধারে, এবং অন্যান্য অজন্মা/ প্রান্তিক জমি যা চারণ অথবা আবাদের অযোগ্য সে সব জমিতে গাছ লাগানো যেতে পারে।

গ) **জনগণের মধ্যে বনোৎপাদন প্রবণতার অভাব থাকলে :** সাধারণ এবং মাঠ পর্যায়ের জনগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তুলতে হবে।

৩। জনগণকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা

সরাসরি ঋণ দান, ভর্তুকি অথবা সাহায্য দান এবং বনজ সম্পদ ভোগের সুযোগ-সুবিধা প্রদান। বিনামূল্যে অথবা স্বল্প মূল্যে বৃক্ষের চারা বিতরণ।

৪। সামাজিক বনায়নে নিয়োজিত জনবলের সংগঠন এবং প্রশিক্ষণ

সামাজিক বনায়নে সাফল্য আনতে হলে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো ঢেলে সাজানো দরকার। এতে সামাজিক বনায়ন শাখায় নতুনভাবে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বন বিভাগের ঐতিহ্যবাহী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা হতে ভিন্নতর হবে। এতে বৃক্ষ লালন কৌশলের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সমাজ বিজ্ঞান ও সম্প্রসারণ কর্মে বাস্তব জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৫। গণমাধ্যম ও পত্র পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করে জনমত সৃষ্টি ও সংগঠিত করে প্রকল্পের কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে। বাংলাদেশে গণমাধ্যম ক্রমশ বিকাশলাভ করেছে এবং জাতীয় উন্নয়নে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। গণমুখী উন্নয়নের লক্ষ্যে গণসমাধ্যমকে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের কথা তুলে ধরতে হবে।

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপ

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন একক ও দলীয়ভাবে উদ্বুদ্ধকরণ একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী কাজ। গ্রামীণ সমাজকর্মী, শিক্ষক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান, ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য, রাজনৈতিক কর্মী বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী সকলের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করা না গেলে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে সফলতার সম্ভাবনা কম। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সফলভাবে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

১। দল গঠন
২। ঋণ সুবিধা দান ও সঞ্চয়
৩। অর্থ উপার্জনের পন্থা
৪। সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণ

১। **দল গঠন :** সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অংশগ্রহণকারী নির্বাচন ও তাদের নিয়ে দল গঠন। দল গঠনের প্রাথমিক শর্ত হলো দলের অন্তর্ভুক্ত সকলকে সমাজের দরিদ্রের মধ্যে যারা দরিদ্রতম (যেমন– বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, ভূমিহীন কৃষক) তাদের কর্মসংস্থানের জন্য নির্বাচন করা।

২। **ঋণ সুবিধা দান ও সঞ্চয় :** বনায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম। দরিদ্র জনগণ আয়ের অন্য কোনো উৎস না থাকলে পরিবার পালনের জন্য এ দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে পারে

না। এজন্য বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য লগ্নীবিহীন ঋণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সামাজিক বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত যেমন— ছোট আকারের নার্সারি উত্তোলন, পশু খাদ্য উৎপাদন, অন্তর্বর্তী স্থানে সবজি চাষ, মৌপালন, রেশম গুটি উৎপাদন ইত্যাদির জন্য এই ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ঋণ দানের আগে ঋণ গ্রহণকারী কাজের জন্য যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন তা নিশ্চিত হতে হবে। বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৩। **অর্থ উপার্জনের পন্থা :** সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের সাথে সাথে হাঁস-মুরগী পালন, সবজি উৎপাদন, ঔষধি বৃক্ষের আবাদ, রেশম গুটি, ভেরেন্ডার গাছ লাগানো, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদির ব্যবস্থা করা গেলে আয়ের উৎস সৃষ্টি হবে। উৎপাদিত পন্য যেন উৎপাদনকারীরা যথাযথভাবে বাজারজাত করতে পারে এবং পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। **সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণ :** সমাজ উন্নয়নের যে কোনো কার্যক্রমে সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণ আবশ্যক। আর এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার। ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত ফসল বা প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের বাজারজাতকরণ এই প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

সামাজিক বনায়ন বাস্তবায়নের বাধা

১। **বনজ ফসল দীর্ঘমেয়াদী :** মানুষের ধারণা গাছের চারা লাগিয়ে কাঠ, জ্বালানি ও ফল পেতে দীর্ঘ সময় লাগে।

২। **পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমন্বয়ের অভাব :** উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের অভাব লক্ষণীয়।

৩। **ভোগ দখলের নিশ্চয়তা :** উৎপাদিত কাঠ, জ্বালানি কাঠের অংশ পাবার ব্যাপারে সংশয়, অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্বের কারণে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

৪। **প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাব :** প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিক্যের দরুন অনেক ক্ষেত্রেই আইন-কানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে যথেষ্ট নমনীয়তা এবং স্থান, কাল ও পরিস্থিতিভেদে পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধনের সুযোগ থাকতে হয়।

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন প্রেক্ষাপট ও কার্যক্রম

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের প্রাথমিক সূচনা হয় ১৯৬৭ সনে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা ও রাজশাহীতে দুটি নার্সারি স্থাপন, সেখানে চারা উত্তোলন ও বিতরণই ছিল মূল লক্ষ্য।

১৯৮০ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প সর্বপ্রথম চালু হয়।

প্রকল্পসমূহ হচ্ছে

১) কমিউনিটি ফরেস্ট্রি উন্নয়ন প্রকল্প।

২) বেতাগী পোমরা কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প।

৩) থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প।

৪) সম্প্রসারিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প।

৫) উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ও বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প এবং ঝুমিয়া।

১। **কমিউনিটি ফরেস্ট্রি উন্নয়ন প্রকল্প :** ১৯৮১ সাল হতে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রথম সামাজিক বনায়ন প্রকল্প কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা।

উক্ত সময়ে দেশের অন্যান্য এলাকায় বনসম্প্রসারণ দ্বিতীয় নামক প্রকল্প সরকারি অর্থায়নে চালু হয়। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্পটি এদেশের প্রথম বিজ্ঞান সম্মত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প।

২। **বেতাগী-পোমরা কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প :** ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগণকে দিয়ে বন সৃষ্টির প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বেতাগী ও পামোরা এলাকায়।

৩। **থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প :** সামাজিক বনায়ন প্রকল্প হিসেবে ১৯৮৮ সাল হতে থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয়। এবং তা ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। এই প্রকল্পের আদিক্ষেত্রে তিনটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা ব্যতীত দেশের অবশিষ্ট একষট্টিটি জেলা। ১৯৯২-৯৩ সাল হতে প্রকল্পের সমগ্র কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব বনবিভাগের উপর ন্যস্ত হয়।

প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য

১। উন্নত ব্যবহার পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২। উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক জ্বালানি ও ব্যবহারিক কাজের উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩। জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশের উন্নয়ন।

৪। পতিত ও প্রান্তিক ভূমিকে বৃক্ষায়নে ব্যবহার করে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন।

৫। গ্রামে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও ভবিষ্যতের জন্য গাছভিত্তিক কুটির শিল্পের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করা।

৪। **সম্প্রসারিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প :** থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল ও ভৌত অবকাঠামো এবং সামাজিক বনায়নের দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত চালু রাখা। ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত দুই বছর মেয়াদী সম্প্রসারিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প চালু হয়। এ প্রকল্পের অধিক্ষেত্র থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুরূপ।

প্রকল্পের কার্যক্রম

১। উডলট বাগান	৫০০ হেক্টর
২। কৃষিবন বাগান	২,৫০০ হেক্টর
৩। স্ট্রিপ বাগান সড়ক ও জনপথ, রেলপথ ও বাঁধ	১২৫০ কিঃ মিঃ
৪। স্ট্রিপ বাগান (সংযোগ সড়ক)	২,০০০ কিঃ মিঃ
৫। প্রতিষ্ঠান বনায়ন	১৬.৫০ লক্ষ টি

৬। উৎপাদিত চারার উৎপাদন	৪৫.৬০ লক্ষ টি
৭। আগাম চারা উৎপাদন	১৩৫.৬০ লক্ষ টি
৮। উৎপাদিত চারার রক্ষণাবেক্ষণ	৩০০.০ লক্ষ টি
৯। নার্সারি কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	৩৫৭ টি

১৯৯৪–৯৫ সাল হতে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ১০টি জেলায় ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সবুজ গাছ–পালা প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পটি চালু হয়। প্রকল্প মেয়াদ ১৯৯৮–৯৯ অর্থ বছর পর্যন্ত নির্ধারিত আছে।

প্রকল্পের এলাকা : বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাসমূহ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১। সমগ্র উপকূলীয় এলাকাব্যাপী বৃক্ষের একটি বেষ্টনী সৃষ্টি করা।

২। জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩। বৃক্ষ সম্পদ সৃষ্টি ও উক্ত এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা।

৫। **উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প :** এ প্রকল্পটি মূলত পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প এবং এর মূল লক্ষ্য উপকূলীয় এলাকা ও উপকূলীয় দ্বীপসমূহের বসবাসকারী জনগণের জানমাল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করা।

প্রকল্প এলাকা : দক্ষিণ–পূর্বে টেকনাফ থেকে দক্ষিণ–পশ্চিমে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী শরনখোলা পর্যন্ত বঙ্গোসাগরের উপকূলবর্তী ২১টি বাঁধ (পোল্ডার)।

প্রকল্পের লক্ষ্য

১) সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচানোর জন্য উন্নত প্রযুক্তি প্রযোগে বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধের ভিতরে ও বাইরে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৃক্ষ রোপণ।

২) উপকূলীয় জনগণের অর্থনৈতিক ও কৃষি উন্নয়ন সাধন।

৩) ৫৩০ কিঃ মিঃ বাঁধে বনায়ন ও ৪৪০ কিঃ মিঃ উপকূলীয় স্ট্রিপ বাগান সৃজন।

পুনর্বাসিত ঝুমিয়া

এ প্রকল্পটি ১৯৯২–৯৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১২৫টি নিরাপত্তা ক্যাম্পের পাশাপাশি ১০,২১০ একর বন– বাগান উত্তোলন ও ১,৮৮৭টি ঝুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসিত করে আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে চালু হয়। পাহাড়ি ভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে চেকডেম নির্মাণ, কুয়া খনন, নলকূপ স্থাপন ও বসতবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের বিস্তারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এতে উপজাতীয় মহিলাদের কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সামাজিক বনায়নে উৎপাদন পদ্ধতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে নিম্নলিখিত উৎপাদন পদ্ধতিসমূহ সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যথা—

১. কৃষিবন (Agroforestry)
২. ক্ষুদ্রাকৃতির বন (Village woodlot)
৩. বৃক্ষের চাষ (Tree farming)
৪. চারণযোগ্য বন (Silvipasture)
৫. উডলট বাগান
৬. সারিবদ্ধ বন
৭. বাঁশের ও বেতের বন
৮. মূর্তার চাষ
৯. প্রাতিষ্ঠানিক বনায়ন
১০. সুপারির চাষ
১১. নারকেলের চাষ
১২. ঔষধীয় গাছ–গাছড়ার চাষ
১৩. গোলপাতার চাষ
১৪. হোগলার চাষ
১৫. খেজুরের চাষ
১৬. অন্যান্য বন

বিভিন্ন প্রকার কৃষিবন

১. কৃষি ও বৃক্ষ চাষ (Agro-silviculture)
২. কৃষি বৃক্ষ ও পশু পালন (Agro-silvipasture)
৩. মৎস্য ও বৃক্ষ চাষ (Aqua-silviculture)
৪. সারিবদ্ধ কৃষিবন/কুঞ্জগলি শস্য উৎপাদন (Alley cropping)
৫. বৃক্ষাবরণে কৃষি চাষ (Agriculture under tree cover)
৬. বৃক্ষাবরণে পশু পালন (Livestock under tree cover)
৭. পালাক্রমিক কৃষিবন (Alternative Agroforestry)
৮. মৎস্য চাষ ও বনায়ন (Aqua-Forestry)
৯. কীটপতঙ্গ লালন ও বনায়ন (Entomo-Forestry)
১০. বসতবাড়ি কৃষিবন (Homestead Agroforestry)
১১. কৃষি জমিতে কৃষিবন (Crop land Agroforestry)

কৃষি ও বৃক্ষ চাষ : এ পদ্ধতিতে একই জমিতে যৌথভাবে বৃক্ষ ও কৃষি চাষ করা হয়। ১৯৮৬ সালে ভি, সি, ম্যাগনো কৃষিবনে শস্য ও বৃক্ষবিন্যাসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৃক্ষের অবস্থান ও আবর্তের উপর ভিত্তি করে একে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায় :

কৃষিবনে শস্য ও বৃক্ষের বিন্যাস (ভি. সি. ম্যাগনো, ১৯৮৬)

(ক) কৃষি ভূমির মাঝে এক সারিতে বৃক্ষোৎপাদন।
(খ) কৃষি ভূমির আইলে সারিবদ্ধভাবে বৃক্ষোৎপাদন।
(গ) কৃষি ভূমির চারধারে বায়ুরোধক বৃক্ষোৎপাদন।
(ঘ) কৃষি ফসলের মাঝে একই সাথে কয়েকটি সারিতে বৃক্ষোৎপাদন।
(ঙ) কৃষি ফসলের মাঝে এলোপাথাড়ি বৃক্ষোৎপাদন।
(চ) ঝুম চাষ বা পালাক্রমিক চাষ।
(ছ) টাংগিয়া পদ্ধতি।

উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহ বাংলাদেশে নতুন নয়।

কৃষিবন বাগানের মডেল

মডেল ১ : কৃষি ও বৃক্ষ চাষ (Silvi Agriculture)

এ মডেল অনুযায়ী প্রতি ১.০ একর প্লটের চারপাশে ৩´×৩´ দূরত্বে তিন সারি চারা রোপণ করা হয়। মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশে কৃষি ফসল চাষাবাদ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

মডেল ২ (ক) : কৃষি ও বৃক্ষ চাষ

এ মডেল ৩´×৩´ দূরত্বে উত্তর-দক্ষিণ অথবা পূর্ব পশ্চিম লাইন বরাবর দু'সারি বনজ প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়। দুটি স্ট্রিপের মাঝে ৩০ ফুট চওড়া কৃষিজমি রাখা হয়।

মডেল ২(খ) : কৃষি ও বৃক্ষ চাষ

এ মডেল ২ (ক) এর রূপান্তর। এক্ষেত্রে ২ সারি গাছের বদলে ৩ সারি গাছ প্রতি স্ট্রিপ রোপণ করা হয়। অর্থাৎ সারি হতে সারির দূরত্ব ৬–০´´ দূরত্বের থাকে। এ পদ্ধতিতে একর প্রতি ১৩২০টি চারা রোপণ সম্ভব।

মডেল ৩ : বৃক্ষ ও ফলের চাষ (Silvi Horticulture)

এ মডেল অনুযায়ী ৩.০ একরে ৮´×৮´ দূরত্বে জমির চারদিকে বায়ুরোধক (wind break) হিসেবে দু' সারি ইউক্যালিপ্টাস চারা লাগানো হয়। মাঝে ৮´×৮´ দূরত্বে আলাদা সারিতে কলা ও পেঁপে গাছের চারা লাগানো হয়। কলা ও পেঁপের সারির মাঝে ১´–৬ দূরত্বে আনারসের চারা লাগানো হয়।

মডেল ৪ : বৃক্ষ ও ফলের চাষ (Silvi-Agri-Horticulture)

এ মডেলে, একই প্লটে নির্ধারিত পৃথক পৃথক অংশে বন প্রজাতি, ফল প্রজাতি ও শাকসবজি চাষাবাদ করার ব্যবস্থা রয়েছে। ১.০ একর প্লটের মধ্যে ০.৩৩ একর জমিতে ৬´×৬´ পরপর বন প্রজাতির চারা, ০.৫০ একর জমিতে ৩০´×৩০´ পরপর ফল প্রজাতির চারা এবং বাকি ০.১৭ একর জমিতে শাকসবজি চাষ করা হয়।

মডেল ৫ : বৃক্ষ ও কৃষি চাষ

এ মডেলে বৃক্ষের সাথে কন্দজাতীয় ফসলের (আদা ও হলুদ) চাষ করা হয়ে থাকে। এখানে প্রতি স্ট্রিপে ৬´×৬´ দূরত্বে ইউক্যালিপটাস ও ইপিল ইপিল লাগানো হয়। স্ট্রিপে হতে স্ট্রিপের দূরত্ব ১২´ থাকে এবং দুই স্ট্রিপের মাঝে ২ ফুট দূরত্ব লাইনে।

বৃক্ষ ও ফলের চাষ

আদা ও হলুদ লাগানো হয়। পরবর্তী সারি হতে সারির দূরত্ব ২৪ পর্যন্ত করা হয়।

মডেল ৬ : কৃষি ও বৃক্ষ চাষ

এ মডেল অনুযায়ী ৩.০ একর প্লটের বাগানের চারধারে ৬´×৬´ দূরত্বে দু'সারি ইউক্যালিপ্টাস গাছ বায়ুরোধক হিসেবে থাকে। বায়ুরোধক সারি হতে ৬´ পর ৪৮´×৪৮´ বর্গাকার জমিতে কৃষি ফসল লাগানো হয়। খালি জায়গাতে কৃষকেরা ধান, গম, ডাল ইত্যাদি আবাদ করে থাকে।

বাংলাদেশে চালু সনাতনী কৃষিবন পদ্ধতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত একাধিক কৃষিবন পদ্ধতি চালু আছে। এখানে বহুবিধ ব্যবহারোপযোগী গাছ লাগানো হয়।

(ক) **খেজুর গাছভিত্তিক পদ্ধতি :** এই পদ্ধতি ফরিদপুর, মাগুরা, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, ও যশোহর এলাকায় সীমাবদ্ধ। এখানে বসতবাড়ি ও উঁচু জমিতে চারপাশে অথবা এলোপাথাড়িভাবে খেজুর গাছ লাগানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেজুর গাছ প্রাকৃতিকভাবে বীজ হতে জন্মে। প্রতি একরে ৬০/৮০টি গাছ লাগানো হয়।

(খ) **তাল গাছভিত্তিক পদ্ধতি :** ফরিদপুর, বরিশাল, মাগুরা ও নড়াইল এলাকায় জমির আইলে বিক্ষিপ্তভাবে তালগাছ লাগানো হয়। এতে কোনো সঠিক নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। প্রতি একরে ৩০/৪০ টি গাছ থাকে। তালগাছ থেকে তাল, গুড় ও জ্বালানি পাওয়া যায় যা খুবই লাভজনক।

(গ) **কাঁঠাল গাছভিত্তিক পদ্ধতি :** এটা গাজীপুর এলাকায় দেখা যায়। সেখানে জমির চারপাশে ২৫–৩০ দূরত্বে কাঁঠাল গাছ লাগানো হয় এবং ৫–৬ বছর পর ফল প্রদান শুরু করে। জমিতে আমন, আখ, ভুট্টা, ডাল জন্মে। কাঁঠাল গাছ থেকে কাঁঠাল, কাঠ ও জ্বালানি পাওয়া যায় যা খুবই লাভজনক।

(ঘ) **শিশু গাছভিত্তিক পদ্ধতি :** চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী অঞ্চলের উঁচু জমিতে এ চালু আছে। এখানে ৬×৬ ও ৬×১২ দূরত্বে শিশু গাছ লাগানো হয়। গাছ লাগানোর ২–৩ বছর পর্যন্ত ধান, গম, ডাল, আবাদ করা হয় এবং তারপর আদা/হলুদ চাষ করা হয়।

(ঙ) **বাবলা গাছভিত্তিক পদ্ধতি :** পাবনা, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া গঙ্গা নদী প্লাবিত উঁচু কৃষি জমিতে প্রাকৃতিকভাবে বাবলা গাছ জন্মে থাকে। কৃষি ফসলের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্য প্রতি একরে ১৫/২০টি গাছ রাখা হয়।

কৃষি-বৃক্ষ ও পশুপালন

এ পদ্ধতিতে একই জমিতে কৃষি ফসল, বৃক্ষ ও পশুচারণ করা হয়। যেমন– রাজশাহী, দিনাজপুর অঞ্চলের আম বাগানে সীমিতভাবে আমন ধানের চাষ করা হয় এবং ধান কাটার পর পশু খাদ্যের জন্য কলাই বপন করা হয়। তারপর সেখানে পশুচারণ করা হয়।

মৎস্য ও বৃক্ষ চাষ : এ পদ্ধতিতে সমন্বিতভাবে বৃক্ষ,কৃষি ফসল ও মৎস্য চাষ করা হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থাপনায় পুকুরের চারদিকে সারি করে ইপিল ইপিল ও গ্লিরিসিডিয়া গাছ লাগানো হয়। কলমি, ঢোল কলমি, হেলেঞ্চাজাতীয় জলজ উদ্ভিদ লাগানো হয় পানির প্রান্ত সীমানায়। তেলাপিয়া, নাইলটিকা, গ্রাসকার্প,ও সিলভারকার্পজাতীয় মাছের খাদ্যের জন্য ক্ষুদিপানা, কলমি, ও ইপিল ইপিল পাতা ব্যবহার করা হয়।

সারিবদ্ধ কৃষিবন : এ পদ্ধতিতে সারিবদ্ধভাবে প্রান্তিক ভূমিসমূহে বাগান উত্তোলন করা হয়ে থাকে এবং গাছের ফাঁকে ফাঁকে কৃষি ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে।

Dhaka

বৃক্ষাবরণে পশু পালন : এ পদ্ধতিতে স্বল্প উচ্চতাসম্পন্ন পশু খাদ্য উৎপাদনকারী গাছ লাগানো হয় যাতে পালিত পশু সহজভাবে গাছের পাতা খেতে পারে। পশুখাদ্য উৎপাদনকারী গাছের স্ট্রিপ বা ফডার ব্যাংকের (fodder bank) মাঝে শুঁটিজাতীয় গাছ (অড়হর, বগামেডুলা, ধইঞ্চা, ডাল ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। এ পদ্ধতি পশুপালনের জন্য খুবই উপযোগী।

পর্যায়ক্রমিক কৃষিবন : এ পদ্ধতি সাধারণত উষ্ণমণ্ডলীয় পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। জমিকে কয়েকটি প্লটে বিভক্ত করা হয়। পর্যায় ক্রমিকভাবে প্রতিটি নতুন নতুন প্লটে জঙ্গল কেটে আগুনে পোড়ানো হয় এবং আবাদ করা হয়। তাকে ঝুম চাষ বলে যা আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলে চালু আছে।

মাছ চাষ ও বনায়ন : এ পদ্ধতিতে কোনো জলাশয়ে সমন্বিতভাবে মৎস্য ও গাছ উৎপাদিত হয়। যেমন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সুন্দরবন, চকোরিয়া, সাতক্ষীরা এলাকায় বনভূমিতে চিংড়ি মাছের চাষ করা হয়। গাছের ফল ও পাতা পড়ে গাছের খাদ্য ও আশ্রয় সৃষ্টি করে তা খুবই লাভজনক।

বিভিন্ন দেশে সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভি, সি ম্যাগনো (১৯৮৬) প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে এখানে বিশ্বের কয়েকটি সামাজিক বনায়ন অনুশীলনকারী দেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই দেশগুলো হলো (১) চীন, (২) ভারত, (৩) ইন্দোনেশিয়া, (৪) দক্ষিণ কোরিয়া, (৫) থাইল্যান্ড, (৬) ফিলিপাইনস ও (৭) নেপাল।

চীন

বিগত ১৯৫৮ সনে পরলোকগত চেয়ারম্যান মাও সেতুং জাতির প্রতি দুটি নির্দেশ জারী করেন—

(ক) দেশকে সবুজ গাছপালায় ভরে তুলতে হবে।

(খ) কৃষি, বন এবং পশুপালন হবে একে অপরের পরিপূরক এবং তিনটিকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

অন্য এক নির্দেশে বলা হয়েছে; সম্ভব সকল স্থানেই বৃক্ষের চাষ করতে হবে যা "Four sided Forestry" অর্থাৎ "চারদিকেই বনায়ন" এই নামে পরিচিত।

"চারদিকেই বন" কথাটার অর্থ হলো গাছ লাগান–

- ☐ রাস্তার ধারে।
- ☐ নদীর ধারে এবং খালের পাড়ে।
- ☐ বসত বাড়ির চারপাশে
- ☐ গ্রাম–গঞ্জের চারপাশে

ভারত

বিগত ১৯৭২ সনে ভারতে "সামাজিক বন" (Social forestry) এর জন্ম হয়। এর মূল লক্ষ্য উল্লেখ করা হলো :

- ☐ পল্লী অঞ্চলের জ্বালানি কাঠের চাহিদা পূরণ এবং জ্বালানি হিসেবে গোবর ব্যবহার রোধ করা।
- ☐ কাঠের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
- ☐ পশু খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
- ☐ বায়ু প্রবাহের হাত থেকে কৃষি জমি রক্ষা করা, এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা।

ভারতের গুজরাটে সর্বপ্রথম সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। প্রথমে তারা সড়কপথের দু' ধারে ও খালের পাড়ে গাছ লাগায়।

(ক) **গ্রামীণ ক্ষুদ্র বনায়ন :** এ কর্মসূচীর আওতায় গুজরাটের ১৮,০০০ সংখ্যক গ্রামের প্রতিটিতে ৪ থেকে ৫ হেক্টর করে ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রামীণ বন সৃষ্টি করা হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য জ্বালানি কাঠ ও গো-খাদ্যের চাহিদা পূরণ। এ জাতের ক্ষুদ্রাকৃতির বন দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(খ) **স্ট্রিপ প্ল্যান্টেশন :** সড়ক, রেল লাইন ও খালের ধারে বাগান উত্তোলন, পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা বন বিভাগ করে থাকে।

(গ) **উপজাতীয়দের নিরাপত্তার নিমিত্তে বনায়ন :** এ কর্মসূচীর আওতায় ভূমিহীন উপজাতীয় পরিবারকে গড়ে ২৫ হেক্টর বনভূমি বরাদ্দ দেয়া হয়। তারা নিজেরা বাগান উত্তোলন, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং মাসে ২৫ দিন হিসেবে শ্রম বিনিয়োগ করবে।

(ঘ) **ব্যক্তিগত জমিতে বন সৃষ্টি :** এ কর্মসূচীর আওতায় গ্রামবাসীদের নিজ নিজ জমিতে বন বাগান সৃজনের জন্য বন বিভাগ বিনা পয়সায় চারা এবং কারিগরি উপদেশ দিয়ে থাকে।

প্রান্তিক এবং ভূমিতে বনায়ন

- ☐ জমির মালিক তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
- ☐ জমির মালিক প্রতি বছর ২৫০ টাকা হারে ১০ বছর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ/ভাতা পাবে। তবে তাদেরকে বাগানের ৭০% সফলতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ☐ তাদের কাছ থেকে সরকার পরবর্তীতে কোনো টাকা পুনরুদ্ধার করবে না।
- ☐ উৎপাদিত দ্রব্য সবই তারা পাবে।

(ঙ) **স্কুল নার্সারি স্থাপন :** এ ব্যবস্থায় নার্সারি উত্তোলনের ফলে চারা উৎপাদন খরচ কম পড়ে কারণ এখানে সরকারি ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমে যায়।

- ☐ নার্সারিগুলোকে বাগান অঞ্চলের কাছাকাছি স্থাপন করা যায়।
- ☐ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গাছের গুরুত্ব এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ধারণা বৃদ্ধি পায়।

এ' কর্মসূচীর আওতায় ১৯৮১ সনে ভারতের রাজ্যে ১,০০,০০০ টি ইপিল ইপিলের চারা লাগানো হয়। যার সাফল্য শতকরা ৮০ ভাগ।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার সাফল্যের সাথে বেশ কয়েক ধরনের কৃষি বনায়ন অনুশীলন করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে যে, যে সমাজের মূল চাহিদা যত বেশি সে সমাজে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি কার্যক্রম বাস্তবায়ন তত দুষ্কর। এজন্য জাতীয় বন উন্নয়ন সংস্থাগুলো কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করেন যা সরাসরি কমিউনিটি ফরেস্ট্রির সাথে জড়িত নয়, যেমন— সেচের জন্য বাঁধ নির্মাণ, খাবার পানির জন্য নলকূপ বসানো, গ্রামীণ কুটির শিল্প ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

সেন্ট্রাল জাতীয় কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্পের নাম "প্রসপারিটি এপ্রোস"-এর দুটি মূল উদ্দেশ্য।

(ক) সরকারি বন রক্ষা করা।

(খ) বনাঞ্চলের আশে-পাশের বাসিন্দাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

"প্রসপারিটি এপ্রোস" এর উপাদানগুলো হলো ঃ

(১) টাংগিয়া পদ্ধতি বা টাম্পাংসরি পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান।

(২) জ্বালানি কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি।

(৩) মধু মক্ষিকার চাষ।

(৪) গুঁটি পোকার চাষ এবং রেশম শিল্প।

দক্ষিণ কোরিয়া

কোরিয়ার ফরেস্ট্রি এসোসিয়েশন (সাইমায়ল উনডং) বন বিভাগের বনীকরণ প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামবাসীদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ, অর্থের যোগান এমন স্টক মালিকের পক্ষে কার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব পর্যন্ত তারা পালন করে থাকে। এই ব্যবস্থাপনার ফলে সেখানে সরকারের নির্ধারিত পন্থায় বনভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

ফরেস্ট্রি এসোসিয়েশনসমূহের তিনটি ধাপ আছে যেমন :

(ক) ভিলেজ ফরেস্ট্রি এসোসিয়েশন।

(খ) কান্ট্রি ফরেস্ট্রি এসোসিয়েশন ইউনিয়ন।

(গ) ন্যাশন্যাল ফেডারেশন অব ফরেস্ট এসোসিয়েশন।

থাইল্যান্ড

রয়েল বন বিভাগ এবং বন শিল্প সংস্থা যৌথভাবে এখানে "ফরেস্ট ভিলেজ" প্রতিষ্ঠা করে। এটি কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্পের অংশ হিসাবে গণ্য করা যায়। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

(ক) বনাঞ্চল এবং ওয়াটার-শেড এলাকা হতে অবৈধ বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে "ফরেস্ট ভিলেজ" গঠন করা হয়। তারাই ভিলেজ প্রধান নির্বাচিত করে।

(খ) ফরেস্ট ভিলেজ এর প্রত্যেক পরিবারকে আবাদ এবং বাড়ি তৈরির জন্য বিনা খাজনায় ২.৫ হেক্টর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(গ) ফরেস্ট ভিলেজগুলোর উন্নয়নে সরকারি সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই ফরেস্ট ভিলেজের চারপাশে অবস্থিত বনভূমি ক্রমান্বয়ে টাংগিয়া পদ্ধতিতে বনায়ন করা হয়। এমনভাবে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয় যাতে অন্তত দশ বছর বনায়ন করার মত যথেষ্ট জমি সেখানে থাকে। এ ছাড়া গ্রামবাসীদেরকে বিভিন্ন প্রকারের উৎসাহ বর্ধক সাহায্য প্রদান করা হয়।

ফিলিপাইন

সামাজিক বনায়নকে (Social forestry) ফিলিপাইনে বন সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়। গণমুখী বন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প যেমন– Forestry Occupense Management (১৯৭৫), Family Approach Re-forestration (১৯৭৬) এবং Community farming (১৯৭৯) প্রকল্পসমূহ বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। নিচে প্রকল্পগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো—

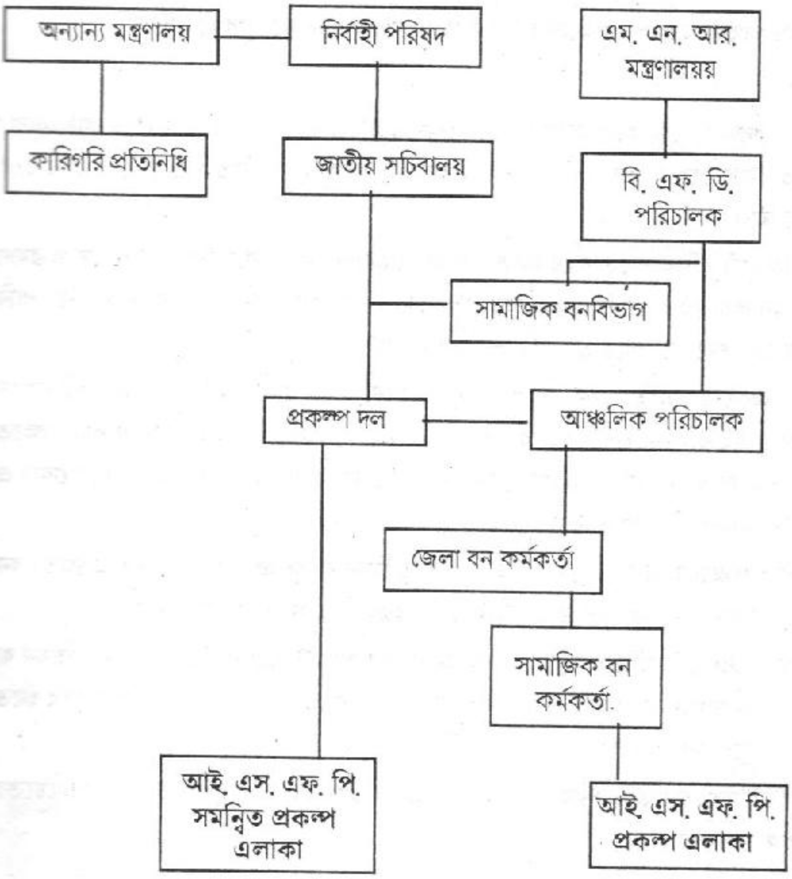

১। **"কমিউন্যাল ট্রি ফার্মিং" প্রকল্প :** বনাঞ্চলে অবৈধভাবে বসবাসকারী এবং বনের আশে-পাশে বসবাসকারী লোকদেরকে সংগঠিত করে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছান এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। এক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ ২৫ বছর এবং পরে আরও ২৫ বছর বাড়ানো যায়।

২। **'দি ফ্যামিলি এপ্রোস' :** এ প্রকল্পটি হলো টাংগিয়া পদ্ধতির রূপান্তর মাত্র।

সংকেত : ISFP – সমন্বিত সামাজিক বন প্রকল্প

MNR – প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়

BED – ব্যুরো অব ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট (বন বিভাগ)।

ফিলিপাইনে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর সাংগঠনিক কাঠামো (ম্যাগনো, ১৯৮৬)

৩। দি ফরেস্ট অকুপ্যান্সি ম্যানেজমেন্টঃ এ প্রকল্পটি ট্রি ফার্মিং পদ্ধতির অনুরূপভাবে ইজারার মেয়াদ মাত্র ২০ বছর পরে অবশ্য দুই বছর করে মেয়াদ বাড়ানো যায়। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও সকলেরই মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজ জীবনের মানউন্নয়ন।

নেপাল

নেপালের প্রধান জ্বালানি হলো জ্বালানি কাঠ। মোট জ্বালানির প্রায় ৯০% আসে জ্বালানি কাঠ থেকে। আহরিত বনজ দ্রব্যের প্রায় ৯৫% ভাগ ব্যয় হয় এই কাজে। বন হতে পশু খাদ্যের প্রায় ৫০% সরবরাহ মিলে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বনজ সম্পদ আহরণের মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু সে পরিমাণ পুনঃবনায়ন করা সম্ভব হয় না। তাই ভূমিক্ষয় ত্বরান্বিত হয়, কৃষি ভূমির উর্বরতা লোপ পায়, পানি সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং ফসলের ফলন কমে যায়।

এ অবস্থায় উন্নতির জন্য সরকার ১৯৫৬ সনে আইন করে সমস্ত বনাঞ্চল জাতীয়করণ করে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফল উল্টো হয় অর্থাৎ বন ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়। এই অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পঞ্চায়েত বন সৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় বনভূমির মালিকানা জনগণের হাতে তুলে দেন। এ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হলো :

(ক) **পঞ্চয়েত বন :** যেসব বনভূমির দুই তৃতীয়াংশে পুনঃপ্রয়োজন তা এর অন্তর্গত। বন বাগান সৃজনের জন্য প্রতি গ্রামকে ১২৫ হেক্টর করে বন ভূমি বরাদ্দ দেয়া হয়।

(খ) **পঞ্চায়েত রক্ষিত বন :** যে সব বনাঞ্চলের শুধু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সামান্য উন্নয়ন বা সমৃদ্ধকরণ প্রয়োজন। তাই এ ধরনের বনের অর্ন্তগত এবং ব্যবস্থাপনা পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

এই নীতির আওতায় সরকার প্রায় ৪৫% অর্থাৎ ১,৮৩৫,০০০ হেক্টর বনভূমি পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তর করেছে।

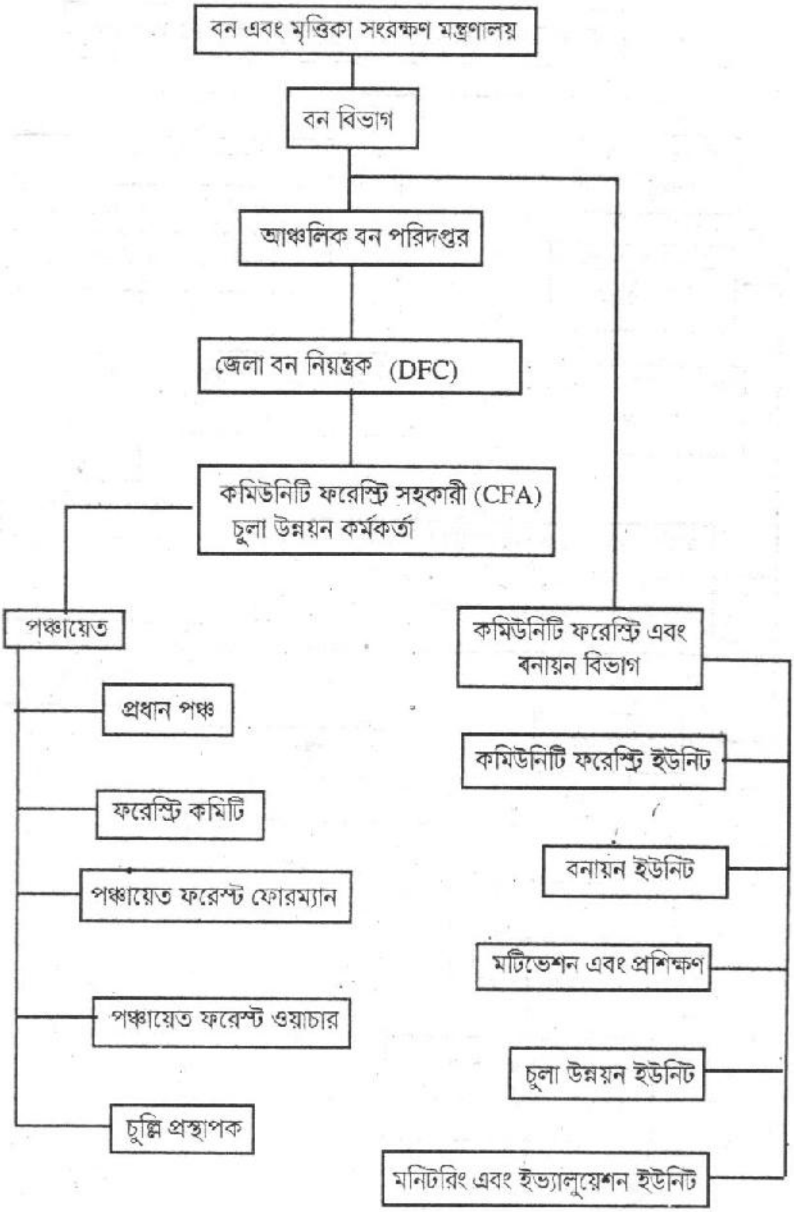

নেপাল বন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (নেপালের কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটসহ) (ম্যাগনো, ১৯৮৬)।

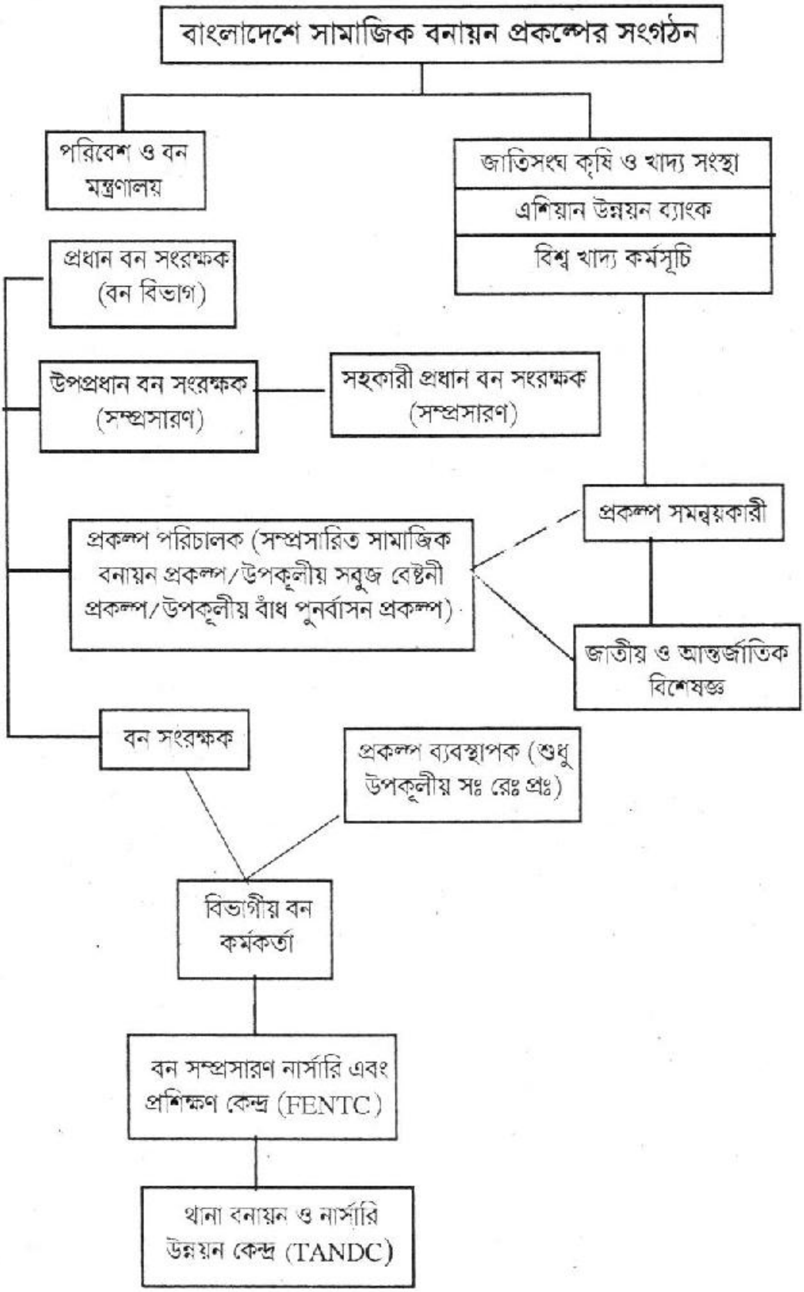
বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের সংগঠন
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থা
এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
প্রধান বন সংরক্ষক (বন বিভাগ)
উপপ্রধান বন সংরক্ষক (সম্প্রসারণ)
সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক (সম্প্রসারণ)
প্রকল্প সমন্বয়কারী
প্রকল্প পরিচালক (সম্প্রসারিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প/উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প/উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প)
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ
বন সংরক্ষক
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (শুধু উপকূলীয় সঃ বেঃ প্রঃ)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
বন সম্প্রসারণ নার্সারি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (FENTC)
থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন কেন্দ্র (TANDC)

বসতবাড়ি কৃষিবন

বসতবাড়িতে গাছ লাগানোর পূর্বে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় কৃষকের বসতবাড়ির আয়তন ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা ও সমস্যা চিহ্নিত করে গ্রহণযোগ্য বনজ ও ফলজ গাছ ও তরিতরকারি চাষের পরামর্শ দিতে হবে।

আমাদের দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিটি দম্পতির জন্য আলাদা ঘরবাড়ি নির্মাণের ফলে বাড়ির আশে-পাশে গাছপালা লাগানোর জমি কমে গেছে। মানুষ দারিদ্র্যতার কারণে বসতবাড়ির গাছপালা বিক্রয় করার ফলে গাছপালা কমে যাচ্ছে।

বসতবাড়িতে কৃষকের চাহিদা ও পরিবারের পুষ্টিমান লক্ষ্য করে কাঠ, ফল, বাঁশ, বেত জ্বালানি, পশুখাদ্য, সবজি, হাঁস-মুরগী, মধুমক্ষিকা ও রেশম চাষের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে যাতে বসতবাড়ি আয়ের উৎস হয়। বসতবাড়িতে গাছের পাশাপাশি, একত্রে বা খালি স্থানে নিম্নলিখিত সবজি চাষ করা যায়। যেমন—

বসতবাড়িতে গাছের তুলনামূলক ব্যবহার ও গুরুত্ব হিসেবে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যায় (জয়নাল আবেদীন, ১৯৯১)ঃ

আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, খেজুর, তাল, বাঁশ, কলা, পেঁপে, লেবু, জাম্বুরা, পান, ডালিম, আতাফল, তেঁতুল, কুল, লিচু, শরিফা, গাব,বট, বাবলা, নিম, রেইনট্রি, মেহগনি, শিশু, সেগুন, ঘোড়ানিম, পিতরাজ, জিগা, কদম, পিটালী, মান্দার, গামার, পোয়া, কৃষ্ণচূড়া, জিগনি ও নিশিন্দা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বসতবাড়িতে গাছের প্রজাতি নির্বাচ্য স্থান, কাল অঞ্চল, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায় হিসেবে ভিন্নতর। এক এলাকায় যে গাছটির গুরুত্ব বেশি প্রদান করা হয় অন্য এলাকায় তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। চৌধুরী ও ছাত্তার (১৯৯৩ এর জরিপের ভিত্তিতে বসতবাড়িতে গাছের প্রজাতিসমূহের আধিক্যতা বর্ণনা করা হলো।

প্রজাতি	প্রতি বাড়িতে গাছের সংখ্যা	বাড়িতে প্রজাতিটির % হার	তুলনামূলক আধিক্য
সুপারি	৭১	৬৫	৪৬.১৫
নারকেল	১২	৯১	১০.৯০
কাঁঠাল	১০	৮০	৮.০০
খেজুর	১৯	৩১	৫.৮৯
কলা	১০	৫৬	৫.৬০
আম	৬	৭৯	৪.৭৪
মেহগনি	১০	৩৩	৩.৩০
বাঁশ	৩	৫৮	১.৭৪
পেয়ারা	৩	৪৮	১.৪৪

দেবদারু	১২	৭	০.৮৪
শিশু	৪	১৮	০.৭২
আমড়া	২	৩২	০.৬৪
শিমুল	৪	১৬	০.৬৪
লেবু	৩	২১	০.৬৩
সজনা	৩	২০	০.৬০
তাল	৩	২০	০.৬০
কুল	২	২৮	০.৫৬
জামরুল	২	২৫	০.৫০
জাম্বুরা	৪	১২	০.৪৮
কালোজাম	২	২১	০.৪২
বেল	২	২০	০.৪০
বাবলা	৩	১৩	০.৩৯
লিচু	২	১৯	০.৩৮
তেজপাতা	২	১৮	০.৩৬
আতা	৩	১১	০.৩৩
কড়ই	২	১১	০.২২
পেঁপে	২	১০	০.২০
রেইনট্রি	৩	৬	০.১৮
সফেদা	১	১৫	০.১৫
বট	২	৪	০.০৮
নিম	১	৬	০.০৬
ডালিম	১	৪	০.০৪
কৃষ্ণচূড়া	১	২	০.০২
তেঁতুল	১	২	০.০২

তুলনামূলক আধিক্য = প্রতি খামারে গাছের সংখ্যা × খামারে গাছের প্রজাতিটির % হার।
উৎসঃ চৌধুরী ও ছাত্তার (১৯৯৩)।

বসতবাড়িতে সঠিক উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করে বৃক্ষ সম্পদ ও আয় বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

বসতবাড়ি বনায়নের মৌলিক নিয়মাবলী

১. কলা, পেঁপে, লেবু, আনারস, পেয়ারা, কুল এ ধরনের দ্রুত ফলদানকারী গাছ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম ধারে লাগানো উচিত।

২। বাড়ির উত্তর ও পশ্চিম পাশে আম, কাঁঠাল, কামরাঙ্গা, জলপাই, বেল, সুপারি, নারকেল, ইত্যাদি বড় ধরনের গাছ লাগানো উচিত।

৩। তেজপাত, দারুচিনি, সফেদা, করমচা, গোলাপজাম, ডালিম ইত্যাদি সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক গাছগুলো বাড়ির সম্মুখে থাকা ভালো।

৪। বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে সবজি চাষের জন্য উত্তম।

৫। চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, চিচিংগা, করলা এ সব লতাজাতীয় সবজি ফলাতে স্থায়ী মাচা রাখতে হয়।

৬। চালের ছাউনিতে বা সাধারণ গাছপালায় ধুন্দুল, আলু, শিম, বড়শিম, ঝিঙা, গোলমরিচ, পান ইত্যাদি লতাজাতীয় ফসল ফলানো যায়।

৭। ছায়ায় বা আধ ছায়ায় আদা, হলুদ কচু, মানকচু, ওলকচু এবং সরাসরি মাটিতে মিষ্টি-কুমড়া, গিমি কুমড়া, বাংগি, তরমুজ আবাদ করা যায়।

৮। ফল, শাক-সবজি চাষ ও জ্বালানি নিশ্চয়তার জন্য বাড়ির বেড়া হিসেবে খেজুর, সুপারি, বকফুল, ইউক্যালিপ্টাস, রেইনট্রি, সজনা, মান্দার, জিগা, বাবলা, ইপিল ইপিল গাছ লাগানো যায়।

৯। চাল কুমড়া, লাউ ইত্যাদি সবজি আবাদে ঘরের চাল ব্যবহার করা যায়।

১০। গোবর, মল, গো-চোনা, আবর্জনা, ছাই, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়। এবং ঠিকমত পচলে এগুলো সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১১। বসতবাড়িকে উৎপাদনমুখী করতে হলে প্রতিটি বাড়িতে ফলজ, বনজ ও সবজি চাষের জন্য পারিবারিক নার্সারি তৈরি করতে হয়।

বসতবাড়ি কৃষিবনের বিস্তারিত পরিকল্পনা

একটি বসতবাড়ি কৃষি বনায়ন করার পূর্বে বাড়ির ধরন, অবস্থান, পরিবেশ, কৃষকের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ, বসতবাড়িতে জমির পরিমাণ, জমির প্রকার, পরিবারের লোকসংখ্যা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও উৎপাদন কৌশল নির্বাচন করতে হয়। যেমন—

(ক) বসতবাড়ির সীমানা ঘেরা বনায়ন (Hedge row planting) ;
(খ) বসতভিটায় সবজি চাষ (Homestead afforestation) ;
(গ) বসতভিটায় সবজি চাষ (Homestead gardening) এবং
(ঘ) পুকুরে সমন্বিত মৎস্য-কৃষি ও বৃক্ষ চাষ (Aqua-silviculture)

ক) বসতবাড়িতে সীমানা ঘেরা বনায়ন

বাড়ির নিরাপত্তা, গরু-ছাগলের উপদ্রব প্রতিহত, বাড়ির পর্দা, সীমানা সংরক্ষণ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে বসতবাড়ির চারধারে বেড়া দেয়া একান্ত প্রয়োজন। এজন্য সুপারি, জিগা, মান্দার, সজিনা, খেজুর তুলা, বাবলা, ইপিল ইপিল, বগামেডুলা, দুরন্ত, পাতাবাহার, বেত ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়।

খ) বসতভিটায় বৃক্ষের চাষ ও বিন্যাস

বনজ ও ফলজ বৃক্ষ চাষের পূর্বে পরিবারের জনসংখ্যা ও পুষ্টিমানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যে গাছ থেকে ফল ও কাঠ পাওয়া যায় সে সব গাছের গুরুত্ব বেশি দিতে হয়।

একটি ৬–৮ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের সুষম খাদ্য, পুষ্টিমান, ফল কাঠ, জ্বালানি, পশু–খাদ্য ও নির্মাণ সামগ্রীর বিষয় বিবেচনা করে ন্যূনতম নিম্নলিখিত গাছগুলো লাগানো প্রয়োজন–

কাঁঠাল–২টি	ডালিম–১টি	কলা–৬টি
আম–২টি	লেবু–৩টি	আমলকি–১টি
নারকেল–৩টি	বেল–১টি	বহেড়া–১টি
পেঁপে–৮টি	খেজুর–১টি	হরিতকী–১টি
পেয়ারা–২টি	জাম–১টি	অর্জুন–১টি
কামরাঙ্গা–১টি	মেহগনি–৪টি	ইপিল ইপিল–৪টি
সুপারি–৪টি	সাজিনা–১টি	রেইনট্রি–১টি

বসত বন (Homestead Forests)

বসতবাড়িতে ও এর আশে পাশে স্বল্প পরিসরে প্রধানত পারিবারিক প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে যে গাছ লাগানো হয় তাকে বসত বন বলা যায় (The trees planted within and arround the homestead for purpose of meeting principally the family needs is known as homestead forest)।

বসত বনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি বসতবাড়ির অবস্থান, উচ্চতা ও আয়তনের উপর নির্ভর করে। বসত বনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. পারিবারিক নির্মাণ ও আসবাব কাঠ উৎপাদন।
২. ফল ও সবজি উৎপাদন।
৩. জ্বালানি চাহিদা পরিপূরণ।
৪. গো–খাদ্য চাহিদা পরিপূরণ।
৫. একটি ভাল গাছকে বীমা হিসেবে বিবেচনা।
৬. ঝড় তুফানের ক্ষতি থেকে ঘরবাড়ি রক্ষা।
৭. ছায়া প্রদান।
৮. ভেষজ ওষুধ প্রাপ্তি।
৯. বাড়ির পর্দা নিয়ন্ত্রণ।
১০. ঐতিহ্য রক্ষা।

বসত বনে গাছ লাগানোর ধরণ চিত্রের (চিত্র ৮.২ ক, খ, গ) সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো—

বাংলাদেশে ব্যবহৃত জ্বালানি কাঠের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ বসত বন থেকে আসে, সুতরাং জাতীয় বিবেচনায় বসত বন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের বসত বনকে শ্রেণিকরণ করা খুবই জটিল। বসতবনের জটিলতাই এর মূল কারণ। তবে বসত বনের একটি সাধারণ চিত্র ৮.২ এ দেখানো হলো।

চিত্রে বসতবনে গাছ লাগানোর ধরন (চিত্র ৮.২ ক, খ, গ) উপস্থাপন করা হলো—

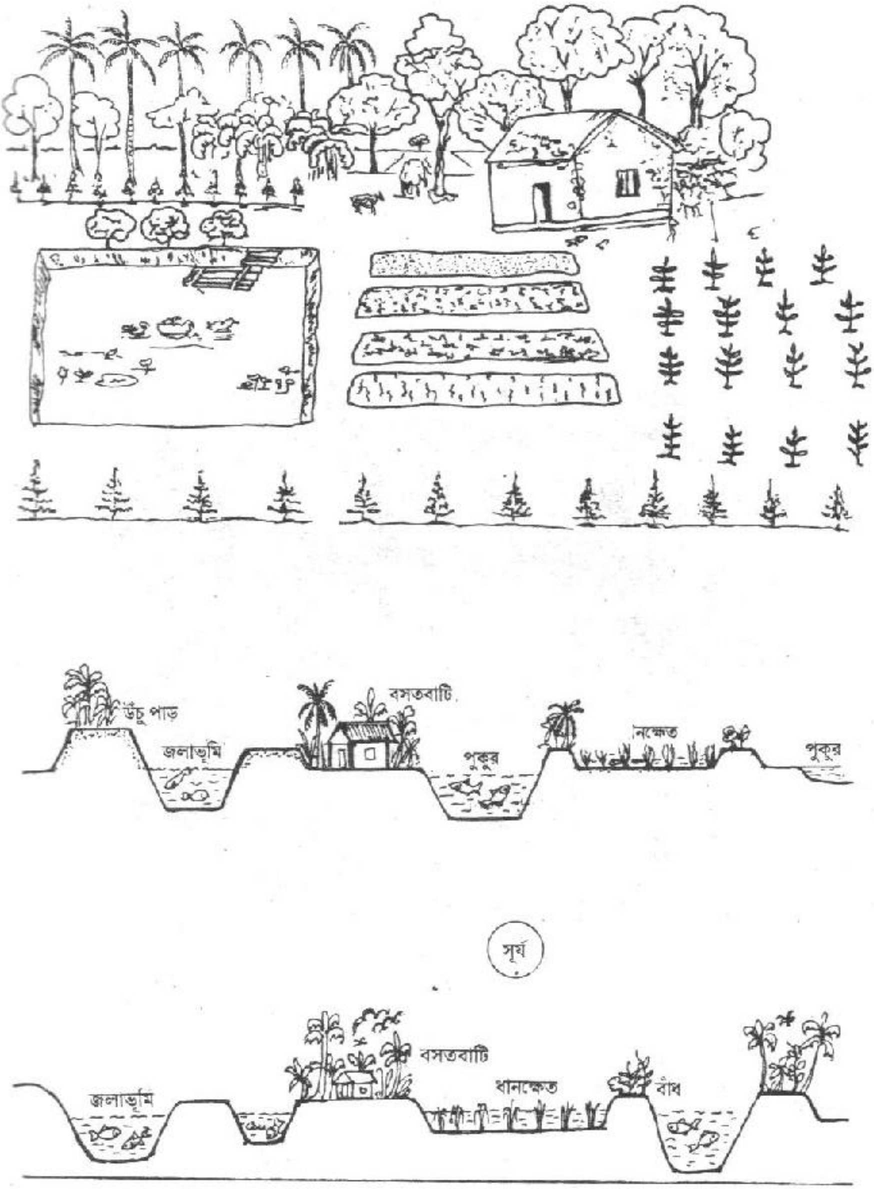

চিত্র ৮.২ বসতবনে গাছ লাগানোর ধরন।

১. কয়েকটি কাঠের গাছ ও বাঁশ ঝাড়,
২. কয়েকটি ফলের গাছ,
৩. কয়েকটি বহু ব্যবহারমুখী গাছ,
৪. কয়েকটি সবজি গাছ,
৫. বিবিধ গাছ।

বসতবাড়িতে গাছ রোপণ

বসতবাড়িতে গাছ রোপণ করে দেশের বনজ সম্পদ কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব। বসতবাড়ির উচ্চতা ও রোপণ জায়গার অবস্থানের উপর গাছের প্রজাতি নির্বাচন নির্ভর করে।

চিত্র ৮.৩ বসতবাড়িতে গাছ রোপণ।

বসতবাড়িতে গাছ রোপণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে —

১. নির্মাণ কাঠ সরবরাহ,
২. জ্বালানি সরবরাহ,
৩. বাড়ি-ঘরের সংরক্ষণ
৪. বাড়ির পর্দা,
৫. ফল ও পশুখাদ্য সরবরাহ,
৬. দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ।

বাংলাদেশের বসত বনে রোপণ উপযোগী গাছ

এলাকা	গাছের নাম	প্রতি বাড়িতে গাছের সংখ্যা	শতকরা কতভাগ বাড়িতে এই গাছ পাওয়া যায়
রাজশাহী	তাল	৪–৫	৫০–৬০
	বাবলা	২–৩	৫০–৬০
	আম	০–১	৪০–৫০
	খেজুর	৩–৪	৩৫–৫৫
	নিম	০–১	৩০–৩৫
টাংগাইল	আম	৯–১০	৯০–১০০
	কাঁঠাল	৫–৬	৮০–৯০
	বাঁশ	২–৩	৮০–৯০
	সুপারি	১৫–২০	৬০–৭০
	পিতরাজ, জিগা	০–১	৪০–৫০
	নারকেল, লেবু, কলা	০–১	৩৫–৪৫
ঈশ্বরদী	আম, কাঁঠাল	৪–৫	৮০–৯০
	খেজুর, নারকেল, কলা	৫–৬	৫০–৬০
	জাম, সুপারি, তাল	০–১	৩৫–৪০
	বাঁশ	১৮–২৫	২০–২৫
যশোহর	নারকেল	৪–৫	৭০–৮০
	আম	১–২	৬০–৭০
	কাঁঠাল, কলা	৩–৪	৩০–৫০
	বাঁশ, সুপারি	২–৪	৩০–৪০
রংপুর	কাঁঠাল, আম	৩–৪	৬৫–৭০
	সুপারি	৮–১৫	৫০–৬০
	নিম	৫–৬	৩০–৪০
	বাঁশ, পিতরাজ, নারকেল	০–২	৩০–৪০
	পোয়া	০–১	৩০–৪০
পটুয়াখালী	সুপারি	৪–৫	২০–৩০
	আম, কলা	১–২	১০–২৫
	নারকেল, রেইনট্রি	০–১	৫–৭

সূত্র : Homestead Plantation and Agroforestry in Bangladesh.

বাংলাদেশে সড়ক বনায়ন মড্যুলের উদাহরণ (দিনাজপুর) :

১. সিলভি হর্টিকালচারাল মড্যুল 'ক'

বনজ গাছ — মেহগনি	*Swietenia macrophylla, S. mahagoni*
ইউক্যালিপটাস	*Eucalyptus camaldulensis*
উদ্যান ফসল	কলা, পেঁপে, আনারস
মাঠ ফসল	নাই

২. সিলভি হর্টিকালচারাল মড্যুল 'খ'

বনজ গাছ — মেহগনি	*Swietenia macrophylla, S.mahagoni*
ইউক্যালিপটাস	*Eucalyptus camaldulensis*
আকাশমনি	*Acacia auriculiformis*
উদ্যান ফসল	লিচু, লেবু
মাঠ ফসল	আছে, শাক সবজি ও মাঠ ফসল

৩. সিলভি হর্টিকালচারাল মড্যুল 'গ'

বনজ গাছ — মেহগনি	*Swietenia macrophylla, S. mahogoni*
ইউক্যালিপটাস	*Eucalyptus camaldulensis*
উদ্যান ফসল	আম
মাঠ ফসল	আছে

৪. সিলভি হর্টিকালচারাল মড্যুল 'ঘ'

বনজ গাছ — মেহগনি	*Swietenia mcrophylla, S.mahagoni*
ইউক্যালিপটাস	*Eucalyptus camaldulensis*
ইপিল ইপিল	*Leucaena leucocephalia*
উদ্যান ফসল	নাই
মাঠ ফসল	হলুদ, আদা

৫. সিলভি হর্টিকালচারাল মড্যুল 'ঙ'

বনজ গাছ — মেহগনি	*Swietenia macrophylla, S.mahagoni*
ইউক্যালিপটাস	*Eucalyptus camaldulensis*
ইপিল ইপিল	*Leucaena leucocephalia*
উদ্যান ফসল	নাই
মাঠ ফসল	আছে।

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়-সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষ অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়

কৃষি বনায়নের প্রজাতি আন্তঃক্রিয়া

প্রজাতি মনোনয়নের গুরুত্ব

সারা বিশ্বে উদ্ভিদের হাজার হাজার প্রজাতি ও জাত রয়েছে যেগুলোকে কৃষি বনায়নে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সব গাছ সব স্থানে ভাল জন্মে না। সেজন্য জলবায়ু ও মাটির ভিত্তিতে বৃক্ষের উপযুক্ত প্রজাতি বা জাত নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কৃষি বনায়নে বৃক্ষ প্রজাতি মনোনয়নের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো।

১. মৃত্তিকা ও জলবায়ু ভিত্তিতে বৃক্ষের উপযুক্ত প্রজাতি মনোনয়ন না করলে গাছ মারা যায়।

২. স্থানের উপযোগিতা অনুসারে গাছ মনোনয়ন না করলে গাছের বৃদ্ধি কম হয়।

৩. প্রাপ্তিস্থানের ভিত্তিতে গাছ মনোনয়ন না করলে গাছ তার স্বাভাবিক আকৃতি নিয়ে বড় হতে পারে না।

৪. স্থানীয় ও পারিবারিক চাহিদার ভিত্তিতে গাছ না লাগালে সে গাছের কার্যকারিতা কমে যায়।

৫. বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী বিশ্লেষণ না করে গাছ লাগালে সে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম সফল হতে পারে না।

প্রজাতি মনোনয়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

কৃষি বনায়নের একটি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এর প্রকার, প্রজাতি ও জাত নির্বাচন। নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে রোপণোপযোগী গাছ মনোনয়ন করতে হয়। যেমন–

১. জমির বৈশিষ্ট্য : উঁচু জমি, মাঝারি উঁচু জমি ও নিচু জমি, পাহাড়ি জমি, সমতল জমি।

২. মাটির বৈশিষ্ট্য : মাটির বুনট, গভীরতা, অম্লমান বা বিক্রিয়া, লবণাক্ততা, উর্বরতা মান।

৩. গাছের বহিরাবয়ব (morphology) : কাণ্ড, শাখা ও পাতার বৈশিষ্ট্য।

৪. গাছের কেনোপি বা প্রশাখা বিস্তার : বৃহৎ, মধ্যম, কম।

৫. ছায়ার প্রকৃতি : হালকা ছায়া ও ঘন ছায়া।

৬. শিকড় বিস্তার : গভীর ও অগভীর।

৭. দিক নির্বাচন।

বৈশিষ্ট্যের বিবরণ

গাছ রোপণোপযোগিতা বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করে এ কৃষি বনায়নের প্রজাতি ও জাত নির্বাচনের একটি সাধারণ নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. জমির বৈশিষ্ট্য : উঁচু জমি : সেগুন, গামার, তেলশুর, গর্জন, শিলকড়ই।

মাঝারি উঁচু জমি : শিশু, নারকেল, খেজুর, তাল, মেরা।

নিচু জমি : জারুল, হিজল, মান্দার, পারুল, মুর্তা।

পাহাড়ি জমি : বাদি, বন্য আম, সিভিট, চাকোয়া, ধায়মারা।

সমতল জমি : অধিকাংশ গাছ।

২. মাটির বৈশিষ্ট্য : মাটির বুনট : দো–আঁশ – অধিকাংশ গাছ।

বেলে মাটি – লিগ্যুম গাছ

পলি বা এঁটেল মাটি – নারকেল, সুপারি, তাল।

গভীরতা : গভীর মাটি – অধিকাংশ গাছ

অগভীর মাটি – মৌসুমী বা স্বল্পমেয়াদী

লবণাক্ততা : লোনা মাটি – সুন্দরী, কেওড়া, গেওয়া, কাকঁড়া, আমড়া, বিলাতি গাব।

প্রশম – অধিকাংশ গাছ।

অম্লীয় মাটি – কাঁঠাল, জলাকানা, ঢেড়শ

উর্বরতা মান : উর্বর মাটি – অধিকাংশ গাছ।

অনুর্বর মাটি – লিগ্যুম গাছ।

৩. গাছের বহিরাবয়ব ও পাতাঝরা ও চিরহরিৎ, কাণ্ড প্রধান ও শাখা প্রধান, পাতা বড় ও ছোট প্রভৃতি

৪. গাছের কেনোপি – বড় – বট, অশ্বথ, রেইনট্রি, কাঁঠাল, লিচু।

মধ্যম – আম, জাম, শিশু, মিনজিরি, ডেউয়া।

ছোট – চন্দনা, কড়ই,খেজুর, বাবলা, বিলাতী গাব, তাল।

প্রজাতি মনোনয়নের উপাদান

কোনো স্থানের বসত বনের প্রসার উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১. **কৃষি পরিবেশ অঞ্চল :** স্থানীয় ভূমি মৃত্তিকা ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বসত বনে রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন করতে হয়।

২. **বসত আঙ্গিনার আয়তন :** বসত আঙ্গিনার আয়তন বাংলাদেশে ০.১ থেকে ১.০ হেক্টর হতে পারে। সেজন্য প্রাপ্ত জায়গায় আয়তনের ভিত্তিতে বৃক্ষের প্রজাতি ও সংখ্যা নির্ধারণ করতে হয়।

৩. **পারিবারিক সদস্যের ভূমিকা :** পরিবারে আর্থিক সামর্থ্য ও পেশার উপর বসত বনের প্রকৃতি নির্ভর করে। পরিবার ধনী হলে দীর্ঘমেয়াদি বৃক্ষ এবং দরিদ্র হলে স্বল্পমেয়াদী আয় প্রাপ্তির উপযোগী গাছ লাগাতে হয়।পরিবারের সদস্যদের সাথে মিল রেখে এমন গাছ লাগাতে হয় যাতে পরিবারের সদস্যরা গাছের যত্ন নেয়। অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের পছন্দ ও

মতামতের প্রেক্ষিতে গাছের প্রজাতি ও জাত নির্বাচন করতে হয়। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম হলে উচ্চ ফলনশীল জাতের গাছ লাগানো ঠিক হবে না, কারণ এগুলোর প্রয়োজনীয় অধিকতর যত্ন নেওয়া সম্ভব হবে না।

৪. **স্থানীয় পারিবারিক চাহিদা :** বসত বনে গাছ রোপণের পূর্বে স্থানীয় ও পারিবারিক চাহিদা বিবেচনা করতে হয়। শিল্প কাঁচামাল, ফল, খাদ্য, জ্বালানি, নির্মাণ কাঠের চাহিদা সামাজিক চাহিদা, প্রভৃতি।

৫. **পর্দা ও সীমানা :** বসতবাড়িতে গাছ রোপণের সময় যাতে বাড়ির পর্দা ও সীমানা রক্ষা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

বৃক্ষ ও মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য

মৌসুমী বা বার্ষিক ফসলের উপর যেসব গাছের ঋণাত্মক প্রভাব কম সেগুলো নির্বাচন করা উচিত। এক্ষেত্রে গাছের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার—

(১) অধিক দূরত্বে লাগানো যায়।

(২) ছাঁটাই সহ্য ক্ষমতা আছে।

(৩) কেনোপি ও ক্রাউন ছোট।

(৪) শাখা-প্রশাখায় বিন্যাস হালকা; যাতে আলো ভেদ করতে পারে।

(৫) উপযুক্ত ফেনোলজির পাতার পতন ও দ্রুত নতুন পাতা গজানো বৈশিষ্ট্যের হওয়া এবং কেনোপি ও ক্রাউন ছোট হওয়া।

(৬) পাতা পচনশীল ও পুষ্টি সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

(৭) গাছ গভীরমূলী ও কম পাতাসম্পন্ন হওয়া।

(৮) মাটির গভীর থেকে পুষ্টি পরিশোষণ করা।

(৯) পানি চাহিদা কম থাকা।

(১০) দ্রুত বর্ধনশীল হওয়া।

(১১) গাছে পোকার আক্রমণ কম হওয়া।

(১২) গাছে রোগের আক্রমণ কম হওয়া।

(১৩) পরিকল্পিত কৃষি বনায়ন পদ্ধতি চাহিদা পূরণ করা।

(১৪) উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার চাহিদা ও মূল্য বেশি থাকা।

(১৫) পরিবেশের উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন।

বহুব্যবহারমুখী বৃক্ষের ব্যবহার

যে গাছের কাণ্ড, বাকল, পাতা, ফুল, ফল, শিকড়, কোনো না কোনোভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে বহুব্যবহারমুখী বৃক্ষ (Multipurpose tree-MPT) বলে। কৃষি বনায়নে বহু ব্যবহার বৃক্ষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোপণ স্থান অনুযায়ী বহু ব্যবহার গাছের প্রজাতিও ভিন্ন হয়ে থাকে।

যেমন–

১. ফসল জমি : *Acacia* ও *Lewcana* প্রজাতি

২. রাস্তা পার্শ্ব : *Delbarzia* ও *Suritania* প্রজাতি

৩. জন স্থল : *Phycas* ও *Albizia* প্রজাতি

৪. বসতবাড়ি : আম, জাম, কাঁঠাল।

৫. জলাবদ্ধ জমি : হিজল, মান্দার।

৬. সমুদ্রোপকূল : ঝাউ।

কৃষি বনায়নে বহু ব্যবহার গাছের উপযুক্ততা বৈশিষ্ট্য

১. স্থানীয় জলবায়ুতে অভিযোজিত হওয়া।

২. হালকা উন্মুক্ত কেনাপি, যা আলো ভেদ করতে পারে।

৩. ছাঁটাই করার পর দ্রুত নতুন শাখা, পাতা গজায়।

৪. কাঠ, খাদ্য,জ্বালানি ও ভেষজ ব্যবহার রয়েছে।

৫. পাতা নিচের মাটিতে পড়ে সার হয়।

৬. পার্শ্ব শিকড় কম, থাকলেও তা ছাঁটাই করা যায়।

৭. লিগ্যুম হলে অধিক নাইট্রোজেন সংযোজন করতে পারে।

৮. খরা, বন্যা, লোনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধক।

৯. শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে।

১০. ব্যবস্থাপনার ঝামেলা কম।

১১. উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বেশি।

বহুব্যবহারমুখী গাছের সুবিধা

বহুব্যবহারমুখী গাছের অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই অনেক বেশি। চিত্রের সাহায্যে বহু-ব্যবহারমুখী গাছের সুবিধার বিবরণ বোধগম্যের সহায়ক।

প্রজাতি মিশ্রণযোগ্যতা ও আন্তঃক্রিয়া

কোনো স্থানে কোন কোন গাছ একই সিস্টেমে পাশাপাশি লাগানো যায় তাকে প্রজাতি মিশ্রণযোগ্যতা (Specis compatibility) বলে।

বন বাগান বসত বন, খামার বন ও সামাজিক বন সব স্থানেই একাধিক প্রজাতির গাছ লাগানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো স্থানে কোন গাছের পাশে বা নিচে কোন গাছ লাগানো যাবে তা নির্ধারণ করে গাছ লাগানো প্রয়োজন। কৃষি বনে বৃক্ষের প্রজাতি মিশ্রণযোগ্যতা কয়েক প্রকার হতে পারে।

মিশ্রণযোগ্যতার প্রকার

১. পার্শ্ব বা স্থান গতি (Spatial) মিশ্রণযোগ্যতা

কোন গাছের পাশে কোন গাছ লাগানো যাবে তা পার্শ্ব বা স্থানগত মিশ্রণযোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন–

ক) শিশু গাছ ও মেহগনি গাছ পাশাপাশি সারিতে লাগানো যায়।

খ) ইপিল ইপিল ও তেলিকদম পাশাপাশি লাগানো যায়।

গ) নারকেল ও সুপারি পাশাপাশি লাগানো যায়।

২. স্তরগত মিশ্রণযোগ্যতা

ক) উঁচু নারকেল স্তরের নিচে কলা বা কফি লাগানো যায়।

খ) মলাকানা, ডেরিস, লেবক প্রভৃতি গাছের নিচে চা গাছ লাগানো যায়।

গ) সুপারি বাগানের নিচে মান্দার গাছ লাগানো যায়।

৩. আন্তঃপ্রজাতি মিশ্রণযোগ্যতা

ক) আমগাছে গাছ আলু ও গোলমরিচ লাগানো যায়।

খ) আমলকি গাছে গোলমরিচ লাগানো যায়।

গ) সুপারি গাছে পান গাছ লাগানো যায়।

ঘ) ঝিগা বা মেরা গাছে বেত লাগানো যায়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও প্রজাতি মিশ্রণযোগ্যতা

মৃত্তিকা ও জলবায়ুর ভিত্তিতে বাংলাদেশকে মোট ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এসব কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে কৃষি বনায়নের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতির মিশ্রণযোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নিচে কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের ভিত্তিতে বর্তমানে রোপণ করা যায়— এমন বৃক্ষ প্রজাতির নাম উল্লেখ করা হলো।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের নাম	মৃত্তিকা ও জলবায়ু বৈশিষ্ট্য	রোপাযোগ্য বৃক্ষের নাম
১. পুরাতন হিমালয় সমতল পাদভূমি	উঁচু জমি, অম্লীয়, দো-আঁশ	রেইনট্রি, নিম, শিমূল সেগুন, রাবার, ডুমুর, তুঁত, লিচু
২. সক্রিয় তিস্তা প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু অম্লীয় প্রধানত বেলে দো-আঁশ	শিমুল, মেহগনি, ডুমুর, পাওয়া, তুঁত, রেইনট্রি, কড়ই
৩. তিস্তা সর্পিল প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু অম্লীয় থেকে প্রধানত বেলে দোআঁশ	রেইনট্রি, কড়ই, তুঁত, শিমুল
করতোয়া বাঙ্গালী প্লাবনভূমি	উঁচু মাঝারি, অম্লীয় থেকে প্রশম দো-আঁশ মাটি	রেইনট্রি, কড়ই, গাওয়া।
৫. নিম্ন আত্রাই বেসিন	মাঝারি নিচু ও নিচু, প্রশম বিক্রিয়া, পলি মাটি	পাটিবন, মান্দার, হিজল

৬. নিম্ন পুনর্ভবা প্লাবনভূমি	মাঝারি নিচু ও নিচু, প্রশম বিক্রিয়া, প্রধানত পলিমাটি	মান্দার, হিজল, জারুল
৭. সক্রিয় ব্রহ্মপুত্র যমুনা প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু বিক্রিয়া অম্লীয়, মাটির বুনট বেলে দো-আঁশ ও দোআঁশ	রেইনট্রি, কড়ই
৮. নতুন ব্রহ্মপুত্র যমুনা প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু, বিক্রিয়া অম্লীয় থেকে প্রশম, দো-আঁশ মাটি	পিতরাজ, রেইনট্রি, মান্দার, ঝিগা
৯. পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবনভূমি	উঁচু ও মাঝারি উঁচু বিক্রিয়া অম্লীয় থেকে প্রশম, দো-আঁশ ও পলি দো-আঁশ মাটি	রেইনট্রি, নিম, পিতরাজ, জারুল, মান্দার, শিমূল, মেরা, জাম, চাউ, লিচু
১০. সক্রিয় গঙ্গা প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু মাটির বিক্রিয়া প্রশম থেকে ক্ষারীয়, চুনযুক্ত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ	কড়ই, ঝিগা, কলা, নিম
১১. উচ্চ গঙ্গা নদী প্লাবনভূমি	উঁচু ও মাঝারি উঁচু, বিক্রিয়া প্রশম থেকে ক্ষারীয় চুন যুক্ত দো-আঁশ মাটি	রেইনট্রি, বাবলা, খয়ের, খেজুর, বেল, সেগুন, লিচু, আম
১২. নিম্ন গঙ্গা নদী প্লাবনভূমি	মাঝারি নিচু, বিক্রিয়া প্রশম থেকে ক্ষারীয়, চুনযুক্ত দো-আঁশ ও পলি দো-আঁশ মাটি	বাবলা, খয়ের, খেজুর, তাল, আম
১৩. গঙ্গা জোয়ার প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু বিক্রিয়া ক্ষারীয়, লোনা মাটি আছে, মাটির বুনট পলি দো-আঁশ থেকে এঁটেল দো-আঁশ	রেইনট্রি, কড়ই, পিতরাজ, ঝিগা/কাফলা, আমড়া, বিলাতী গাব, তাল, সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, বাইন, কলা, বাদাম, কাউ, সোনাইল
১৪. গোপালগঞ্জ খুলনা বিল	মাঝারি নিচু ও নিচু মাটির বিক্রিয়া প্রশম, পিটমাটি + এঁটেল দো-আঁশ	হিজল, মান্দার, হোগলা।
১৫. আড়িয়াল বিল	নিচু, মাটির বিক্রিয়া, প্রশম, বুনট এঁটেল দো-আঁশ	মান্দার হিজল
১৬. মধ্য মেঘনা নদী প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু মাটির বিক্রিয়া অম্লীয় থেকে প্রশম, বুনট দো-আঁশ থেকে পলি দো-আঁশ	রেইনট্রি, চার্ড, কড়ই, তাল, নারকেল

১৭. নিম্ন মেঘনা প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু, মাটির বিক্রিয়া অম্লীয় থেকে প্রশম বুনট পলি দো–আঁশ	তাল, নারকেল, রেইনট্রি, কড়ই
১৮. নতুন মেঘনা মোহনা প্লাবনভূমি	মাঝারি, উঁচু, প্রশম, পলি দো–আঁশ	মান্দার, হিজল, রেইনট্রি, কড়ই, তাল, নারকেল
১৯. পুরাতন মেঘনা মোহনা প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু, বিক্রিয়া প্রশম, দো–আঁশ ও পলি দো–আঁশ	রেইনট্রি, শিমুল, কড়ই, জাম্বুরা
২০. পূর্ব সুরমা কুশিয়ারা প্লাবনভূমি	মাঝারি উঁচু, অম্লীয় থেকে প্রশম পলি দো–আঁশ	হিজল, মান্দার, জারুল, পিতরাজ
২১. সিলেট বেসিন	মাঝারি নিচু ও নিচু, বিক্রিয়া অম্লীয় থেকে প্রশম বুনট এঁটেল দো–আঁশ	হিজল, মুর্তা, মান্দার, পিতরাজ, মেরা, জুগলা
২২. উত্তর ও পূর্ব সমতল পাদভূমি	উঁচু জমি, অম্লীয় বেলে ও বেলে এঁটেল মাটি	রেইনট্রি, সেগুন, শিরিষ, সোনাইল, তাল, খেজুর
২৩. চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি	মাঝারি উঁচু ও উঁচু প্রশম বিক্রিয়া, মাটির বুনট বেলে ও দো–আঁশ	নারকেল, সুপারি, ঝাউ
২৪. সেন্টমার্টিন কোরাল দ্বীপ	মাঝারি উঁচু প্রশম থেকে লোনা, পলি ও দো–আঁশ মাটি	নারকেল, সুপারি
২৫. সমতল বরেন্দ্র অঞ্চল	উঁচু জমি, অম্লীয়, পলি ও বেলে এঁটেল মাটি হলদে মাটি	রেইনট্রি, শাল, মেহগনি, গাওয়া
২৬. উচ্চ বরেন্দ্র অঞ্চল	উঁচু জমি, অম্লীয় পলি ও বেলে এঁটেল মাটি হলদে মাটি	নিম, শাল, মেহগনি, গাওয়া
২৭. উত্তর পূর্ব বরেন্দ্র অঞ্চল	উঁচু জমি, অম্লীয়, বেলে ও দো–আঁশ মাটি, শাল মাটি	নিম, শাল, মেহগনি, গাওয়া, সেগুন
২৮. মধুপুর অঞ্চল	উঁচু জমি, অম্লীয় বিক্রিয়া বেলে এঁটেল ও দো–আঁশ	কাঁঠাল, তেঁতুল, শাল, গজারি, রাবার, তাল, চাঁপালিশ
২৯. উত্তর ও পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল	উঁচু পাহাড়ি, জমি, অম্লীয় বিক্রিয়া, বেলে ও দো–আঁশ ও বেলে–এঁটেল লাল মাটি	রেইনট্রি, কড়ই, সিভিট, বাদী, গর্জন, গামার, সেগুন, রাবার, কলা, শিরীষ চাপালিশ, সফেদা, সোনাইল।
৩০. আখাউড়া সোপান	উঁচু জমি, অম্লীয় বিক্রিয়া দো–আঁশ, লাল মাটি	রেইনট্রি, তাল, কড়ই

এছাড়া ইপিল ইপিল, ইউক্যালিপটাস, মিনজিরি, দেবদারু, ম্যানজিয়াম, মেহগনি, আকাশমনি, সাধারণ ফলের গাছ ও বাঁশ বেত সারা দেশেই জন্মানো যায়।

মিশ্রণযোগ্যতার উদাহরণ

কৃষি বনজ বৃক্ষ ও আন্তঃফসলের মিশ্রণযোগ্যতার কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো

১. **মধুপুর অঞ্চল :** কাঁঠাল, আনারস, কাসাবা, পেপেঁ,আদা, হলুদ, কলা, অড়হর, শাল, গজারি, অর্জুন, আম, লিচু, সেগুন, কড়ই।

২. **উত্তর-পূর্ব বরেন্দ্র অঞ্চল :** ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি, ইপিল ইপিল, মেহগনি,আম, লিচু, পেপেঁ, কলা, আনারস।

৩. **লাউয়াছড়া মৌলভীবাজার :** চাপালিশ, কদম, জলপাই, আকাশমনি, শিশু, মেহগনি, আম, পেপেঁ, আনারস।

বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়া (Tree-crop interactions)

কোনো এক স্থানে বৃক্ষ ও ফসল একই সময়ে জন্মালে এদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়া বলে (The respective effects of tree and crop on them is known as tree crop interaction)।

প্রাচীনকাল থেকে কৃষি খামারে বৃক্ষ ও ফসল একই সাথে চাষাবাদ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মতো ঘন বসতিপূর্ণ দেশে বসত আঙ্গিনায় বৃক্ষ ও বসত বাগানকে আলাদা করে চিন্তা করা যায়। বসতবাড়িতে সাধারণত বৃক্ষ প্রাকৃতিকভাবে জন্মে বা অনেক সময় গৃহস্থ বৃক্ষের চারা রোপণ করে।

বাংলাদেশের কোনো এলাকায় দৈনিক ১১ ঘণ্টা রোদ পেলে সেখানে মাঠ ফসল এবং হালকা ছায়া ও ছোট কেনোপিবিশিষ্ট বৃক্ষও লাগানো যায়।

এলাকাভেদে বৃক্ষের প্রাধান্য : ভিন্নভিন্ন আবহাওয়াসম্পন্ন এলাকা বাংলাদেশে মৃত্তিকাভেদে বৃক্ষ-ফসল উপপদ্ধতির বৃক্ষ ও ফসলের প্রজাতি ও জাত ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক বৃহত্তর জেলাভেদে কয়েকটি প্রধান কৃষিবন বৃক্ষের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. বাবলা – যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া।

২. খেজুর – যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রাজশাহী, টাঙ্গাইল।

৩. শিশু – দিনাজপুর, রংপুর।

৪. খয়ের – রংপুর, দিনাজপুর।

৫. কাঁঠাল – ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।

৬. কড়ই – চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ।

৭. নারকেল – খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, কক্সবাজার।

৮. বাঁশ – ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট।

৯. তাল – ঢাকা, ফরিদপুর।

বাংলাদেশে ফসল মাঠে এসব বৃক্ষ প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে। তবে গাছ বড় হওয়ার পর কৃষক এসব গাছ থেকে জ্বালানি কাঠ, ফল, ছায়া ইত্যাদি পেয়ে থাকে।

বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়ার স্বরূপ

বৃক্ষ ও ফসলের আন্তঃক্রিয়া নিচে উল্লেখ করা হলো

১. জমিতে মাঠ ফসল থাকা অবস্থায় বৃক্ষের ছোট চারা লাগালে সে চারার প্রাথমিক বৃদ্ধি ক্ষতি হয়।

২. বৃক্ষ বড় হয়ে গেলে এর ছায়ায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. মাঠ ফসলে আশ্বিন মাসে সেচ দিলে এবং সে মাঠে আম গাছ থাকলে আমে ফসল কম হয়। কারণ সে সময় পানি পেয়ে গাছে ফুল আসার পরিবর্তে নতুন পাতা গজাতে থাকে। শুধু ফসলই নয় গৃহপালিত পশু ও বৃক্ষের সাথে আন্তঃক্রিয়া করে। যেমন–

৪. বন বাগানে গরু চলাফেরা করলে মাটি শক্ত হয়ে যায়, ফলে গাছের ক্ষতি হয়।

৫. আম বাগানে ছাগল পালন করলে ছাগল আম গাছের ছাল খেয়ে ফেলে। এছাড়া চারা গাছও বিনষ্ট করে থাকে।

এভাবেই বৃক্ষ ফসল ও পশুর আন্তঃক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে।

ফসল মাঠ বৃক্ষের পরিচর্যা

ফসল মাঠে জন্মানো সাধারণ পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে –

১. গাছের গোড়া ২ থেকে ৩ মিটার পরিধির এলাকায় ফসল বীজ না দেওয়া।

২. গাছের শিকড় কোদাল বা চাষ দিয়ে ছেঁটে দেওয়া (এতে অন্যান্য শিকড় মাটির গভীরে পৌঁছে)।

৩. গাছের পার্শ্বের বিস্তার করা শাখা–প্রশাখা ছাঁটাই করা হয়।

৪. গাছ লিগ্যুম গোত্রীয় হলে ফসল কিছু পরিমাণ পুষ্টি পেতে পারে, এজন্য গাছের আবর্জনা লতা–পাতা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

৫. বৃক্ষের জন্য আলাদাভাবে সার ও সেচ দেওয়া হয় না। তবে ফসলে প্রয়োগ করা সেচ ও সার থেকে বৃক্ষ কিছুটা উপকার পেয়ে থাকে।

৬. বৃক্ষের পোকা–মাকড় দমনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয় না।

৭. অনেক সময় বৃক্ষের গোড়া হালকাভাবে বেধে দেওয়া হয়।

৮. জমির উত্তর সীমান্তে এসব গাছ থাকলে কৃষক তা অনেক দিন রেখে দেয়।

এ ধরনের কৃষি বন মিশ্র ফসলের মধ্যে রয়েছে মসলা (যেমন— আদা, হলুদ), ডাল ফসল পশুখাদ্য ও অন্যান্য খাদ্য ফসল।

বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়ার উপাদান

কৃষি বনায়ন পদ্ধতিতে বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়ার উপাদানসমূহকে নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায়। যথা–

১. **আলো (Light):** বৃক্ষ ও ফসল উভয়ের জন্য আলো অত্যাবশ্যক। আলোর উপস্থিতিতে পাতার সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত হয়। মাঠ ফসলে জন্মানো বৃক্ষ ফসলে আলো পতনে বাধা সৃষ্টি করলে ফসলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে গিয়ে ফসলে ফলন কম হয়। বৃক্ষের কেনোপি যতো বড় হয় এবং পাতা যতো ঘন হয় আলো ততো বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই কম কেনোপি ও হালকা ছায়া অপরদিকে মাঠ ফসলের আলো চাহিদা সমান নয়। অধিক আলোর চাহিদাসম্পন্ন গাছের চেয়ে কম আঁলোর ফসল কৃষি বনে ভাল হয়। যেমন– আদা, হলুদ।

২. **তাপ ও আর্দ্রতা :** বৃক্ষ ও ফসল উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ অত্যাবশ্যক। কিন্তু গাছের ছায়ায় তাপ কমে যায়। সূর্যালোক ছাড়াও তাপমাত্রা বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর নির্ভর। ফসল মাঠে বৃক্ষ থাকলে সেই বৃক্ষের নিচে বা আশে-পাশে গাছের প্রস্বেদন-হেতু আর্দ্রতা বেশি থাকে এবং তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে। বলা যায় গাছের নিচে একটি পৃথক অণুজলবায়ু (microclimate) সৃষ্টি হয়। চা বাগানে ছায়াগাছ লাগিয়ে চা গাছের বৃদ্ধির জন্য একটি অণুজলবায়ু সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এজন্য চায়ের পান ফলন ও মান বাড়ে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা এভাবে বৃক্ষ ফসলের আন্তঃক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **বৃক্ষ ফসলের বয়স :** বয়সের ভিত্তিতে বৃক্ষ ফসলের আন্তঃক্রিয়া উপাদান ৬ ধরনের যথা–

(১) মাঠ ফসল —— বৃক্ষের চারাগাছ
(২) বড় মাঠ ফসল —— মধ্যম বৃক্ষ
(৩) বড় মাঠ ফসল —— বড় বৃক্ষ
(৪) চারা মাঠ ফসল —— বৃক্ষের চারা গাছ
(৫) চারা মাঠ ফসল —— মধ্যম বৃক্ষ
(৬) চারা মাঠ ফসল —— বড় বৃক্ষ

উপরে বর্ণিত সকল অবস্থায়ই আলো, তাপ ও আর্দ্রতা বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. **বায়ু চলাচল :** বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়া জন্য বায়ু চলাচল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বৃক্ষ বায়ু চলাচল হ্রাস করে এবং ভূমিক্ষয় কমায়— এভাবে ফসলের উপকার করে। আবার বেশি বাতাসে বৃক্ষ পড়ে গিয়ে ফসলের ক্ষতি করে। বন ঘন হলে অনেক সময় হালকা বায়ু চলাচলে রোধ করে ফসলের বাড়বাড়তি কমিয়ে দেয়।

৫. **পানি :** বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়ার জন্য মাটির আর্দ্রতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষের শিকড় অধিক পানি শোষণ করে নেয় বলে এর গোড়ার কাছাকাছি স্থানে ফসল জন্মে না। আবার জলাবদ্ধ ধানের জমিতে অধিকাংশ বৃক্ষের চারা গাছ টিকে না। বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে পানি সেচের সাহায্যে জলাবদ্ধ ধানের চাষ বাড়ার ফলে মাঠের অনেক বনজ গাছ মরে যাচ্ছে (যেমন— বাবলা, খয়ের, কড়ই ইত্যাদি) আমের বাগানে মাঠ ফসলের চাহিদা মতো ফুল ফোটার সময়ে সেচ দিলে আমের ফলন কমে যায়। এসব কারণে বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়ার পানি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে।

৬. **উদ্ভিদ পুষ্টি :** বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়ার জন্য উদ্ভিদ পুষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়া পুষ্টি উপাদান দু'ভাবে কার্যকর হয়ে থাকে, যেমন–

(ক) **প্রতিযোগী প্রভাব** (Antagonistic effect): মাঠ ফসলে ঘন করে বৃক্ষ চারা লাগালে মাটির পুষ্টি নিয়ে বৃক্ষ ও ফসলের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(খ) **সহযোগী প্রভাব** (Synergistic effect) : মাঠ ফসল থেকে চুয়ে যাওয়া পুষ্টি উপাদান বৃক্ষ গভীর মূল দিয়ে শোষণ করে নেয়। পুষ্টি উপাদানের অপচয় কম। তারপর গাছের পাতা নিচে বাড়লে বা পচে গিয়ে মাটির উপর স্তরে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে। ভূমির উর্বরতা রক্ষায় গভীর- মূলী উদ্ভিদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। যার ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৯.১)।

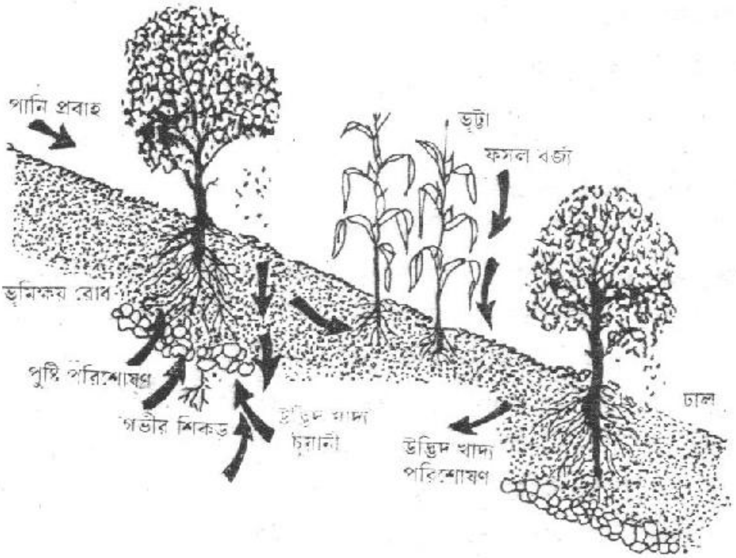

চিত্র ৯.১ : গভীরমূলী গাছের সাহায্যে ভূমিক্ষয় রোধ।

কৃষি বন- পশুখামারে আন্তঃক্রিয়ার উপাদান

কৃষির পশুর আন্তঃক্রিয়ার মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছে –

১. **কৃষিবনের প্রকার :** যথা– পশুখাদ্য, ফল, কাঠ। বনজ বৃক্ষ পশুখাদ্য হলে সেই নিদিষ্ট পশুপালন করা যেতে পারে। বন বাগানের স্থানে স্থানে ঘাসের চাষও করা যেতে পারে।

২. **মাটির প্রকার :** যথা– বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি, এঁটেল মাটি। এঁটেল মাটির বন বাগানে পশু পালন অসুবিধাজনক, কারণ সেখানে কাদা হয়ে পশু অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। আবার মাটি বেলে ধরনের হলে সেখানে ঘাসের অভাবে পশু অপুষ্টিতে ভুগতে পারে।

৩. **পশুর প্রকার :**পশুর ওজন ও পায়ের আকৃতি– পশুর ওজন বেশি ও পায়ের খুড়া ছোট হলে (যেমন– গরু) বাগানের মাটি শক্ত হয়ে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে। মাটির উর্বরতা কমে যাবে।

৪. **পশুর খাদ্য :** বৃক্ষের চারা গাছ বা বাকল পশুখাদ্য হলে সে সময়ে সেই নির্দিষ্ট পশু-পালন করা সমীচীন হবে না। যেমন– আম ও কাঁঠাল গাছের চারা ও বাকল ছাগলের প্রিয়

খাদ্য। এক্ষেত্রে আম ও কাঁঠালের ছোট ছোট গাছের বাগানে ছাগল পালন করা সম্ভব হবে না।

৫. **বনের প্রকার :** বন খুব ঘন হলে সেখানে বন্য প্রাণী আশ্রয় নিয়ে পালিত পশুর ক্ষতি করতে পারে। সেজন্য পশু পালনের বাগানে হালকাভাবে গাছ লাগাতে হবে।

আন্তঃক্রিয়াভিত্তিক বৃক্ষ ও ফসল মনোনয়নের উদাহরণ

কৃষি বনায়ন পদ্ধতি কোনো ফসলের মাঠে কোন্ বৃক্ষ রোপণ করা যাবে তা নিম্নলিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করে। যথা–

(ক) ভূ-পৃষ্ঠ (Above ground)

১. আলো ২. তাপ

৩. বায়ু চলাচল

(খ) ভূ-নিম্ন (Underground)

৪. পানি ৫. পুষ্টি সরবরাহ

১. **আলো, তাপ ও বায়ু চলাচল :** আলো তাপ ও বায়ু চলাচল চাহিদার ভিত্তিতে ফসলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) বেশি চাহিদা –পাট, তুলা, ধান

(খ) কম চাহিদা– আদা, হলুদ, আনারস

বৃক্ষের আলো প্রতিবন্ধকতা গুণ হিসেবে গাছকে কেনোপি অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা–

(ক) ঘন ছায়া — বট, রেইনট্রি, আম

(খ) হালকা ছায়া — কড়ই, তাল, বাবলা

এ বিবেচনায় হালকা ছায়াসম্পন্ন গাছ এবং কম আলো চাহিদাসম্পন্ন ফসল কৃষিবনের জন্য অধিক উপযোগী। আলোর ভিত্তিতে (তাপসহ) ফসল ও বৃক্ষের আন্তঃক্রিয়া দু'প্রকার হতে পারে–

যথা–(ক) ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Positive interaction বা Synergistic) যেমন— বাবলা + আদা ।

(খ) ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Negative interaction বা Antagonistic) যেমন— পাট + বট গাছ ।

২. পানি ও পুষ্টি সরবরাহ

পানি ও পুষ্টি চাহিদার ভিত্তিতে ফসলকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

(ক) বেশি চাহিদা— ভুট্টা, আলু, ধান

(খ) কম চাহিদা— ডাল ফসল, স্থানীয় জাতের ফসল

পানি ও পুষ্টি চাহিদার ভিত্তিতে বৃক্ষ দু'প্রকার হতে পারে। যেমন–

(ক) বেশি চাহিদা : দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ– ইউক্যালিপটাস, মেহগনি (সহ অগভীর– মূলী বৃক্ষ)

(খ) কম চাহিদা – লিগ্যুম বৃক্ষ– বাবলা, ইপিল ইপিল (সহ গভীরমূলী বৃক্ষ)

পানি ও পুষ্টি চাহিদার ভিত্তিতে মাঠ ফসল বৃক্ষ আন্তঃক্রিয়া প্রধানত দু'প্রকার হতে পারে। যথা–

১. ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Positive interaction) : যথা– বাবলা, ডাল ফসল।

২. ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া (Negative interction) : যথা– ইউক্যালিপটাস, ভুট্টা।

এভাবে ভূ-উপরস্থ ও ভূ-নিম্নস্থ উপাদান নিয়ে মাঠ ফসল ও বৃক্ষের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া সংঘটিত হয়। কৃষিবন প্রতিষ্ঠার সময় এসব উপাদান বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

বৃক্ষ ফসল আন্তঃক্রিয়ার উদাহরণ

উপাদান	প্রভাব	আন্তঃক্রিয়া	
		ধনাত্মক	ঋণাত্মক
জলবায়ু	ছায়া	কম গাছ	বেশি গাছ
	বায়ুরোধ	বায়ুচলাচল শুষ্ককরণ ভূমিক্ষয় রোধ	
	পানি (আর্দ্রতা)	বাষ্প প্রস্বদন কমায় গভীর পানি শোষণ	বেশি বৃক্ষ–ঘন ফসল
মৃত্তিকা	জৈব পদার্থ	পাতা পচা সার	স্থূল পাতা শাখা
	পুষ্টি	নাইট্রোজেন সংবন্ধন গভীর স্তর থেকে শোষণ	অলিগ্যুম গাছ–ঘন ফসল

জমি ও মৃত্তিকাভেদে মাঠ ফসলে চাষের জন্য বৃক্ষের প্রজাতি ও ভিন্ন হয়ে থাকে। এখানে জমি ও আর্দ্রতাভেদে প্রধান প্রধান বৃক্ষের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. বন্যামুক্ত এলাকার বৃক্ষ : বাবলা, শিশু, নিম, সুপারি, খয়ের, পিতরাজ, কড়ই, মিনজিরি।

২. বন্যা প্লাবিত এলাকার বৃক্ষ : মান্দার, শেওড়াজাতীয় গাছ, ঝাউ (গুজা) ধইঞ্চ্যা, হিজল, গাব, কদম।

৩. লোনা এলাকা : বিলাতী গাব, আমড়া, তাল, নারকেল।

৪. পাহাড়ি এলাকা : কড়ই, গামার, গর্জন, তেলশুর।

৫. মধুপুর ও বরেন্দ্রে লালমাটি অঞ্চল : শাল, গজারি, কাঁঠাল, অর্জুন।

ছায়া সহনশীল (মধ্যম) ফসল : আদা, হলুদ, পান, ওলকচু, মিষ্টিআলু, মরিচ, স্কোয়াশ, গাছ–আলুসহ আরও কিছু সংখ্যক স্থানীয় জাতের মসলা, সবজি ও ভেষজ উদ্ভিদ।

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয় সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষ অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়

কৃষিবনের লিগ্যুম বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য

বৃক্ষের নাম : আকাশমনি

বৈজ্ঞানিক নাম : *Acacia auriculiformis*

গোত্র : Leguminosae

সিলভান বৈশিষ্ট্য (Silvan fealtures)

বর্ধনশীলতা : দ্রুত

উচ্চতা : মধ্যম

কাণ্ড : মধ্যম সোজা

বাকল : ধূসর বাদামি, অমসৃণ, উপর–নিচ লম্বা ফাটল

পাতা : ১০ থেকে ১৬ × ১.৫ থেকে ২.৫ সেমি.

ফুল : হলদে ৮ সেমি. লম্বা মঞ্জরী (spike)

ফল : পড বা শুঁটি, ৮ থেকে ১২ সেমি লম্বা, বাঁকা বা পেঁচানো।

১. **চাষাবাদ**

ফুল আসার সময় – জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর

ফল আসার সময় – ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি

বংশবিস্তার মাধ্যম – বীজ

২. **অভিযোজিতা :** অভিযোজন মাত্রা প্রশস্ত,

অনুর্বর এঁটেল মাটি, বেলে মাটি, অম্ল ও ক্ষারীয় মাটি, লোনা মাটি এমনকি সাময়িকভাবে জলাবদ্ধ মাটিতে টিকে থাকতে পারে। কিছুটা খরা প্রতিরোধক।

৩. **ভৌগোলিক বিতরণ :** অস্ট্রেলিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও ইন্দোনেশিয়া নানা স্থানে প্রাকৃতিকভাবে জমাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** জ্বালানি হিসেবে উত্তম। কাণ্ডের সার কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করা যায়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বসতবাড়ি, খামার বন পতিত জমিসহ অনেক স্থানে জন্মানোর উপযোগী। নিয়মিত শিকড় ও বিটপ (shoot) ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে ফসল মাঠেও জন্মানো যায়।

বৃক্ষের নাম : খয়ের

বৈজ্ঞানিক নাম : *Acacia catechee*

গোত্র : Leguminosae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতি – পাতাঝরা, শীতে পাতা ঝরে।

আকার – মধ্যম

শাখা–প্রশাখা – সরু, কাঁটা আছে কাঁটা বাঁকানো

পাতা – দ্বিপত্রী (Bi-pinnate)

উপপত্র (Leaflet) - ০.৪ সে.মি. দীর্ঘ

মঞ্জরী (Rachis) – ৫ থেকে ১৩ সে.মি. দীর্ঘ

ফুল – ঘিয়ে সাদা রঙসহ বাদামি আভা।

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় – মে থেকে জুন

ফল আসার সময় – ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি

বংশবিস্তার মাধ্যম – বীজ

ছাঁটাই– করা যায়।

২. **অভিযোজিতা** (Adaptibility) : অনেক ধরনের মাটিতেই জন্মে, তবে পলিমাটিই উত্তম, কিছুটা খরা প্রতিরোধক।

৩. **ভৌগোলিক বিতরণ** (Geographical distribution) **:** হিমালয় উপঅঞ্চলসহ পাঞ্জাব থেকে সিকিম পর্যন্ত জন্মাতে দেখা যায়। মায়ানমারেও খয়ের গাছ জন্মে। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলাতে জন্মাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** লম্বা কাণ্ড খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। লাঙল ও গাড়ির চাকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আচঁড়ার দাঁত, নৌকা, আসবাবপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি ও পারিবারিক বিবিধ কাজে ব্যবহার করা যায়। জ্বালানি হিসেবে ভাল। গাছের বাকল ও অন্তরকাঠ (heart wood) থেকে খয়ের নিষ্কাশন করা হয়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বসতবাড়ি, মাঠ ফসল, রাস্তা পার্শ্ব, পতিত জমিতে জন্মানো যায়।

বৃক্ষের নাম : ম্যানজিয়াম
বৈজ্ঞানিক নাম : *Acacia mangium*
গোত্র : Leguminosae.

১. **সিলভান** বৈশিষ্ট্য (Silvan features)

বর্ধনশীলতা : দ্রুত বর্ধনশীল

আকার : ছোট থেকে মধ্যম বড়

বাকল : অমসৃণ, লম্বালম্বি ফাটল, ধূসর থেকে বাদামি

পাতা : পরিপক্ব পাতা বড়, ২০–২৫ × ৫–১০ সে.মি. গাঢ় সবুজ,

ফুল : হলদে

ফল : পড, ৭–৮ × ৩–৫ সে.মি.

বীজ : উজ্জ্বল কালো।

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — মে থেকে জুন

বীজ পরিপক্ব হওয়ার সময় — অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর

বংশবিস্তার মাধ্যম — প্রধানত বীজ

ছাঁটাই গুণাবলী — ভাল।

২. **অভিযোজিতা :** সুনিষ্কাশিত অম্লীয় মাটিতে ভাল জন্মে তবে অসম্পূর্ণ নিকাশ-সম্পন্ন জমিতেও জন্মাতে পারে। আলো চাহিদা মধ্যম বা বেশি।

৩. **ভৌগোলিক বিতরণ :** উত্তর কুইন্সল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও ইন্দোনেশিয়া বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** জ্বালানি হিসেবে ভাল। সার কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করা যায়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকাসহ বসতবাড়ি, খামার, পতিত জমিও রাস্তার পার্শ্ব স্থানে জন্মানো যায়। নিয়মিত ছাঁটাই করে ফসল মাঠেও জন্মানো যায়।

বৃক্ষের নাম : বাবলা

বৈজ্ঞানিক নাম : *Acacia nilotica*

গোত্র : Leguminosae

১. **সিলভান বৈশিষ্ট্য**

আকার : ছোট থেকে মধ্যমাকার।

কেনোপি : মধ্য কেনোপি বা ক্রাউন ঘন পল্লববিশিষ্ট

কাণ্ড : কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা অনেকটা সোজা

বাকল : ধূসর, সাদা কাঁটা আছে, কাঁটার দৈর্ঘ্য ৪ থেকে ৬ সে. মি.

পাতা : দ্বি-পত্রী, ২ থেকে ৪ সে. মি. লম্বা।

উপপত্র : ০.২ থেকে ০.৫ সে. মি. লম্বা, সোজা।

ফুল : ছোট, হলদে মঞ্জরী গোলাকার, ব্যাস প্রায় ১.৩ সে. মি.

ফল : পড, ৭–১৫ × ১.৫ সে. মি., একক, প্রতি ফলে ৮ থেকে ১২ টি বীজ, মালার মতো দেখতে বর্ণ সাদা ধূসর।

চাষাবাদ

ফুল আসার সময়– জুন থেকে সেপ্টেম্বর

ফল পরিপক্ব হওয়ার সময়– ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি

বংশবিস্তার মাধ্যম– বীজ

ছাঁটাই উপযোগিতা– ভাল, ছাঁটাই করে ক্রাউন পল্লব কমিয়ে রাখা যায়।

২. **অভিযোজিতা :** অবআর্দ্র অঞ্চলের অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। অনুর্বর মাটিতে ও জন্মে। স্বল্পকালীন জলাবদ্ধতাও সহ্য করতে পারে। কিছুটা খরা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে । আলো চাহিদা মধ্যম থেকে বেশি।

৩. **ভৌগোলিক বিতরণ :** উষ্ণ আফ্রিকা, আরব, মিশর, পাকিস্তান ও ভারতের শুস্ক অঞ্চলসমূহে বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** বাকল থেকে ট্যানিং বর্ণ দ্রব্য তৈরি হয়। গাছের কষ থেকে গাম তৈরি হয়। কাঠ বেশ শক্ত। এই কাঠ দ্বারা গাড়ির চাকা,কৃষি যন্ত্রপাতি, সেতুর খুঁটি তৈরি করা হয়। কাঁচা ফল পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পাকা ফল গুঁড়া করে পশুখাদ্য মিশানো যায়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বাংলাদেশে মাঠ ফসল, রাস্তা পার্শ্ব, বসতবাড়ি ও খামারসহ অনেক স্থানে জন্মানো যায়।

বৃক্ষের নাম : শিরিষ বা কালি কড়ই
বৈজ্ঞানিক নাম : *Albizzia lebbeck*
গোত্র : Leguminosae

১. **সিলভান বৈশিষ্ট্য**

আকার – বড়
প্রকৃতি – পাতাঝরা
কেনোপি – বিস্তৃত
পাতা – দ্বি-পত্রিক, উপপত্র ২.৫–৩.০ × ১.৫–২.০ সে. মি.
বিস্তার প্রায় ডিম্বাকার (oblong)
শিকড় – ভূ-পৃষ্ঠ
ফুল – সবুজাভ সাদা
ফল – পড, ১৫–৩০ × ৩–৪ সে. মি., হলদে বাদামি

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় – মে থেকে জুন
ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় – ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি
বংশবিস্তার মাধ্যম– বীজ, তবে শাখা কর্তন কলম ও স্টাম্প করা যায়, ছাঁটাই– করা যায়।

২. **অভিযোজিতা :** সুনিষ্কাশিত দো–আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। তবে এই গাছ সাময়িক পানিবদ্ধতা ও কিছুটা লোনা সহ্য করতে পারে। হালকা ছায়াতেও জন্মাতে পারে।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** উষ্ণ হিমালয় এলাকা থেকে শ্রীলংকা, মায়ানমার, চীন, উত্তর অস্ট্রেলিয়া এবং উষ্ণ আফ্রিকায় জন্মাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** কাঠ খুব শক্ত। এজন্য নির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। কৃষি যন্ত্রপাতি। কৃষি যন্ত্রপাতি, সেতু, রেল স্লিপার তৈরি হয়। কাঠ বেশ ভারি। গাছের পাতা গবাদি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** সারাদেশেই বিক্ষিপ্তভাবে জন্মাতে দেখা যায় তবে উত্তরাঞ্চলে বেশি।

বৃক্ষের নাম : **শ্বেতকড়ই বা চন্দনাকড়ই**
বৈজ্ঞানিক নাম : *Albizzia procera*
গোত্র : Leguminosae

১. **সিলভান বৈশিষ্ট্য**

বর্ধনশীলতা : দ্রুত বর্ধনশীল

প্রকৃতি : অর্ধ পাতাঝরা (Semi- desiduous)

কাণ্ড : লম্বা, শাখা প্রশাখা কম, খাড়া

বাকল : হলদে ধূসর

পাতা : দ্বি-পাত্রিক, উপপত্র ২.৫×১.৬ – ২০ সে. মি.

ফুল : হলদে সাদা

ফল : পড, ১০–২০ × ১.৫–২.০ সে. মি., লালচে বাদামি প্রতি ফলে বীজ ৬ থেকে ১২ টি

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় – মে থেকে সেপ্টেম্বর

বীজ পরিপক্ক হওয়ার সময় – অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি

বংশবিস্তার মাধ্যম – বীজ ও শাখা কর্তন

ছাঁটাই : নিয়মিত ছাঁটাই করা যায়।

২. **অভিযোজিতা :** নদীর তীরে সিক্ত জায়গায় এবং পলিমাটিতে ভাল জন্মে। আলো চাহিদা বেশি, কিছুটা খরা সহ্য করতে পারে। সাময়িক পানিবদ্ধতাও কমবেশি সহ্য করতে পারে।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** হিমালয় এলাকা থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলসহ, মায়ানমার ও চীন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় জন্মে।

৪. **ব্যবহার :** খয়ের খুঁটি, কৃষি যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা যায়। কোনো কোনো সময় সীমিত আকারে গাছের পাতা পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বন বাগান রাস্তা পার্শ্বস্থ গাছ, পতিত ভূমি, বসত বাড়ি ও জনস্থলে লাগানো হয়। শিকড় ও বিটপ নিয়মিত ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে মাঠ ফসলেও লাগানো যায়।

কড়ইজাতীয় বৃক্ষের তুলনামূলক বিবরণ

প্রজাতিসমূহ : ১. শ্বেত কড়ই — *Albizia procera*
২. রেইনট্রি কড়ই — *Samanea saman*
৩. চাকোয়া কড়ই — *Albizia chineusis*

৪. শিরিষ — *Albizia lebbeck*
৫. মটর কড়ই — *Albizia inuditor*
৬. মলাকানা — *Albizia mollucans*
৭. ফালকাটারিয়া — *Albizia falcataria*

নাম	পাতার আকার	ফুল	ফল	অন্যান্য
চাকোয়া কড়ই	রেসিস, ১২ থেকে ৩০ বোঁটার গোড়ায় ফোলা উপপত্র – ৬ × ২	সাদা হলদে	৮–১২ × ২–২.৫ সে. মি.	
রেইনট্রি কড়ই	রেসিস, ৪০ থেকে ৫০ সে. মি. উপপত্র ২.৫–৫.০ × ১.২–২.৫	গোলাপি	১২–২২ × ১.৫ সে. মি.	
শ্বেত কড়ই	রেসিস, ২৫ থেকে ৪০ সে. মি. গোড়ায় ফোলা উপপত্র ২.৫ × ১.৫–২.০ সে. মি.	সাদা হলদে	১০–২০ × ১.৫–২.০ লাল বাদামি সে. মি. ৬ থেকে ১২ টি বীজ	
শিরিষ	রেসিস, ৭ থেকে ১৫ সে. মি. গোড়ায় ফোলা উপপত্র ২.৫–৩.০ × ১.৫– ২.০ সে. মি.	সবুজাভ সাদা	১৫–৩০. × ৩–৪ সে. মি. হলদে বাদামি	
মটর কড়ই	রেসিস, ৪ থেকে ১২ সে. মি. উপপত্র ৫–১৩ × ১.৮–৪.৫ সে. মি.	সাদা হলদে	১৫–১৮ × ৩.৫ সে. মি. লাল বাদামি ৬ থেকে ৮ টি ফল	

Cassia* প্রজাতি : *Cassia fistula, C. siamea, C. sophera, C. tora
Leguminosae

বৈশিষ্ট্য	গাছের নাম	
	বাঁদর লাঠি (*C. fistula*)	মিনজিরি (*C. siamea*)
বর্ধনশীলতা	মধ্যম	দ্রুত
গাছের আকার	মধ্যম	মধ্যম
পাতা	২০ থেকে ৩০ সে.মি বর্ণ গাঢ় সবুজ	২৫ থেকে ৩৫ সে. মি.
উপপত্র	৪ থেকে ৮ জোড়া	৫ থেকে ৮ জোড়া চিকন লম্বাটে
কাণ্ড	মধ্যম সোজা	মধ্যম সোজা
শিকড়	খুব গভীর	মধ্যম গভীর

ফুল	হলদে দর্শনীয়	হলদে
ফল	পড ৩০ থেকে ৬০ সে. মি. লম্বা ছোট লাঠির মতো	চ্যাপ্টা পড ১৫ থেকে ২৫ সে.মি. লম্বা
ফুল আসার সময়	মার্চ থেকে জুন	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর
ফল পরিপক্ব সময়	ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি	ডিসেম্বর থেকে মার্চ
বংশবিস্তার	বীজ ও স্টাম্প	বীজ ও স্টাম্প
ছাঁটাই	করা যায়	করা যায়
অভিযোজিতা	অধিকাংশ মাটি, সাময়িক পানিবদ্ধতা, আংশিক ছায়া সহনশীল	অধিকাংশ মাটি, মাটির সিক্ততা সহনশীল
ভৌগোলিক বিস্তার	ভারত, শ্রীলংকা, চীন ও মালে	ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া
ব্যবহার	কাঠ শক্ত ও স্থায়ী, সকল নির্মাণ, যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়	জ্বালানি, খুঁটি, পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
বাংলাদেশে উৎপাদন	সারা দেশেই বসতবাড়ি, রাস্তা-বাঁধ পার্শ্ব ও জনস্থলে লাগানো যায়।	সারাদেশেই বসতবাড়ি, বাগান, রাস্তা-বাঁধ পার্শ্ব ও জনস্থলে লাগানো যায়।

মান্দার (*Erythrina*) প্রজাতি

বৈশিষ্ট্য	গাছের নাম	
	পানি মান্দার (*E. fusca*)	মান্দার (*E. oricutalis*)
বর্ধনশীলতা	মধ্যম	দ্রুত
গাছের আকার	মধ্যম	মধ্যম
শাখা	ময়লা ধূসর	ধূসর সবুজ
কাঁটা	অনেক বেশি	কালচে কাঁটা
পাতা	ত্রি-পত্রিক, পাতার বোঁটা ৫ থেকে ১০ সে.মি. লম্বা	ত্রি-পত্রিক, ১০ থেকে ১৫ সে.মি. লম্বা
উপপত্র	৭ থেকে ১৫ × ৩.৫ থেকে ১৩ সে. মি.	
প্রকৃতি	পাতাঝরা	
ফুল	শীর্ষস্থ, লাল	ঘন রেসিম
ফল	পড, ৭ থেকে ১৩ সে. মি. লম্বা, ৬ থেকে ৮টি বীজ	পড, ১৫ থেকে ৩০ সে.মি. লম্বা

ফুল আসার সময়	জানুয়ারি থেকে মার্চ	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ
ফল পরিপক্ব সময়	এপ্রিল থেকে জুন	আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর
বংশবিস্তার	শাখা কর্তন	বীজ ও শাখা কর্তন
অভিযোজিতা	অনেক মাটিতে জন্মে, পানিবদ্ধতা সহনশীল	অবক্ষয়িত মাটিতেও জন্মে। পানিবদ্ধতার সহনশীলতা মধ্যম
ভৌগোলিক বিস্তার	ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ	বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া
ব্যবহার	বেড়া, জ্বালানি, পাতা গো-খাদ্য	জীবন্ত বেড়া, গো-খাদ্য ও জ্বালানি
বাংলাদেশে উৎপাদন	সারাদেশেই জীবন্ত বেড়া ও জ্বালানির জন্য উৎপাদিত হয়	সারাদেশেই জন্মে।

শিশু ও রেইনট্রি (গোত্র Leguminosae)

বৈশিষ্ট্য	গাছের নাম	
	শিশু *(Delbergia sissoo)*	রেইনট্রি *(Samanea saman)*
গাছ	বড়	উঁচু বড়
কাণ্ড	কাণ্ড ও প্রধান শাখা বড়	কাণ্ড লম্বা
কেনোপি ও মুকুট	বড়	মধ্যম
পাতা	৩০ থেকে ৪৫ সে. মি. লম্বা পিনি– ১২ থেকে ২০ সে.মি.	১০ থেকে ২৫ সে.মি. লম্বা পিনি– ২.৫–৭.৫ × ২.০–৬.৫ সে.মি
উপপত্র	ছোট, চিকন	গোলাকার/ডিম্বাকার
ফুল	ঘন, হালকা গোলাপি	হালকা হলদে
ফুল	ঘন, হালকা গোলাপি	হালকা হলদে
ফল	পড, ১২–২২ × ১.৫ সে.মি	পড, ৫–৭ × ০.৮–১.২ হাল্কা বাদামি
ফুল আসার সময়	মার্চ থেকে অক্টোবর	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ
ফল পরিপক্ব সময়	নভেম্বর থেকে মার্চ	অক্টোবর থেকে জানুয়ারি
বংশবিস্তার	বীজ ও শাখা কলম	বীজ ও স্ট্যাম্প
ভৌগোলিক বিস্তার	ব্রাজিল ও উষ্ণ মণ্ডল	হিমালয়, বাংলাদেশ, নেপাল
বাংলাদেশে উৎপাদন	সারা দেশেই জন্মে	সারা দেশেই জন্মে।

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয় সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষ অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

কৃষিবন গাছের বৈশিষ্ট্য : ফলজ, ভেষজ ও বাঁশ

আতাফল ও শরীফা

বৃক্ষের নাম	: আতাফল	বৃক্ষের নাম	: শরীফা
বৈজ্ঞানিক নাম	: *Annona reticulata*	বৈজ্ঞানিক নাম	: *Annona squamosa*
গোত্র	: Annonaceae	গোত্র	: Annonaceae.

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

গাছের আকার — ছোট গাছ।

পাতা — সরল, একান্তর, ডিম্বাকার, ৮–১২ × ২.৫– ৫.০ সোজা।

ফুল — সবুজাভ সাদা, ২.৫ সে.মি. লম্বা

ফল — বেরি, ৭ থেকে ১০ সে.মি. ব্যাস

ফুল আসার সময় — মে থেকে আগস্ট (শরীফা — মার্চ থেকে মে)

ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — আগস্ট থেকে নভেম্বর

বংশবিস্তার মাধ্যম — বীজ

২. **অভিযোজিতা :** দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। তবে অবক্ষয়িত মাটিতে জন্মে। আতাফল সমুদ্র পৃষ্ঠতল থেকে শুরু করে ১০০০ মিটার উঁচু পর্যন্ত স্থানেও জন্মানো যায়।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** উষ্ণ আমেরিকা, বাংলাদেশ ও ভারতে ভাল জন্মাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** ফল সুস্বাদু। আতাফল গাছের পাতা, বীজ ও অপুষ্ট ফল শুকিয়ে গুঁড়া করে কীটনাশক বানানো যায়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** সারাদেশেই বসতবাড়িতে জন্মে থাকে। গাছ ও শিকড় মধ্যমভাবে ছাঁটাই করে এর আশে-পাশে ছায়া সহ্যশীল অন্যান্য গাছ লাগানো যায়।

বৃক্ষের নাম : কাঁঠাল

বৈজ্ঞানিক নাম : *Artocarpus heterophyllus*

গোত্র : Moraceae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতি – চিরসবুজ

আকার — গাছের আকার বড়, ঘন পল্লবিত

কেনোপি ও ক্রাউন — অনেক বড়

পাতা — সরল, একান্তর, ৭ থেকে ২০ × ৪ থেকে ৮ সে.মি. প্রায় কৌণিক (elliptic) থেকে ডিম্বাকার (ovate) বর্ণ গাঢ় সবুজ, উপরিভাগ উজ্জ্বল।

ফুল — আবরিত, গুচ্ছিভূত

ফল — সিনকার্প (syncarp) ৩০ থেকে ৯০ সে.মি. লম্বা, কাটাযুক্ত, বোঁটা খাটো।

ফুল আসার সময় — নভেম্বর থেকে মার্চ

ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় — এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর

বংশবিস্তার — বীজ ও কলম।

২. **অভিযোজিতা :** পলিমাটিতে ভাল হয়। উঁচু লাল মাটি ও উত্তম। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** ভারত ও বাংলাদেশসহ পূর্ব এশিয়া।

৪. **ব্যবহার :** বহুব্যবহারমুখী গাছ। কাঠ শক্ত ও মূল্যবান। আসবাবপত্র ভাল হয়। ফল পাকা ও সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। পাতা উত্তম ছাগল খাদ্য, অন্যান্য বর্জ্য অংশ উন্নত মানের জ্বালানি।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বসত বাড়ি ও বন বাগান হিসেবে সারা দেশেই জন্মে, তবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরে বেশি জন্মে।

বৃক্ষের নাম : খেজুর

বৈজ্ঞানিক নাম : *Phoenix sylvestris*

গোত্র : Palmae

১. **সিলভান বৈশিষ্ট্য**

আকার — মধ্যম, ৮ থেকে ১০ মিটার

কান্ড — শাখাবিহীন, খাঁজযুক্ত

পাতা — ১২ থেকে ৩৫ সে.মি. লম্বা, প্রান্ত সূচাঁলো

ফুল — পুরুষ ফুল সাদা, ছোট সুগন্ধ যুক্ত, স্ত্রী ফুল — ৫ সে.মি. দীর্ঘ।

ফল — ড্রুপ, প্রায় ২.৫ সে.মি. লম্বা

ফুল আসার সময় — ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল

ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় — সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর

বংশবিস্তার মাধ্যম — বীজ।

২. **অভিযোজিতা :** অনেক মাটি ও জলবায়ুতে জন্মানো যায়। তবে শুষ্ক জলবায়ুতে ভাল হয়।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমারে জন্মে। তবে খেজুরের অনেক জাত রয়েছে। আরব ও দেশে নির্দিষ্ট জাতের খেজুর জন্মে থাকে।

৪. **ব্যবহার :** রস দিয়ে গুড় তৈরি হয়। পাতা দিয়ে গার্হস্থ্য দ্রব্য ও কারুকার্য করা হয়। ঘরের বেড়া ও চাল তৈরি করা যায়। ফল খাওয়া হয়। কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বসতবাড়ি ,রাস্তা বাঁধ পার্শ্ব কৃষি জমিসহ অনেক স্থানে জন্মে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে খেজুর গাছ বেশি জন্মে।

বৃক্ষের নাম : নারকেল
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cocos nusifera*
গোত্র : Palmae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — সরু, উঁচু গাছ
কাণ্ড — শাখা প্রশাখা বিহীন, খাঁজযুক্ত
পাতা — গাছের মাথায় ১৫ থেকে ৩০ টি পাতা থাকে
ফুল — স্পেডিক্স আবরিত, স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদা
ফল — ড্রুপ, (Drupe) ২০ থেকে ৩০ সে.মি. লম্বা
ফুল আসার সময় — মার্চ থেকে জুলাই
ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর
বংশবিস্তার মাধ্যম – বীজ

২. **অভিযোজিতা :** বেলে-দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। লোনা মাটিতে ভাল জন্মে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া নারকেলের জন্য অনুকূল। সাময়িক প্লাবনে টিকে থাকতে পারে।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চল। ভারত, বাংলাদেশ শ্রীলংকা ও মায়ানমারে ভাল হয়।

৪. **ব্যবহার :** নারকেল খাদ্য ও তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গাছের কাঠ ও পাতা ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজে লাগে। জ্বালানিও পাওয়া যায়। এক কথায় নারকেল গাছের সকল অংশই কাজে লাগে।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** প্রায় সারা দেশেই বসতবাড়ি ও বাগানে করা হয়। তবে দেশের উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে বেশি জন্মে।

বৃক্ষের নাম : সুপারি
বৈজ্ঞানিক নাম : *Areca catechue*
গোত্র : Palmae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

কাণ্ড – সোজা,খাঁজযুক্ত ধূসর সাদা থেকে সবুজ
উষ্ণতা — গাছের উচ্চতা ২০ থেকে ২৫ মিটার
ব্যাস — ১৪ থেকে ২০ সে.মি.
পাতা — পিন্নেট ১ থেকে ২ মিটার লম্বা
উপপত্র — ৩০ থেকে ৬০ সে.মি. লম্বা
ফুল — স্পেডিক্স পুরুষ ফুল বেশি

স্ত্রী ফুল অবৃন্তক, একক বা ২ থেকে ৩টি এক সাথে থাকে
ফল — ডিম্বাকৃতি সুপারি ৪ থেকে ৬ সে.মি. লম্বা
ফুল আসার সময় — মার্চ থেকে মে
ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর
বংশবিস্তার — বীজ

২. **অভিযোজিতা :** দো-আঁশ আলগা (loose)মাটিতে ভাল জন্মে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া অধিক উপযোগী।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

৪. **ব্যবহার :** কাঠ ঘরের বেড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাতা জ্বালানিও কারুকার্যে ব্যবহৃত হয়। সুপারি চিবিয়ে খাওয়া হয়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** সারা দেশেই বসতবাড়িতে জন্মানো হয়। তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বেশি।

বৃক্ষের নাম : সফেদা
বৈজ্ঞানিক নাম : *Achras sapota*
গোত্র : Sapotaceae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — মধ্যম
প্রকৃতি — চিরসবুজ, ঘন ক্রাউন
বাকল — খসখসে,বর্ণ-গাঢ় সবুজ
পাতা — প্রশাখার মাথায় পাতা গুচ্ছিত
সরল, একান্তর ৭ থেকে ১৫ × ৫ থেকে ১০ সে.মি.
ফুল — একক, অক্ষীয়, সাদাটে
ফল — বেরি, বীজের সংখ্যা ৫ বা বেশি বীজ উজ্জ্বল কালো

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — মে থেকে জুন
ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর
বংশবিস্তার মাধ্যম — প্রধানত বীজ, জোড়কলম ও গুটিকলম ।

২. **অভিযোজিতা :** দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। সাময়িক পানি লাগা অবস্থা কিছুটা সহ্য করতে পারে। পানির কাছে গাছ লাগানো যায়।

৩. **ভৌগোলিক বিতরণ :** মূল উৎস সম্ভবত মেক্সিকো, কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলা।

৪. **ব্যবহার :** ফল খাওয়া যায়। গাছের বাকল ভেষজ কাজে ব্যবহৃত হয়। গাছের কষ দিয়ে চিউয়িং গাম তৈরি করা যায়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বসতবাড়িতে জন্মানো যায়। খুলনা ও সাতক্ষীরা এলাকায় বেশি জন্মে। গাছ ও শিকড় ছাঁটাই করে এর আশেপাশে অন্যান্য গাছ আন্তঃফসল হিসেবে লাগানো যায়।

বৃক্ষের নাম : বেল

বৈজ্ঞানিক নাম : *Aegle marmelos*

গোত্র : Rutaceae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতি — পাতাঝরা

গাছের আকার — মধ্যম

কাণ্ড ও শাখা — মধ্যম সোজা, কাঁটা আছে

পাতা — একান্তর, সাধারণত ত্রি-পত্রিক উপপত্র, ৩ থেকে ৫ সে.মি. লম্বা

ফুল — সবুজাভ সাদা

ফল — শক্ত ত্বক, মিষ্টি সুগন্ধি

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — এপ্রিল থেকে মে

ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — ৮ থেকে ১০ মাস

বংশবিস্তার মাধ্যম — বীজ।

২. **অভিযোজিতা :** বন্য আকারে বেল গাছ পাতাঝরা বনে জন্মাতে দেখা যায়। বেল গাছ বেশ খরা প্রতিরোধক।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** দক্ষিণ এশিয়ার — ঝিলাম থেকে আসাম পর্যন্ত শুষ্ক এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** ফল বিক্রি করে আয় হয়। সবুজ ফল আমাশয় ও ডায়রিয়া রোগের উপশম করে। কাঠ শক্ত, কৃষি যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র তৈরি করা যায়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** সারা দেশেই বসতবাড়িতে জন্মাতে দেখা যায়।

বৃক্ষের নাম : তাল

বৈজ্ঞানিক নাম : *Borassus flabellifer*

গোত্র : Palmae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — একক কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ

কাণ্ড — গাঢ় বর্ণ, খাঁজ আছে

পাতা — বড়,পাখার মতো, উজ্জ্বল ধূসর সবুজ বোটা খুব শক্ত

ফুল — পুরুষ ফুল ছোট স্ত্রী ফুল বড় ২.৫ সে.মি. ব্যাস (dia)

ফল — ড্রুপ

ফুল আসার সময় — মার্চ থেকে এপ্রিল

ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — জুলাই থেকে আগস্ট।

২. **অভিযোজিতা :** অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। সাময়িক প্লাবন সহ্য করতে পারে।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** উষ্ণ আফ্রিকার গাছ। ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশে জন্মে।

৪. **ব্যবহার :** তাল খাওয়া যায়। তালের রস দিয়ে তৈরি গুড় খাওয়া হয়। কাণ্ডের কাঠ খুব শক্ত বলে তা ঘরবাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। পাতা বেড়া চাল ও কারুকার্যে ব্যবহৃত হয়। বর্জ্য অংশ ও উত্তম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বসতবাড়ি, রাস্তা পার্শ্ব, জল, স্থল ও ফসল মাঠে প্রায় সারাদেশেই জন্মে। তবে ঢাকা, গাজীপুর, ফরিদপুর ও বরিশালে বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

বৃক্ষের নাম	:	**নিম**	**বৃক্ষের নাম**	:	**ঘোড়া নিম**
বৈজ্ঞানিক নাম	:	*Azadirachta indica*	বৈজ্ঞানিক নাম	:	*Melia azedarach*
গোত্র	:	Meliaceae	গোত্র	:	Meliaceae

১. **সিলভান-বৈশিষ্ট্য**

আকার — মধ্যম থেকে বড় আকারের গাছ

কাণ্ড — খসখসে, মধ্যম সোজা

বাকল — ফাটল আছে, বর্ণ কালচে বাদামি

পাতা — ২২ থেকে ৪০ সে.মি. , শাখার মাথায় পাতা গুচ্ছিত উপপত্রের সংখ্যা ৯ থেকে ১৫টি।

ফুল — সাদা, অক্ষীয়

ফল — ড্রুপ গোলাকার, একবীজ সম্পন্ন। বর্ণ সবুজ, পাকা ফল হলদে।

ফুল আসার সময় — মার্চ থেকে এপ্রিল

ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — জুলাই থেকে আগস্ট

বংশবিস্তার — বীজ।

২. **অভিযোজিতা :** অধিকাংশ মাটিতেই জন্মে। তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। খরা সহনশীলতা মধ্যম।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** মূল উৎস সম্ভবত মায়ানমার, তবে ভারত ও বাংলাদেশসহ উষ্ণ-মণ্ডলীয় অনেক দেশে জন্মে।

৪. **ব্যবহার :** ব্যবহার আসবাবপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি ও খেলনা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাতা, বীজ ও নিম তেলের ব্যাপক ভেষজ ব্যবহার রয়েছে। বাকল টেনিন শিল্পে ব্যবহার করা হয়। নিমের ডাল দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বৃক্ষের নাম	:	**অর্জুন**	**বৃক্ষের নাম**	:	**অশোক**
বৈজ্ঞানিক নাম	:	*Terminalia arjuna*	বৈজ্ঞানিক নাম	:	*Saraca asica*
গোত্র	:	Combretaceae	গোত্র	:	Leguminosae

অশোক ও অর্জুন-তুলনামূলক বিবরণ

বৈশিষ্ট্য	গাছ	
	অশোক	অর্জুন
গাছের আকার	মধ্যম	মধ্যম থেকে বড়
বাকল	গাঢ় বাদামি, খসখসে	পুরু, মসৃণ, ধূসর–সাদা চল্টা উঠে
পাতা	১০ থেকে ১২ সে.মি. লম্বা	সরল, ৮–১১ × ৪–৬ সে.মি
উপপত্র	৩ থেকে ৫ জোড়া ৭–২৫ × ২.৫–৬.০ সে.মি.	
ফুল	কমলা রঙ ২.৫থেকে ৪ সে.মি. লম্বা	হলদে
ফল		২.৫থেকে ৩.৫ সে.মি. লম্বা
ফুল আসার সময়	ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল	এপ্রিল থেকে মে
ফল পরিপক্ব হওয়ার সময়	মে থেকে সেপ্টেম্বর	ফেব্রুয়ারি থেকে মে
বংশবিস্তার	বীজ	বীজ ও স্টাম্প
ব্যবহার	কাঠ নরম–পাতা গো–খাদ্য পাতা ও বাকল ভেষজ	গাড়ি ও কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কাঠ, বাকলের ভেষজ মূল্য বেশি

ত্রিফলা গাছসমূহ

ত্রিফলা গাছের মধ্যে তিনটি গাছ রয়েছে, যেমন—

১. অর্জুন — *Terminalia arjuna,* গোত্র : Combretaceae

২. বহেরা — *T. bellirica,* গোত্র : Combretaceac

৩. হরিতকি — *T. chebula,* গোত্র : Combretaceac আরও রয়েছে,

৪. কাঠ বাদাম — *T. catappa,* গোত্র : Combretaceae

এসব গাছের সিলভান বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য তুলনামূলক গুণাবলী সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

বৈশিষ্ট্য	গাছের নাম			
গাছের নাম	অর্জুন	বহেরা	হরিতকি	কাঠবাদাম
গাছের আকার	মধ্যম থেকে বড়	বড়	মধ্যম	লম্বা
বাকল	পুরু, মসৃণ, ধূসর, সাদা	খসখসে	খসখসে	

পাতা	সরল, ৮ থেকে ১১ × ৪ থেকে ৬ সে.মি.	সরল, ৮ থেকে ২০ × ৫ থেকে ১০ সে. মি. বোঁটা লম্বা	সরল, ৭ থেকে ১৮ × ৫ থেকে ৯ বোঁটা খাটো	১৫ থেকে ২৫ × ৮ থেকে ১৫ সে.মি.
ফুল	হলদে	সাইম মঞ্জরী	ছোট, ৫–১৩ সে.মি. স্পাইক	সাদা অক্ষীয় একক
ফল	২.৫ থেকে ৩.৫ সে.মি. ৫টি পাখা আছে	ড্রুপ, ২ থেকে ৩ সে.মি. মখমলের মতো	ড্রুপ, ২.৫ থেকে ৫ সে.মি. ৫টি শিরাযুক্ত	ড্রুপ, ৫ সে.মি. চ্যাপ্টা
ফুল উৎপাদন	এপ্রিল থেকে মে	ডিসেম্বর থেকে মার্চ	এপ্রিল থেকে আগস্ট	মার্চ থেকে এপ্রিল
ফল উৎপাদন	ফেব্রুয়ারি থেকে মে	জুলাই থেকে অক্টোবর	নভেম্বর থেকে মার্চ	মে থেকে আগস্ট
অভিযোজন	অনেক মাটিতে জন্মে	অনেক মাটিতে জন্মে, আলোর চাহিদা বেশি	প্রাকৃতিক বল	অনেক মাটিতে জন্মে, আলোর চাহিদা বেশি
পানিবদ্ধতা	মধ্যম সহনশীল	মধ্যম সহনশীল	উঁচু জমি	মধ্যম সহনশীল
উৎস	ভারত, শ্রীলংকা	ভারত, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া	ভারত থেকে থাইল্যান্ড পর্যন্ত	আন্দামান ও মালয়েশিয়া
বংশবিস্তার	বীজ ও স্টাম্প	বীজ ও স্টাম্প	বীজ ও স্টাম্প	শাখা কর্তন
ব্যবহার	নির্মাণ, ভেষজ, রেশম চাষ	নির্মাণ ও ভেষজ গাড়ির দ্রব্যাদি	নির্মাণ ও ভেষজ	ফল–খাদ্য নির্মাণ ও ভেষজ

বৃক্ষের নাম : ছাতিম

বৈজ্ঞানিক নাম : *Alstonia scholaris*

গোত্র : Apocynaceae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — গাছ লম্বাটে, বড়

প্রকৃতি — চিরসবুজ

শাখা–প্রশাখা — মূলকাণ্ড চক্রাকারে (whorls) বিন্যস্ত

বাকল — ধূসর

পাতা — সরল ৪ থেকে ৭ টি, পত্র ফলক ৫–১৬ × ২–৫ সে.মি., প্রায় ডিম্বাকার (obovate)

ফুল — সাদা

ফল — সরু দ্বি–ফলিকল, ৬০ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা

ফুল আসার সময় — অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি
ফল পরিপক্ব সময় — নভেম্বর থেকে এপ্রিল
বংশবিস্তার মাধ্যম — বীজ
ছাঁটাই উপযোগিতা — ভাল।

২. **অভিযোজিতা :** নিচু জমি থেকে পাহাড়ি এলাকা পর্যন্ত মাটিতে জন্মে। সাময়িক পানিবদ্ধতা কিছুটা সহ্য করতে পারে।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** ভারত থেকে মালয়েশিয়া ও চীন পর্যন্ত জন্মাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** কাঠ প্রধানত দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। গাছের কষও বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকল খুব তিতা, এজন্য জ্বরের উপশমে এর রস খেতে দেওয়া হয়। ছাতিমের বাকলের রস হৃদরোগ, এজমা, আলসার, আমাশয় ও কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বন বাগান, রাস্তার পাশে পতিত জমি ও বসতবাড়িতে প্রায় সারা দেশেই জন্মে, তবে উপকূলীয় এলাকায় কম।

বাঁশের বৈশিষ্ট্য

বাঁশের নাম	সিলভান বৈশিষ্ট্য	অভিযোজিতা	বিস্তার	ব্যবহার	বাংলাদেশে উৎপাদন
বরাক বাঁশ *Bambusa bolcona*	উচ্চতা – ৩০ মি. ব্যাস – ৩ থেকে ১০ সে.মি.	দো–আঁশ মাটিসহ অনেক মাটি	ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ	খুঁটি, বেড়া, জ্বালানি	দেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলে বসতবাড়িতে জন্মে
কাঁটা বাঁশ *bambosa bombos*	উচ্চতা ৩০মি. ব্যাস – ২.৫ থেকে ৯ সে.মি. কঞ্চি–কাঁটাযুক্ত	অনেক ধরনের মাটি	ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ	খুঁটি ও নির্মাণ	দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি জন্মে
মাকলা বাঁশ *Bambusa nutaus*	উচ্চতা–২–মি. ব্যাস- ২.৫ থেকে ৮ সে.মি.	গভীর পলিমাটি	ভারত, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড	খুঁটি, ঝুড়ি, ধারি, মাছ ধরার সরঞ্জাম (বাঁইর)	সারা দেশেই জন্মে
তল্লা বাঁশ *Bambusa tulda*	উচ্চতা–১৫ মি. ব্যাস–২.৫ থেকে ৮ সে.মি. গোড়ায় কঞ্চি কম	আলগা পলিমাটি	ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার, থাইল্যান্ড	খুঁটি, মাছ ধরা ও কৃষি সরঞ্জাম ঝুড়ি	সারা দেশেই জন্মে
বাসনি বাঁশ *Bambusa vulgaris*	উচ্চতা–২০মি. ব্যাস–৩ থেকে ১০ সে.মি. গোড়ায়, কঞ্চি কম	অনেক মাটিতে জন্মে। পানির ধারে টিকে থাকতে পারে।	উষ্ণ মণ্ডলের সব জায়গায় জন্মাতে দেখা যায়	খুঁটি, ধারী প্রভৃতি তৈরি হয়	সারা দেশেই জন্মে

মরাল বাঁশ *Bambusa cacharensis*	উচ্চতা–২০মি. ব্যাস–৩ থেকে ১০ সে.মি. গোড়ায় কঞ্চি কম। কালচে সবুজ রোম আছে	দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে	ভারত, বাংলাদেশ	মূল্যবান সরঞ্জাম তৈরি হয়। ধারী, মাছ সরঞ্জাম ভাল হয়। হ্যান্ডিক্রাফট তৈরি হয়।	নেত্রকোণা সিলেট কুমিল্লায় বেশি জন্মে

বৃক্ষের প্রজাতিভিত্তিক বীজ নিস্কাশন ও শোধন

১। **অর্জুন :** বীজের ত্বক নরম করতে খড় ও গোবরসহ গর্তে ছড়িয়ে রাখতে হয় এবং পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। গর্তের উপর চাটাই বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে অঙ্কুর গজায়।

২। **আকাশমনি :** ফুটন্ত গরম পানিতে বীজসমূহ ১ থেকে ২ মিনিট রেখে তাৎক্ষণিকভাবে ঠাণ্ডা পানিতে স্থানান্তর করে ২৪ ঘন্টা ভিজাতে হয়।

৩। **আমলকি :** পাকা ফল গর্তে রেখে দিতে হয়। ৭ থেকে ১৫ দিন পর ভালভাবে ফল পচে গেলে পানিতে ধুয়ে বীজ আলাদা করে শুকাতে হয়।

৪। **আতা ও শরিফা :** পাকা ফল একত্রে স্তূপ করে রেখে পচানোর পর পানিতে ধুয়ে জীব আলাদা করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে ফুটন্ত পানিতে ১ থেকে ২ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা পানিতে ২৪ ঘন্টা রাখতে হয়।

৫। **আমড়া :** গর্ত করে স্তূপীকৃত অবস্থায় রেখে দিলে ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ফল উত্তমভাবে পচনের পর পানিতে ধুয়ে পরিস্কার করে সরাসরি বেড়ে অথবা পলিব্যাগে বীজের বোঁটা নিচের দিকে বপন করতে হয়।

৬। **ইপিল ইপিল :** শুকানো বীজ ফুটন্ত পানিতে ২ থেকে ৩ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা পানিতে ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা রাখতে হয়।

৭। **কদম:** পরিপক্ব ফল সংগ্রহের পর গর্তে স্তূপাকারে রেখে ঢেকে দিতে হয়। ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ফল পচে গেলে ফলসমূহ বালতির পানিতে উত্তমভাবে কচলাতে হয়। ভাসমান বীজসমূহ আলাদা করে কাপড় বা কাগজের উপর রেখে উত্তমভাবে শুকাতে হয়।

৮। **কেওড়া বীজ :** গাছ হতে পরিপক্ব বীজ সংগ্রহ করে স্তূপীকৃত করে খড়কুটা দিয়ে ভালভাবে জাগ দিতে হয়। ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে ফল পচে নরম হয়ে যায়। তখন পচা বীজসমূহ পায়ে বা হাতে উত্তমভাবে কচ্‌লাতে বা ফেকতে হয়।

৯। **কাজুবাদাম :** পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করে স্তূপ প্রণালীতে পচিয়ে ধুয়ে শক্ত বীজ সংগ্রহ করে শুকাতে হয়। বপনের পূর্বে ফুটন্ত গরম পানিতে ৩ থেকে ৪ মিনিট রেখে স্বাভাবিক পানিতে ৪৮ ঘন্টা রাখতে হয়।

১০। **কদবেল ও বেল :** পরিপক্ব কদবেল ও বেল আঘাত করে ফাটিয়ে কয়েকদিন রেখে দিলে ফলের ভিতরে নরম হবে। তখন নরম অংশ পানিতে নাড়াচাড়া করে বীজ ছেঁকে আলাদা করা হয়।

BARRDOS Library Dhaka

১১। **কড়ই, মালাকানা, মিনজিরি ও রাজকড়ই :** বীজ গরম পানিতে ১ থেকে ২ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা পানিতে ২৪ ঘন্টা রেখে পলিব্যাগে বপন করতে হবে। ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে বীজ গজাবে।

১২। **কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, বাবলা, রেইনট্রি ও খয়ের :** বীজ বপনের পূর্বে গরম পানিতে ২ থেকে ৩ মিনিট রেখে কুসুম কুসুম গরম পানিতে ২৪ ঘন্টা রাখলে অঙ্কুরোদগম ভাল হয়।

১৩। **বাতাবী লেবু, কাগজী লেবু ও কামলা :** পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করে বস্তায় ভরে ভিজা অবস্থায় ৩ থেকে ৪ দিন ঘরে রেখে দিলে ফলের ত্বক নরম হয়ে যায়।

১৪। **কুল ও খেজুর :** পরিপক্ক ফল স্তুপ করে ১ দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিলে পচে যায়।

১৫। **গর্জন, শাল ও তেলশুর :** এ ধরনের বীজের ভায়াবিলিটি গাছ থেকে পড়ার পর মাত্র ৪৮ ঘন্টা থেকে। এর মধ্যে পাখাসহ বীজটি পলিব্যাগে বা বেডে বোঁটা নিচের দিকে ও পাখা উপরের দিকে রেখে বপন করতে হয়।

১৬। **গামার ও পিটালী :** গাছের নিচ থেকে পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করে গর্তে রেখে পচাতে হয়। যখন ফল সম্পূর্ণ পচে যাবে তখন পানিতে কচলিয়ে বীজ আলাদা করতে হয়।

১৭। **বাইন, কাঁকড়া ও গেওয়া :** গাছ থেকে গড়া ফলে বীজ থাকে। ফলে থেকে বীজ আলাদা করার প্রয়োজন নেই। ঝরে পড়ার সাথে সাথে অঙ্কুরোদগম হয় ৭২ ঘন্টার মধ্যে।

১৮। **টুন ও চিকরাশি :** এদের বীজ খুবই পাতলা ও বাতাসে উড়ে যায়। তাই ফল গাছে ফেটে যাওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করে রাখতে হয়।

১৯। **লোহাকাঠ :** পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করে রোদে শুকালে ফল ফেটে বীজ বের হবে। বীজ শুকিয়ে গুদামজাত করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে গরম পানিতে পরিশোধন করে পলিব্যাগে বপন করতে হয়।

২০। **সিভিট :** গাছ থেকে পরিপক্ক বীজফল পড়ার সাথে সাথে সংগ্রহ করে পলিব্যাগে অথবা বেডে বপন করতে হয়। বীজের সজীবতা (viability) খুবই কম।

২১। **দেবদারু :** গাছ হতে সংগৃহীত ফল ২ থেকে ৩ দিন বস্তায় ভরে রাখলে পচে যায়। তখন পানি ভর্তি বালতিতে পচা ফল রেখে কচলানো হলে বীজ আলাদা হয়ে যায়।

২২। **ঢাকিজাম ও কালোজাম :** গাছ হতে বা গাছের নিচ হতে পাকা বীজ সরাসরি সংগ্রহ করে বস্তায় ভরে বা স্তূপীকৃত করে ৮ থেকে ৯ দিন রাখলে ফলের ত্বক পচে যাবে এবং বীজ বের হয়ে আসে।

২৩। **জলপাই :** গাছ হতে ডিসেম্বর মাসে পরিপক্ক বীজ সংগ্রহের পর বস্তায় বা গর্তে ৪ থেকে ৫ দিন রেখে দিলে ত্বক পচে যাবে। তখন হাতে কচলিয়ে পানিতে ধুয়ে বীজ আলাদা করা হয়।

২৪। **তাল :** আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে গাছ থেকে ঝরে পড়া ফল সংগ্রহ করে ৬ থেকে ৭ দিন স্তূপ করে রেখে দিতে হবে। তখন তালের খোসা সরিয়ে রসালো অংশ পানিতে কচলিয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

২৫। **দারুচিনি :** পরিপক্ক বীজ সংগ্রহের পর পানিতে ধুয়ে খোসা ছাড়ায়ে বীজ নিষ্কাশন করা হয়। বীজ সংরক্ষণ করা যায় না।

২৬। বর্তা : বড় গাছ থেকে পরিপক্ব ফল বা বীজ সংগ্রহ করে রোদে শুকাতে হবে। ফল ফেটে গেলে নাড়াচাড়া করলে বীজ বের হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে হালকা বীজ বাতাসে উড়ে না যায় শুকনা বীজ ৮ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত প্যাকেটে রাখা যায়। বীজ বপনের পূর্বে কোনো পরিশোধন করতে হয় না। ইউক্যালিপটাসের মতো বীজতলায় চারা উত্তোলন করা হয়। বীজ গজাতে ১৫ থেকে ২০ দিন সময় লাগে।

২৭। ডালিম : পরিপক্ব ফল হাতে কচলিয়ে বীজসমূহ রসমুক্ত করা হয়।

২৯। নিম : পরিপক্ব ফল গাছ থেকে পাড়ার সাথে সাথে সংগ্রহ করতে হয়। গোটা ফল বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ ৩ থেকে ৪ দিন রেখে ত্বক পচে যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি পলিব্যাগ বা বীজতলায় বপন করতে হয়।

৩০। পেঁপে : পাছপাকা বড় পেঁপে কেটে বীজ সংগ্রহ করা হয়। রসালো কালো বীজ ছাই বা ছালার বস্তার সাথে ঘসলে জলীয় অংশ চলে যায়।

৩১। বকাইন : ফল যখন পরিপক্ব হয় তখন বর্ণ হলুদ হয়। গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে কয়েকদিন স্তূপীকৃত অবস্থায় রেখে দিলে ফলের ত্বক যখন নরম হয় তখন পানিতে কচলিয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

৩২। বহেড়া ও হরিতকী : হালকা বাদামি বর্ণের পরিপক্ব ফল গাছ হতে সংগ্রহ করে কয়েকদিন স্তূপীকৃত করে রাখতে হয়। যখন ফলের উপরিভাগ পচে কালো হয়ে যাবে তখন সরাসরি পলিব্যাগ অথবা বেডে বপন করতে হয়।

৩৩। মেহগনি : গাছে যখন প্রথম দু' একটি ফল ফাকা শুরু হয় তখন ফল সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত ফল রোদে শুকালে ফলের ত্বক ফেটে যায় এবং বীজপত্র আলাদা হয়ে যায়।

৩৪। মহুয়া : মহুয়ার গোটা ফলই বীজ। গাছ থেকে পরিপক্ব ফল (বীজ) সংগ্রহ করে স্তূপীকৃত করে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হয়। ফল পচে গেলে হাতে বীজ বের করে নিতে হয়।

৩৫। অশোক : কালো খয়েরি রঙের পরিপক্ব বীজ (ফল) জুন থেকে জুলাই মাসে গাছ থেকে পড়ার সাথে সাথে সংগ্রহ করতে হয়।

৩৬। বকুল : সংগৃহীত ফল বস্তায় ৪ থেকে ৫ দিন রেখে দিলে ফলের ত্বক পচে যায়। তখন হাত দিয়ে ঘসে পানিতে ধুয়ে বীজ পৃথক করা হয়। বীজ ১ থেকে ২ দিন রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধক পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। বীজ বপনের পূর্বে ১২ ঘন্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে করতে হয়।

বীজ বপন

বীজ বপনের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয় জানা থাকা দরকার– যাতে চারা উত্তোলনে কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(১) বীজ ভাল কি মন্দ তা পরীক্ষা করা, (২) বীজ অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার পরীক্ষা করা, (৩) বীজের পরিমাণ নির্ণয়, (৪) কত উচ্চতার চারা বাগানে রোপণের জন্য উপযুক্ততা নির্ধারণ করা।

বীজতলায় সারি করে অথবা ছিটিয়ে বীজ বোনা যেতে পারে। ছিটিয়ে বুনতে হলে উপরের কিছু মাটি (১.০ থেকে ১.৫ সেঃ মিঃ) সরিয়ে নিয়ে বোনার পর সে মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়।

সারিতে বুনলে নির্দিষ্ট দূরত্বে খাদ করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বীজতলায় মাটি শুকনা হলে তা ভাল করে ভিজিয়ে দিয়ে আংশিক শুকানোর পর বীজ বপন করতে হয়। শুকনা মাটিতে বীজ বুনে ভারি সেচ দিলে উপরে উঠে।

বীজ ভিজিয়ে রাখার সময়

১। পেঁয়াজ, মরিচ, পুঁইশাক, বেগুন, কলমি শাক, গাজর, পেয়ারা	ঠাণ্ডা পানিতে ২৪ ঘন্টা।
২। শশা, পেঁপে, তরমুজ, ফুটি	ঠাণ্ডা পানিতে ১২ ঘন্টা।
৩। লাউ, কুমড়া, করলা, পালং শাক	ঠাণ্ডা পানিতে ৪ থেকে ৬ ঘন্টা।
৪। নিম, রেইনট্রি, শাল, আকাশমনি, বাবলা, ইপিল ইপিল	ঠাণ্ডা পানিতে ১ ঘন্টা।
৫। গামার, মেহগনি, শীল কড়ই	ফুটন্ত পানিতে ২/৩ মিনিট

বীজ বপনের সময়

ক্রমিক নং সময় কাল	বীজের নাম	বপনের সময়
১।	আম, পেয়ারা, ডালিম, নারকেল, কাগজী লেবু	আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর
২।	কুল, সফেদা, কামরাঙ্গা, কাঁঠাল, শরীফা, তেঁতুল, আদা, খেজুর, ইপিল ইপিল	এপ্রিল থেকে মে
৩।	জলপাই, কমলা, কদবেল, করমচা, সুপারি	ডিসেম্বর –জানুয়ারি
৪।	মরিচ, বেল, বাবলা, কড়ই, হরিতকী, অর্জুন, সেগুন, মেহগনি, শিশু	এপ্রিল–মে
৫।	আমড়া, পেঁপে	অক্টোবর–নভেম্বর
৬।	বাতাবী, পেঁপে	নভেম্বর
৭।	আমলকি	মার্চ
৮।	কালোজাম, লটকন	জুন

বীজ সংগ্রহ ও বপনের সময়, অঙ্কুরোদগম কাল, বীজ হার ও কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা

প্রজাতির নাম	বীজ সংগ্রহের বা অঙ্কুরোদগমের সময়	বপনের সময়	অঙ্কুরোদগম সময়	প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা
অর্জুন	ডিসেম্বর–মার্চ	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	৭–২০ দিন	১০০

আকাশমনি	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	মার্চ-এপ্রিল	৭-১৫ দিন	৩৮,০০০-৪২০০
আমলকি	নভেম্বর-ডিসেম্বর	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	১০-২০ দিন	৪০,০০০
আম	জুন-আগস্ট	জুন-আগস্ট	১৫-২০ দিন	--
অড়হর	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	এপ্রিল-মে	৭-১০ দিন	৯০০০
আতা	এপ্রিল-মে	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	৭-১০ দিন	৭০০০
অশোক	মার্চ-এপ্রিল	জুন-জুলাই	৭-১৫ দিন	৫০-৬০
আমড়া	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	সেপ্টেম্বর-অক্টোম্বর	৩০-৪৫ দিন	১০০-১৩০
কেমালডুলেনসিস	মার্চ-এপ্রিল	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল	৪-১০ দিন	৭,৩০,০০০
ইপিলইপিল	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	৭-১৫ দিন	২২,০০০
উরিআম	মে-জুন	জুন-জুলাই	--	--
কালা কড়ই	জানুয়ারি-মার্চ	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল	৫-১৫ দিন	৮,০০০-১৩,০০০
কদম	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	এপ্রিল-মে	৫-১৫ দিন	৯,১৮,০০০
কাগজী লেবু	জুলাই-আগস্ট	জুলাই-আগস্ট	৭-২০ দিন	১৪,০০০
কাঞ্চন	এপ্রিল-মে	এপ্রিল-মে	৭-১০ দিন	৪,০০০-৫,০০০
কাউ	এপ্রিল- জুন	এপ্রিল- জুন	--	--
কেওড়া	জুলাই-আগস্ট	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	৪-৭ দিন	২২,০০০-২৫,০০০
কামিনী	এপ্রিল-মে	এপ্রিল-মে	৭-১৫ দিন	১৪,৬০০
কাজুবাদাম	এপ্রিল-মে	মার্চ-এপ্রিল	১০-১৫ দিন	২০০০-২২০০
করমচা	জুলাই-আগস্ট	জুলাই-আগস্ট	৭-১৫ দিন	--
কৃষ্ণচূড়া	নভেম্বর-ডিসেম্বর	ফেব্রুয়ারি মার্চ	৭-১০ দিন	১,৭০০
কদবেল	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	৭-১৫ দিন	--
কমলা	মে-জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	৭-২০ দিন	১৪,৬০০
কাঁঠাল	মে-জুন	মে-জুন	৫-৭ দিন	২০০
কামরাঙ্গা	জুলাই-আগস্ট	জুন-জুলাই	৭-১২ দিন	-
কুল	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	মার্চ-এপ্রিল	২০-২৫ দিন	-

খয়ের	এপ্রিল–মে	এপ্রিল–মে	১০–২০ দিন	৪০,০০০
খেজুর	মে–জুন	জুলাই–আগস্ট	৩০–৪৫ দিন	৪৮০
কাইনজল	ডিসেম্বর–জানুয়ারি	মার্চ–এপ্রিল	১০–২০ দিন	৯২,৪০০
গর্জন (ধলিয়া)	মে–জুন	মে–জুন	১০–২৫ দিন	১৩০–১৫০
গর্জন (তেলী)	মে–জুন	মে–জুন	১০–২৫ দিন	১৫০–১৭০
গোলাপজাম	এপ্রিল–মে	এপ্রিল–মে	১০–২৫ দিন	–
গাব	অক্টোবর–নভেম্বর	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	১০–২০ দিন	১৫০–২০০
গুলপাতা	এপ্রিল–মে	এপ্রিল–মে	১০–২৫ দিন	১০–১৫
গামারী	মে–জুন	মে–জুন	১০–২০দিন	১,৮০০
গেওয়া	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	আগস্ট–সেপ্টেবর	৫–১০ দিন	১৮০০–২০০০
চাপালিশ	জুন–জুলাই	জুন–জুলাই	৭–১৫ দিন	৭০০
চালতা	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	–	–	–
চাম্পাফুল	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	আগস্ট–অক্টোবর	১০–২০ দিন	১৫০০০–১৮,০০০
চিকরাশি	জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি	মার্চ–এপ্রিল	২০–২৫ দিন	৭০,০০০
ছাতিয়ানি	জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	১০–১৫ দিন	৬,০০,০০০
জলপাই	ডিসেম্বর–জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	২০–২৫ দিন	৪৮০–৮০০
জামরুল	ডিসেম্বর–মার্চ	এপ্রিল–মে	১০–২০ দিন	–
জাম্বুরা	সেপ্টেম্বর–অক্টোবর	অক্টোবর–মার্চ	১০–১৫ দিন	৩০০০–৩৫০০
জাম	জুন	জুন–জুলাই	৭–১৫ দিন	–
ঝাউ	মে–জুন	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	১৫–৩০দিন	৫,৬০,০০০–৬,৭০,০০০
তুঁত	মে–জুন	মে–জুন	১০–১৫ দিন	৪,২৮,০০০
তুন	এপ্রিল–মে	এপ্রিল–মে	১০–১৫ দিন	৩,৫২,০০০
ডালিম	জুলাই–আগস্ট	মার্চ–এপ্রিল	৭–১৫ দিন	–
ডেউয়া	মে–জুন	জুন–জুলাই	৭–১৫ দিন	১০০০–১২০০
ঢাকিজাম	মে–জুন	জুন–জুলাই	৭–১৫ দিন	১২০০–১৩০০
বেল	মার্চ–এপ্রিল	মার্চ–এপ্রিল	৭–১৫ দিন	৭৮০০

মিনজিরি	মার্চ–এপ্রিল	মার্চ–এপ্রিল	৭–২০ দিন	৩৫,০০০–৩৭,০০০
মেহগনি	জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি	মার্চ–এপ্রিল	২০–৩০ দিন	১,৬০০–২,০০০
মানকানা	ডিসেম্বর–জানুয়ারি	মার্চ–এপ্রিল	১৫–২০ দিন	৪২,০০০
ম্যানজিয়াম	ফেব্রুয়ারি–এপ্রিল	মার্চ–এপ্রিল	৭–১৫ দিন	৮০,০০০–১১০,০০০
মান্দার	মে–জুলাই	–	–	–
মহুয়া	জুন–জুলাই	জুন–জুলাই	১০–১৫ দিন	–
মুর্তা	জুলাই–সেপ্টেম্বর	–	–	–
রাধাচূড়া	নভেম্বর–ডিসেম্বর	ফেব্রুয়ারি	১০–২০ দিন	–
রক্তন	জুলাই–আগস্ট	–	–	–
রেইনট্রি	মে–জুন	মার্চ–মে	৫–১০ দিন	৪,৪০০–৭৭০০
রাবার	জুলাই–সেপ্টেম্বর	–	–	–
বাজকড়াই	মে–জুন	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	৭–১৫ দিন	–
লোহাকাঠ	ডিসেম্বর–জানুয়ারি	মার্চ–এপ্রিল	৭–২০ দিন	৫,০০০–৫,৪০০০
লেবু	জুলাই–আগস্ট	অক্টোবর–নভেম্বর	৭–২০ দিন	–
শাল	জুন–জুলাই	জুন–জুলাই	৪–১০ দিন	১,৬০০–২,০০০
শিল কড়ই	জানুয়ারি–এপ্রিল	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	৫–১৫ দিন	২২,০০০
শিশু	অক্টোবর–ফেব্রুয়ারি	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	১৫–২০ দিন	৫৩,০০০
শিমূল	মার্চ–এপ্রিল	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	১৫–২০ দিন	২৬,০০০–২৭,০০০
শেফালী	মার্চ	মার্চ	৫–১৫ দিন	১,২০০০
সোনালু	নভেম্বর–মার্চ	মার্চ–এপ্রিল	২০–৩০ দিন	৬০০০–৭০০০
সেগুন	নভেম্বর–ডিসেম্বর	মার্চ–মে	১০–৩০ দিন	১,৫০০–২,০০০
সিভিট	মে	মে–জুন	–	১৫০
সজিনা	এপ্রিল–মে	মে–জুন	–	–

সরিফা	অক্টোবর–ডিসেম্বর	ফেব্রুয়ারি	১০–১৫ দিন	–
সুপারি	অক্টোবর–ডিসেম্বর	নভেম্বর–ডিসেম্বর	৪৫–৯০ দিন	–
সুন্দরী	জুন–জুলাই	জুন–জুলাই	১০–২৫ দিন	৭০–৮০
হরিতকী	নভেম্বর–ডিসেম্বর	ফেব্রুয়ারি	১০–২০ দিন	১৪১–২২০
হলদু	ডিসেম্বর–মার্চ	মার্চ	–	৫০
হিজল	জুলাই–আগস্ট	জুলাই–আগস্ট	–	–
তরুল	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	১০–২০ দিন	
তাল	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	–	–
তেজপাতা	জুলাই–আগস্ট	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	১৫–২০ দিন	–
তেলশুর	মে–জুন	মে–জুন	৮–১০ দিন	২৫০–২৭৫
তেঁতুল	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	মার্চ–এপ্রিল	১০–১৫ দিন	৮০০–১,০০০
থুজা	জুলাই–আগস্ট	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	১৫–২০ দিন	–
দেবদারু	জুলাই–আগস্ট	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	৭–১৫ দিন	–
নাগেশ্বর	অক্টোবর–নভেম্বর	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	১০–২০ দিন	৩০০ বড়, ১,০০০ ছোট
নিম	জুন–জুলাই	জুন–জুলাই	৭–১০ দিন	৩,৩০০–৩,৫০০
নারকেল	জুলাই–আগস্ট	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	৩০–৮০ দিন	–
পাইন	–	মার্চ–এপ্রিল	–	৬,০০০–৮,০০০
পেঁপে	ডিসেম্বর–জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	৭–১৫ দিন	–
পলাশ	এপ্রিল	এপ্রিল	১০–২০ দিন	৪,২০০
পেয়ারা	জুলাই–আগস্ট	সেপ্টেম্বর–ফেব্রুয়ারি	১৫–২৫ দিন	৯,৫০০ দিন
পিটালী	জুলাই–সেপ্টেম্বর	জুলাই–সেপ্টেম্বর	১০–২০ দিন	৫,৩০০
পিতরাজ	মার্চ–এপ্রিল	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	২০–২৫ দিন	৫০০–৬০০
বকাইন	নভেম্বর–ডিসেম্বর	জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি	১০–৩০ দিন	৭০০–৮০০
বকুল	নভেম্বর–ডিসেম্বর	ফেব্রুয়ারি	১৫–২০ দিন	১,৬০০–২,০০০

বটল ব্রাশ	নভেম্বর–ডিসেম্বর	ফেব্রুয়ারি	১০–১৫ দিন	১০–১৫ দিন
বকফুল	এপ্রিল	এপ্রিল	–	৬০,০০০
বেত (জালি)	এপ্রিল–মে	এপ্রিল–মে	৭–১৫ দিন	–
বগামেডুলা	মার্চ–এপ্রিল	এপ্রিল–মে	৭–১৫ দিন	৫০,০০০
বরুন	জুলাই–আগস্ট	জুলাই–আগস্ট	–	–
বর্তা	জুন–জুলাই	জুন–জুলাই	৭–১০ দিন	–
বহেরা	নভেম্বর–ডিসেম্বর	ফেব্রুয়ারি	৭–১০ দিন	২০০–২৫০
বাবুল	মার্চ–মে	মার্চ–মে	১০–২০ দিন	৭,০০০–১১,০০০
বারিয়াল বাঁশ	জুলাই	জুলাই	–	৭৫,০০০–১০,০০০
বাইন	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	৪–৭ দিন	৩০০
বাইলাম	মে–জুন	মে–জুন	১০–১৫ দিন	৫৮০–৬৫০
বাতাবী	সেপ্টেম্বর–অক্টোবর	ফেব্রুয়ারি	৭–২০ দিন	–

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয় সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষ অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ বনজ গাছের বৈশিষ্ট্য

বৃক্ষের নাম : **জারুল**

বৈজ্ঞানিক নাম : *Lirgerstroemid speciosa*

গোত্র : Lithraceac

১. **সিলভান বৈশিষ্ট্য**

প্রকৃতি — পাতাঝরা

আকার — মধ্যম থেকে বড়

কাণ্ড — কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা, বাঁকা

বাকল — বর্ণ-হালকা সবুজ থেকে ময়লা বাদামি

পাতা — সরল, বিপরীত ১০-২০ × ৪-৮ সে.মি.

ফল — ক্যাপস্যুল ১.৫ থেকে ৩.০ লম্বা।

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — এপ্রিল থেকে জুন

ফল পরিপক্ব সময় — অক্টোবর থেকে জানুয়ারি

বংশবিস্তার মাধ্যম — বীজ ও স্টাম্প

ছাঁটাই — করা যায়।

২. **অভিযোজিতা :** স্বাদু পানির জলাশয়ের পাড়ে ও পলিমাটিতে জন্মাতে পারে। বসত-সীমানা এবং রাস্তা পার্শ্বে লাগানো যায়।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** ভারত, মায়নমার, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়া।

৪. **ব্যবহার :** কাঠ খুব শক্ত ও ভারী। নৌকা, লাঙলসহ অনেক নির্মাণ কাজ, যন্ত্রপাতি তৈরি ও খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** সারা দেশেই জন্মে। তবে মাঝারি উঁচু পলিমাটিতে বেশি জন্মে।

বৃক্ষের নাম : **কদম**

বৈজ্ঞানিক নাম : *Anthocephalus chinensis*

গোত্র : Rubiaceae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — বড় গাছ

প্রকৃতি — পাতাঝরা

কাণ্ড — সোজা গোলাকার কাণ্ড ও প্রায় সমান্তরাল শাখা-প্রশাখা

পাতা — ১২-২৫ × ৫-১০ সে.মি. ডিম্বাকার

ফুল — কমলা রঙ, গোল, গুচ্ছিত।

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — এপ্রিল থেকে জুলাই

ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় — জুন থেকে অক্টোবর

বংশবিস্তার মাধ্যম — বীজ

ছাঁটাই উপযোগিতা — ভাল।

২. **অভিযোজিতা :** ভিজা দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। আলোর চাহিদা বেশি।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** ভারত থেকে শুরু করে শ্রীলংকা, মায়ানমার, ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত জন্মে থাকে।

৪. **ব্যবহার :** উন্নতমানের চিকন আঁশযুক্ত নরম কাঠ। ম্যাচ শিল্প, খেলনা, কাঠামো, জুতার তলা ও হিল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** বসতবাড়িতে সচরাচর দেখা যায়। এছাড়াও পতিত জমি ও রাস্তা-বাঁধ পাশে লাগানো হয়ে থাকে।

বৃক্ষের নাম : শিমুল

বৈজ্ঞানিক নাম : *Bombax ceiba*

গোত্র : Bombacaceae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — গাছের আকার বড়

বর্ধনশীলতা — দ্রুত বর্ধনশীল

প্রকৃতি — পাতাঝরা গাছ

কাণ্ড — সোজা শিরাযুক্ত, শাখা-প্রশাখা বড় কাণ্ড কৌণিক কাঁটা রয়েছে।

পাতা — ডিজিটেট, বোঁটা ২০ থেকে ২৫ সে.মি. লম্বা

উপপত্র — ৫ থেকে ৭ টি আকার ১০ থেকে ১৫× ৪ থেকে ৫ সে.মি.

ফুল — লাল, একক বা গুচ্ছিত, প্রশাখার মাথায় ফোটে ফুলের ব্যাস ১০ থেকে ১২ সে.মি.

ফল — ক্যাপস্যুল ১০ থেকে ১৪সেমি লম্বা, শক্ত পাঁচ কৌণিক।

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — জানুয়ারি থেকে মার্চ.

ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় — এপ্রিল থেকে জুন

বংশবিস্তার — বীজ ও শাখা কর্তন কলম

ছাঁটাই — হালকা ছাঁটাই করা যেতে পারে।

২. **অভিযোজিতা :** অনেক ধরনের মাটিতে জন্মাতে পারে। সাময়িক পানিবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে।

৩. ভৌগোলিক বিস্তার : বাংলাদেশ, মায়নমার, শ্রীলংকা, ও ইন্দোনেশিয়া।

৪. ব্যবহার : তুলা দিয়ে লেপ, তোষক, বালিশ গদি তৈরি হয়। কাঠ, দিয়াশলাই শিল্প ও প্যাকিং বাক্সে ব্যবহৃত হয়। শিকড় ভেষজ দ্রব্য উৎপাদনের কাজে লাগে। পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৫. বাংলাদেশে উৎপাদন : সারা দেশেই জন্মে। তবে দেশের উত্তর অঞ্চলে বেশি জন্মে। রাস্তার পাশে, উঁচুজমি ও জলাভূমিতে বেশি জন্মে থাকে।

বৃক্ষের নাম : ঝাউ

বৈজ্ঞানিক নাম : *Casuarina equisetifolia*

গোত্র : Casuarinaceae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — বড় গাছ, ৫০ মিটার পর্যন্ত উঁচু
কাণ্ড — সোজা লম্বা
অনুশাখা — ১৫ থেকে ২০ সে.মি., সবুজ, খুবই সরু
পাতা — ছোট শল্কের (scale like) মতো প্রতি পর্বে ৬ থেকে ৮ টি
ফুল — স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল আলাদা।

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — নভেম্বর থেকে মার্চ
ফল পরিপক্ক সময় — ডিসেম্বর থেকে মার্চ
শিকড় — গভীর, নাইট্রোজেন সংযোজিত হয়
বংশবিস্তার মাধ্যম — বীজের মাধ্যমে হয়ে থাকে
ছাঁটাই — ব্যাপক ছাঁটাই করা যায়।

২. অভিযোজিতা : চুনযুক্ত মাটি ও লোনা মাটিতে জন্মে। বেলাভূমিতে ও ঝাউগাছ জন্মাতে দেখা যায়। এই খরা ও জলাবদ্ধতা উভয়ই সহ্য করতে পারে।

৩. ভৌগোলিক বিস্তার : এই গাছ অস্ট্রেলিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, মালে ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

৪. ব্যবহার : জ্বালানি হিসেবে খুবই ভাল। সার কাঠ আসবাবপত্র ও কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায়।

৫. বাংলাদেশে উৎপাদন : বাংলাদেশে উপকূলীয় চর, নদীর চর, রাস্তা বাঁধ পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

বৃক্ষের নাম : পিতরাজ

বৈজ্ঞানিক নাম : *Aphanamixis prdystachya*

গোত্র : Mewauac

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — বড় গাছ
প্রকৃতি — চির সবুজ

কেনোপি/ ক্রাউন– বড়

বাকল --- ধূসর

পাতা — শাখার প্রান্তে গুচ্ছিত

ফুল — অবৃন্তক, ময়লা সাদা

ফল — ক্যাপসুল ২.৫ থেকে ৪.০ সে.মি. লম্বা।

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — অক্টোবর থেকে নভেম্বর

ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ

বংশবিস্তার মাধ্যম — বীজ

ছাঁটাই/ ট্রেনিং --- ভালো সুযোগ রয়েছে।

২. অভিযোজিতা : নদীর পাড়, বসতবাড়ির হালকা ছায়ার পরিবেশ ও সাময়িক প্লাবিত জমিতে জন্মে থাকে।

৩. ভৌগোলিক বিস্তার : হিমালয় সংলগ্ন, ভারত, বাংলাদেশ, আসাম, মায়ানমার ও আন্দমানে জন্মাতে দেখা যায়

৪. ব্যবহার : নির্মাণ হালকা আসবাব পত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্লাইউডেও ব্যবহার করা যায়। বীজের তেল বাতরোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাকলের রস ও ভেষজ কাজে ব্যবহৃত হয়।

৫. বাংলাদেশে উৎপাদন : বসতবাড়ি ও পতিত জমিতে প্রায় সারা দেশেই জন্মে।

বৃক্ষের নাম : বরুন

বৈজ্ঞানিক নাম : *Crataeva magna*

গোত্র : Capparidaceae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — ছোট গাছ

কাণ্ড — মধ্যম সোজা

বাকল — কালচে ধূসর

পাতা — একান্তর, ত্রিপত্রিক

উপপত্র — ১৬ × ৩.৭ সে.মি.

ফুল — করিম্ব মঞ্জুরীতে সাদা – হলদে ফুল

ফল — বেরী, ৪ থেকে ৫ সে.মি., অনেক বীজ।

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — মার্চ থেকে এপ্রিল

ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর

বংশবিস্তার মাধ্যম — বীজ

ছাঁটাই --- করা যায়।

২. **অভিযোজিতা :** জলস্রোতের ধারে বা জলাশয়ের পরিবেশে জন্মাতে পারে। সাময়িক প্লাবনে টিকে থাকতে পারে।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ চীনে এ গাছ প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** কাঠ হালকা সরঞ্জাম ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গাছের পাতা ও বাকলের ভেষজ গুণাবলী রয়েছে।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** প্রায় সারা দেশেই মাঝারি নিচু ও নিচু এলাকায় এবং বসতবাড়ি সীমানা ও খালের পাড়ে জন্মাতে দেখা যায়।

প্রজাতির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

ইউক্যালিপটাসের অনেক প্রজাতি রয়েছে। এর নিচের ৫টি প্রজাতি খুব গুরুত্বপূর্ণ,

১. *Eucalyptus camaldulensis* — বাংলাদেশে খুব ভাল।
২. *E. brassiana* -- ভাল।
৩. *E. teriticornis* — ভাল।
৪. *E. citriodora* — মধ্যম-প্রথম চা বাগানে লাগানো হয়েছিল।
৫. *E. globulus* -- মধ্যম।

১. **সিলভান বৈশিষ্ট্য**

বর্ধনশীলতা — খুব দ্রুত
কাণ্ড — খাড়া, লম্বা, উঁচু
প্রকৃতি — চিরসবুজ
বাকল — ধূসর, সাদা, মসৃণ চল্টা উঠে
পাতা — সরল, একান্তর ৮–২৫ × ২–৮ সে.মি.
ফুল — ১ সে.মি. ব্যাস, অক্ষীয় আম্বেল মঞ্জুরী
ফল — ক্যাপস্যুল গচ্ছিত

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — আগস্ট থেকে অক্টোবর
ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর
বংশবিস্তার — বীজ, কোনো কোনো সময় শাখা কর্তন কলম।

২. **অভিযোজিতা :** অনেক মাটিতে জন্মে। খরা ও প্লাবন সাময়িকভাবে সহ্য করতে পারে।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** মূল উৎস অস্ট্রেলিয়া। বর্তমানে উষ্ণ ও অবউষ্ণ সব দেশেই জন্মাতে দেখা যায়।

৪. **ব্যবহার :** জ্বালানি, খুঁটি, প্যাকেজিং বাক্স, দিয়াশলাই শিল্পে পাতা থেকে তেল নিষ্কাশন।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** প্রায় সারা দেশেই জন্মে। এলিলোপেথিক (Allelopathic) প্রভাবের আশংকা বাংলাদেশে কম কৃষিবন হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

মেহগনির দুটি প্রজাতি

বৃক্ষের নাম	:	**বড় পাতাবিশিষ্ট মেহগনি**
বৈজ্ঞানিক নাম	:	*Swietenia macrophylla*
গোত্র	:	Mellaceae
বৃক্ষের নাম	:	**ছোট পাতাবিশিষ্ট মেহগনি**
বৈজ্ঞানিক নাম	:	*S. mahogoni,*
গোত্র	:	Mellaceae

১. সিলভান বৈশিষ্ট্য

আকার — বড় লম্বা গাছ, নিচে শাখা কম

প্রকৃতি — চিরসবুজ ঘন পল্লব

বাকল — খসখসে, ধূসর, বাদামি চল্টা উঠে।

পাতা — ৬০ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা

উপপত্র — ১০ থেকে ২০ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা

ফুল — সবুজাভ সাদা, ব্যাস প্রায় ১ সে.মি.

ফল — ক্যাপস্যুল ১৫ থেকে ৭ সে.মি.

চাষাবাদ

ফুল আসার সময় — মার্চ-এপ্রিল

ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় — ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি

বংশবিস্তার মাধ্যম-বীজ ।

২. **অভিযোজিতা :** অনেক মাটি ও জলবায়ুতে জন্মাতে পারে।

৩. **ভৌগোলিক বিস্তার :** মূল উৎস জ্যামাইকা ও মধ্য আমেরিকা। বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারতসহ, উষ্ণমণ্ডলীয় অনেক দেশেই জন্মাতে পারে।

৪. **ব্যবহার :** নির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৫. **বাংলাদেশে উৎপাদন :** প্রায় সারা দেশেই জন্মে। বন বাগান, রাস্তা ও বাঁধের পাশে ও জলস্থলে লাগানো হয়।

হিজল ও পানি হিজল

বৃক্ষের নাম	:	হিজল
বৈজ্ঞানিক নাম	:	*Brringtonia acutangula*
গোত্র	:	Lecythidaceae
বৃক্ষের নাম	:	**পানি হিজল**
বৈজ্ঞানিক নাম	:	*Salix tetrasperma*
গোত্র	:	Salicaceae

হিজল গাছ ও পানি হিজল গাছের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলো—

বৈশিষ্ট্য	গাছের নাম	
	হিজল	পানি হিজল
গাছের আকার	ছোট থেকে মধ্যম	মধ্যম
কাণ্ড	মধ্যম সোজা, খাটো	মধ্যম, সোজা
পাতা	সরল, একান্তর শাখার মাথায় গুচ্ছিত, মাথা ভোঁতা ডিম্বাকার	সরল, একান্তর
পাতার আকার	৭–১৫ × ৩–৮ সে.মি.	৪–১৫ × ১.৩ – ৩.০ সে.মি.
ফুল	লাল রেসিম, ১৪ থেকে ৪৫ সে.মি. লম্বা	হলদে ৫ থেকে ১২ সে.মি. লম্বা স্ত্রী–পুরুষ, আলাদা
ফল	বেরি ৩.৫ সে.মি. প্রায় চৌকাকার	ক্যাপস্যুল, ৩ থেকে ৪ মি.মি. লম্বা
ফুল আসার সময়	মার্চ থেকে জুন	নভেম্বর থেকে জানুয়ারি
ফল পরিপক্ব সময়	সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ
বংশবিস্তার মাধ্যম	বীজ	শাখা কলম ও গুটি কলম
অভিযোজিতা	জলাশয় ও স্রোতের পাশে জন্মে। পানিবদ্ধতা সহনশীল	জলাশয় ও স্রোতের পাশে জন্মে, ছায়া সহনশীলতা মধ্যম
ভৌগোলিক বিস্তার	ভারত, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, মায়ানমার, মালয়েশিয়া	ভারত, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া
ব্যবহার	কাঠ দ্বারা নৌকা ও আসবাবপত্র তৈরি হয়। পাতা গো–খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাকল, শিকড় ও পাতার ভেষজ ব্যবহার রয়েছে। জ্বালানি ও মাছের কাঠা হিসেবে ব্যাপক ব্যবহার হয়।	ম্যাচ বাক্স ও ফেন্সি কাজে কাঠ ব্যবহৃত হয়, খুঁটি ও লাঙল তৈরি করা যায়। পাতা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
বাংলাদেশে উৎপাদন	সারা দেশেই জন্মে, তবে হাওড়, বিল ও নিচু এলাকায় বেশি।	বসত ও নিচু জমিতে সারা বাংলাদেশেই জন্মানো যায়

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয় সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষ অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কৃষিবন নার্সারি প্রযুক্তি

নার্সারিতে চারা উৎপাদনের সুবিধা

নার্সারিতে চারা উৎপাদনের সুবিধাগুলো হচ্ছে—

১. **সহজে পরিচর্যা করা যায় :** চারা সঠিকভাবে পরিচর্যা করে সহজেই বড় করা যায়।

২. **উৎপাদন ব্যয় কম হয় :** নার্সারিতে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় চারা উৎপাদন করলে উৎপাদন ব্যয় কম হয়। এতে চারা বিক্রি করে অধিক লাভ পাওয়া যায়।

৩. **কাঙ্ক্ষিত জাতের চারা তৈরি :** নিজের প্রয়োজনের কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির ও জাতের চারা উৎপাদন করা যায়।

৪. **চারার মান উন্নত করা :** নার্সারিতে উৎপাদিত চারার মান উন্নত রাখা যায়।

৫. **নির্ধারিত বয়সের চারা প্রাপ্তি :** রোপণ স্থান ও রোপণ সময়ের সাথে সমন্বয় রেখে নির্ধারিত উচ্চতার বা বয়সের চারা তৈরি করা যায়।

৬. **সহজে চারা বিতরণ ও বিপণন করা যায় :** এক স্থানে উৎপাদিত হয় বলে এর বিতরণ ও বিপণন কাজ সহজে সমাধা করা যায়। যানবাহনের ব্যবস্থা করা যায়।

নার্সারিতে উৎপাদনযোগ্য রোপণ দ্রব্য (Planting material)

নার্সারিতে বহু ধরনের চারা বা রোপণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ; যেমন—

১. **বীজ চারা** (Seedling) : বীজ থেকে সরাসরি চারা উৎপাদন করা যায়। অনেক বীজ আছে (যেমন– নিম, হিজল) যেগুলো গাছ থেকে পাওয়া বা সংগ্রহ করার কয়েক দিনের মধ্যেই রোপণ করতে হয়। নতুবা এদের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে যায়। আবার অনেক বীজ আছে (অধিকাংশ গাছ) যেগুলো সংগ্রহ করার পর গুদামজাত করে তারপরে রোপণ করেও চারা তৈরি করা যায়।

২. **গাছের অঙ্গজ চারা :** গাছের অঙ্গজ অংশ থেকে বিভিন্ন ধরনের কলম তৈরি করা যায়। যেমন আম, লিচু, পেয়ারা।

৩. মোথা বা স্টাম্প (Stump) **চারা :** শিকড় ও গাছের কাণ্ডাংশ থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা সেগুন গাছের মোথা চারা ভাল হয়।

৪. **টিস্যু কালচার চারা :** গাছের অঙ্গজ অংশ থেকে কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে তৈরি চারাকে টিস্যু চারা বলে। গাছের টিস্যু চারা তৈরি একটি অতি আধুনিক পদ্ধতি। বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রসার ঘটছে।

৫. **প্রক্রিয়াকৃত চারা :** গাছের সকল ধরনের চারা মাটি থেকে তুলে রোপণের পূর্বে চারার গোড়া শিকড় গুটি বেঁধে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এতে চারা দূরবর্তী স্থানে পরিবহণের সময় অক্ষত থাকে। এই চারা রোপণের পর তা মাটিতে লেগে যায়। নার্সারিতে এ ধরনের প্রক্রিয়াকরণ চারার মৃত্যুহার কমায়।

নার্সারি পরিকল্পনা

কোনো নার্সারি স্থাপনের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে —

১. **স্থান নির্বাচন** (Selection of Site)

সফল নার্সারি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নার্সারি স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে —

* বর্ষাকালে পানি উঠে না বা পানি জমে থাকে না এমন উঁচু জায়গা।
* ভাল পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা।
* প্রচুর আলো বাতাসযুক্ত স্থান।
* সহজভাবে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে এমন জায়গা।
* সমতল ভূমি অথবা পাহাড়ের ঢালে টেরেস (Terrace) তৈরি করে নার্সারি স্থাপন করা যায় এমন জায়গা।

২. **নার্সারির জায়গার পরিমাণ নির্ধারণ**

নার্সারি জায়গার পরিমাণ নির্ধারণী বিষয়গুলো হচ্ছে —

* চারার ধরন : বীজ চারা, কলম, স্টাম্প।
* চারার বয়স : ছোট চারা, মধ্যম চারা, বড় চারা।
* চারার সংখ্যা : ঋতুভিত্তিক বা বার্ষিক উৎপাদিত চারার সংখ্যা।
* চারা উৎপাদন পদ্ধতি : বীজতলায় চারা, পলিব্যাগ চারা এখানে প্রদত্ত তথ্য থেকে চারার সংখ্যা অনুসারে নার্সারির প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

বীজ চারা বা স্টাম্প : প্রতি বর্গমিটারে

চারা থেকে চারার দূরত্ব	সারি থেকে সারির দূরত্ব	প্রতি বর্গমিটারে চারার সংখ্যা
৪ সে.মি.	৪ সে.মি.	৬২৫ টি
৪ সে.মি.	৫ সে.মি.	৫০০ টি
৫ সে.মি.	৫ সে.মি.	৪০০ টি
৫ সে.মি.	১০ সে.মি.	২০০ টি
১০ সে.মি.	১০ সে.মি.	১০০ টি
১০ সে.মি.	২০ সে.মি.	৫০ টি

পলিব্যাগ চারা : প্রতি বর্গমিটারে

পলিব্যাগের ব্যাস	প্রতি বর্গমিটারে পলিব্যাগের সংখ্যা
১০ সে.মি.	২২৫টি
১৫ সে.মি.	১০০ টি
২৫ সে.মি.	৩৬ টি

৩. **মাটি নির্বাচন**

নার্সারি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের পরই মাটি নির্বাচনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নার্সারির মাটি নিম্নরূপ হওয়া ভাল।

* মাটির বুনট : দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ।
* মাটির উর্বরতা : উর্বর মাটি
* কাঁকড়ের উপস্থিতি : মাটি কাঁকড়মুক্ত ও সমতল হওয়া।
* পানি নিকাশ ক্ষমতা : মাটির পানি নিকাশ ক্ষমতা থাকা।
* মাটির অম্লত্ব : মাটির বিক্রিয়া প্রশম বা নিরপেক্ষ হওয়া।
* মাটি তৈরিকরণ : প্রয়োজনবোধে অন্য স্থান থেকে ভিটি মাটি এনে নার্সারির মাটির সাথে মিশিয়ে নিতে হয়।
* মাটির জৈব পদার্থ : মাটিতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ থাকতে হয়।
* মাটির পরিশোধন : মাটির বিক্রিয়া অম্লীয় হলে সে মাটিতে চুন প্রয়োগ করতে হয়।

৪. **ভূমি উন্নয়ন**

নার্সারির ভূমি উন্নয়নের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

* আগাছা পরিষ্কার করা।
* জমি সমতল করা।
* কাঁকড় প্রভৃতি বাছাই করা।
* গাছের মোথা বা বড় পাতা অপসারণ করা।
* পাহাড়ি এলাকায় ধাপ বা টেরেস তৈরি করা জমিতে।
* জমিতে নিকাশ নালা তৈরি করা।
* জমিতে সেচ নালা ও রাস্তা তৈরি করা।
* আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলা বা জমা করে পচিয়ে কমপোস্ট তৈরি করা।

৫. বেড়া নির্মাণ

যে কোনো নার্সারির জন্য সীমানার রক্ষা -বেড়া নির্মাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নার্সারিতে নিম্নলিখিত উপায়ে বেড়া নির্মাণ করা যায়।

* বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া।
* ইটের দেওয়াল দেওয়া।
* পিলার দিয়ে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া।
* কাঁটা মেহেদি ও এজাতীয় গাছ দিয়ে জীবন্ত বেড়া দেওয়া।
* সীমানায় বাঁশ-বেত দিয়ে জীবন্ত বেড়া দেওয়া।

৬. **ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী**

নার্সারি স্থাপনের আনুষঙ্গিক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে –

* শ্রমিকের প্রাপ্তি ও ব্যবস্থাপনা।
* জমির মালিকানা : জমি নিজের হলেই ভাল।
* সরঞ্জাম সারণি তৈরি।
* কর্মচারী প্রশিক্ষণ।
* আয়-ব্যয় খসড়া তৈরি।
* বাজার জরিপ।

৭. **নার্সারি সজ্জিতকরণ ও নক্সাকরণ**

নার্সারি স্থাপনের জন্য এর নক্সাকরণ ও সজ্জিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নার্সারি সজ্জিতকরণ ও নক্সাকরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত চিত্রের সাহায্যে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যেতে পারে।

উল্লেখযোগ্য বিষয়—

* নার্সারি বীজতলার বিন্যাস।
* রাস্তা ও নালার অবস্থান।
* গৃহ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা।
* চারা উৎপাদনের স্থান নির্ধারণ।
* চারা প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের স্থান নির্বাচন।
* বীজ গাছ রোপণের স্থান নির্ধারণ।
* নার্সারিকে ব্লকে বিভক্তকরণ(চিত্র ১৩.১)।

নার্সারি বীজতলার পরিমাপ : প্রস্থ : ১২০ সে.মি.

দৈর্ঘ্য : ১ মিটার বা জায়গা প্রাপ্তি অনুসারে কম-বেশি হতে পারে।

দুই বীজতলার মাঝখানে ফাঁক : ৪৫ থেকে ৫০ সে. মি.।

প্রধান পরিদর্শন পথ : প্রস্থ : ৩ থেকে ৪ মিটার।

শাখা পরিদর্শন পথ : প্রস্থ : ১ থেকে ২ মিটার।

প্রধান ও শাখা নর্দমা : জমির ঢাল ও জায়গার পরিমাণ অনুসারে।

পুকুর ও নলকূপ : পানিসেচ চাহিদা অনুসারে।

অন্যান্য স্থান : কমপোস্ট তৈরির স্থান, ব্যাগ ভরার স্থান, ও শুষ্ক জায়গা

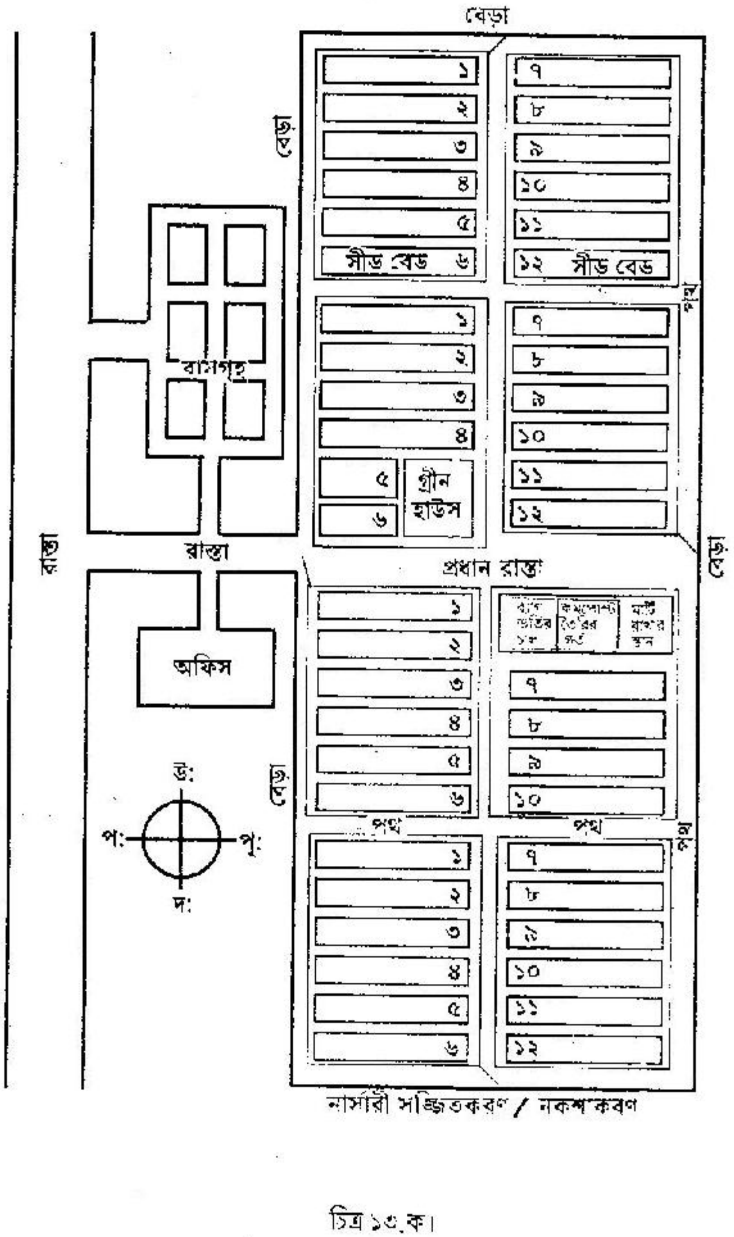

নার্সারী সজ্জিতকরণ / নকশাকরণ

চিত্র ১৩.ক।

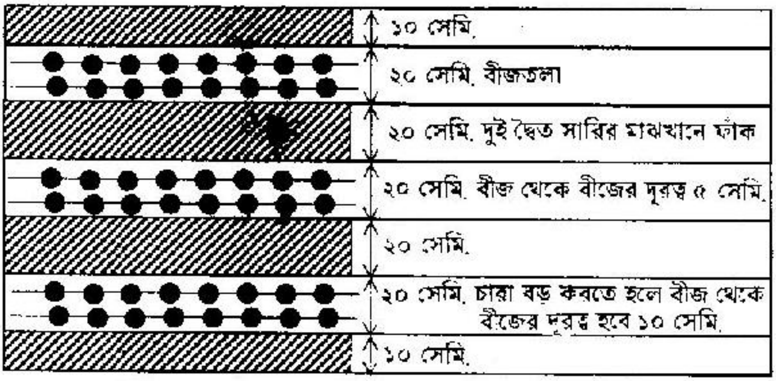

চিত্র ১৩.১ : বীজতলার নক্সা।

চারা উৎপাদন

নার্সারিতে চারা উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে রয়েছে –

১. **বীজ সংগ্রহ :** সবসময় উত্তম গাছ বা মা–বৃক্ষ (Mother tree) থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিৎ। একটি উত্তম বীজ বৃক্ষ বা মা-বৃক্ষের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যেমন—

* গাছটি সতেজ হয়।
* গাছ মধ্যম বয়সী হয়।
* শাখা-প্রশাখা নিয়ে গাছটির একটি সুন্দর কাঠামো থাকতে হয়।
* গাছটি নিরোগ ও পোকামুক্ত হতে হয়।
* গাছটি খোলামেলা জায়গার হতে হয়।
* গাছটি কাঙ্ক্ষিত জাতের হতে হয়।
* মা–বৃক্ষের আশেপাশে সেই প্রজাতির অনুন্নত জাতের গাছ থাকবে না।

২. **বীজ নিষ্কাশন :** রসালো ফলের বীজ সংগ্রহের জন্য ফল থেকে বীজ নিষ্কাশন করতে হয়। বীজ সংগ্রহের পরপরই রোদে শুকিয়ে নিতে হয়

৩. **বীজ শোধন :** বীজ সংগ্রহ করার পর তা রোপণের পূর্বে শোধন করে নিলে বীজ থেকে ভাল চারা পাওয়া যায়। বীজ শোধনের কয়েকটি পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করা হলো।

* **পানিতে ডুবানো :** বীজ পানিতে ডুবিয়ে ভাল বীজ বাছাই করা যায়। ভারি পুষ্ট বীজ পানিতে ডুবে থাকে।
* **পানিতে ভিজানো :** বীজ পানিতে ভিজিয়ে রেখে (১৪ থেকে ২৪ ঘন্টা) অঙ্কুরোদগম হার বাড়ানো যায়।
* **গরম পানিতে ভিজানো :** গরম পানিতে ভিজিয়ে (৪০^0 সে: তাপে ১ থেকে ৩ মিনিট) রাখলে বীজের অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়।

- স্তূপাকারে রাখা : অনেক গাছের বীজ (যেমন– সেগুন) চটের বস্তায় ভরে ২৪–৪৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে (১০থেকে ১৫ দিন) বীজ থেকে সহজেই অঙ্কুর বের হয়। গামার, অর্জুন, হরিতকি, বহেরা, খেজুর চাপালিশ প্রভৃতি বীজও এভাবে শোধন করা যায়।

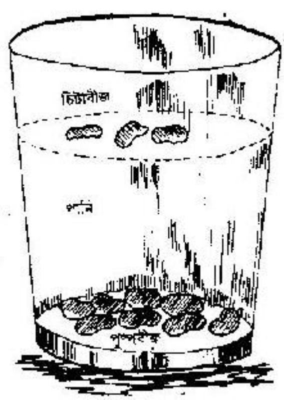

চিত্র ১৩.২ : বীজ শোধন : পানিতে ডুবানো।

এছাড়াও পিট পদ্ধতি, গবাদিকে খাওয়ানো এবং এসিড দ্রব্যে শোধন প্রক্রিয়ায় বীজের অঙ্কুরোদ্গম হার বাড়ানো যায়। বীজ যথাযথভাবে শোধন না করলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হার কমে যায়। এতে বীজের অপচয় হয়।

বৃক্ষের বিভিন্ন প্রজাতিভিত্তিক বীজ নিষ্কাশন ও পরিশোধন সম্পর্কে নিচে বর্ণনা কর হলো—

বীজ সংগ্রহের সময়

বনজ গাছ থেকে উপযুক্ত সময়ে বীজ সংগ্রহ না করলে উন্নতমানের বীজ পাওয়া যায় না। সেজন্য গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের সঠিক সময় জেনে নেওয়া দরকার। নিচে কতিপয় গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের সময় উল্লেখ করা হলো।

বীজ বপনের সময়

বনজ গাছের উন্নতমানের চারা তৈরি করতে হলে মাটিতে যথাসময়ে বীজ বপন করতে হয়। নিচে প্রধান প্রধান বনজ বীজের বপন সময় চিত্রে দেখানো হলো।

বনজ গাছের বীজের অঙ্কুরোদ্গম সময় নিচে উল্লেখ করা হলো—

গাছের নাম	অঙ্কুরোদ্গম সময়
গর্জন	১ থেকে ৩ দিন
ইপিল ইপিল, ইউক্যালিপটাস, শাল	৪ থেকে ১২ দিন
কদম, কাঁঠাল	৫ থেকে ১০ দিন
অর্জুন, আকাশমনি, চাপালিশ, নিম, মিনজিরি	৭ থেকে ২০ দিন

আমলকি, গামার, তেঁতুল, পলাশ, বাবুল, বহেরা, মন্দার, শিরীষ, সেগুন, হরিতকি	১২ থেকে ২৫ দিন
শিমুল, শিশু	১৫ থেকে ২৭ দিন
সোনাইল, সজনা, মেহগনি, খৈয়া বাবলা	২০ থেকে ৩০ দিন
খেজুর, ঝাউ	৩০ থেকে ৪৫ দিন

* বীজের শোধন ও মৃত্তিকা তাপের উপর নির্ভর করে অঙ্কুরোদগম সময়সীমার পার্থক্য হয়। বীজ প্রাক শোধন করলে এবং মৃত্তিকার উষ্ণতা বেশি থাকলে বীজের অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়।

৪। **বীজতলা তৈরি :** অনেক বনজ গাছের বীজ সরাসরি মাটিতে তৈরি বীজতলায় রোপণ করে চারা উৎপাদন করা হয়। যেমন— রেইনট্রি, ইপিল ইপিল, মেহগনি প্রভৃতি। বীজ রোপণের জন্য বীজতলা তৈরির কার্যাবলী নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. বীজতলার নক্সা তৈরি করে খুঁটি দেওয়া এবং বাঁশের চটা দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা (চিত্র ১৩.৩)।

২. খুঁটি বরাবর রশি ধরে দাগ দিয়ে বীজতলার আগাছা আবর্জনা অপসারণ করা।

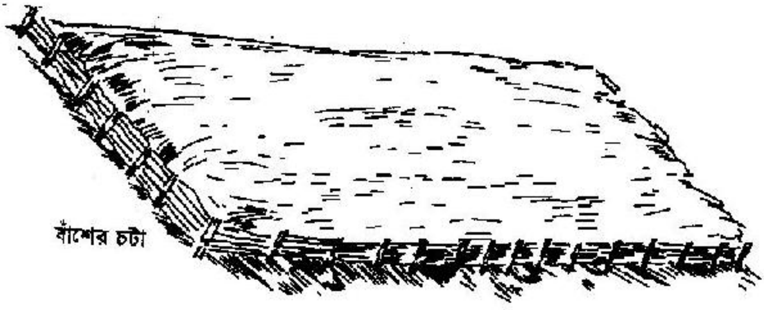

চিত্র ১৩.৩ : বাঁশের চটা দিয়ে বীজতলার সীমানা নির্ধারণ।

৩. বীজতলার মাটি কোদাল দিয়ে কোপানো (চিত্র ১৩.৪)।

৪. মাটির ঢেলা ভাঙা।

৫. আগাছা অপসারণ করা।

৬. জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা।

৭. বীজতলার উপরিভাগ সমতল করা এবং চারপাশ ইট বা বাঁশ দিয়ে বেঁধে দেয়া (চিত্র ১৩.৫)।

৮. বীজতলার পরিমাপ মতো সারি তৈরি করা।

বীজতলায় সার প্রয়োগ

উন্নতমানের চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলার মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের আগে বীজতলার মাটি ১৫ থেকে ২০ সে.মি গভীর করে ভালভাবে কুপিয়ে নিতে হয়। বীজতলায়

এঁটেল মাটি বেশি থাকলে সেখানে দো-আঁশ মাটি বা ভিটিমাটি মিশাতে হয়। বীজতলার আকার ১২ মিটার × ১.২ মিটার হলে সেখানে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

১. জৈব সার	--	২০০ কেজি	৩. টিএসপি	--	৪০০ গ্রাম
২. ইউরিয়া	--	১২০০ গ্রাম	৪. এমপি	--	৮০০ গ্রাম

চিত্র ১৩.৪ : বীজতলার মাটি কোপানো।

চিত্র ১৩.৫ : বীজতলার চারপাশে ইট বা বাঁশ দিয়ে বেঁধে দেয়া।

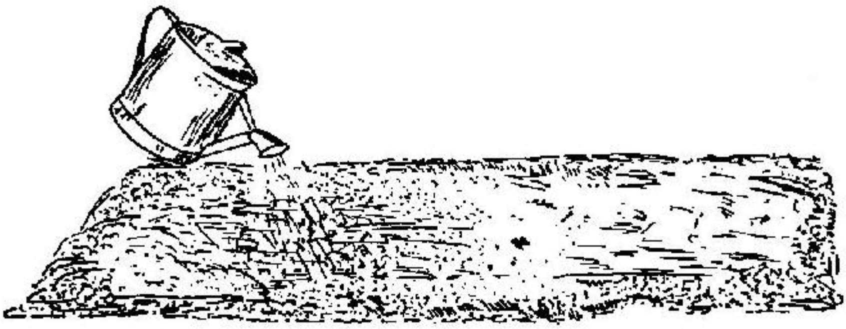

চিত্র ১৩.৬ : বীজতলায় হালকা পানি সেচ দেয়া।

চিত্র ১৩.৭ : নক্সা অনুযায়ী বীজতলায় বীজ বোনা।

সার বীজতলার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বীজতলা নালা থেকে ১০ থেকে ১৫ সে.মি. উঁচু করতে হয়। বীজতলার ধারগুলো বাঁশের চটা বা ইট বসিয়ে বেঁধে দিলে ভাল হয়। তারপর বীজতলায় পানি সেচ দিয়ে নক্সা মতো বীজ বুনতে হয় (চিত্র ১৩.৬ ও ১৩.৭)।

৫। **বীজ পরীক্ষা ও প্রত্যয়ন**

বাংলাদেশে বনজ বীজ পরীক্ষা ও প্রত্যয়নের সুযোগ-সুবিধা এখনো সৃষ্টি হয়নি, যেমন— মাঠ ফসলের বীজের ক্ষেত্রে রয়েছে।

বাংলাদেশে উন্নত মানের বীজ সংগ্রহের কাজটি বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Forest Research Institute, BFRI) করে থাকে। এজন্য BFRI এর ৫০ টি বনজ বাগান রয়েছে। সংগ্রহ করা বীজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের পূর্বে এর অঙ্কুরোদগম হার ও অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

অনেক গাছের বীজ বিশেষ করে বিদেশী গাছের বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। এসব বীজের আমদানি বিবরণীতে বীজ সংগ্রহের উৎস, তারিখ ও অন্যান্য বিবরণী লেখা থাকে। সাথে সাথে বীজের অঙ্কুরোদগম হার ও ফাইটোসেনিটারি সার্টিফিকেট থাকে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণত বিদেশী বীজ দেশে এনে জাহাজীকরণের পূর্বে উন্নত পদ্ধতিতে রোগ-বালাই মুক্ত করে ফাইটোসেনেটারি সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে বনজ বীজ পরীক্ষার কাজ এখনো সীমিত। তবে উন্নতমানের চারা তৈরির জন্য বীজ পরীক্ষা ও প্রত্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে।

৬। **পলিব্যাগের জন্য মাটি তৈরি**

পলিব্যাগ : পলিথিলিন শীট দ্বারা তৈরি পলিব্যাগ বিভিন্ন আকারের হতে পারে। পলিব্যাগের জন্য মাটি তৈরির কাজটি নিম্নলিখিত ধাপে উল্লেখ করা যায়

পলিব্যাগের আকার : উচ্চতা ১৫ সে.মি. × ব্যাস ১০ সে.মি. (৬" × ৪") ছোট।
১৫ সে.মি. × ১৫ সে.মি. (১০" × ৬") বড়।

প্রতিটি পলিব্যাগের এক প্রান্ত বন্ধ করা থাকে এবং অন্য প্রান্ত খোলা থাকে। পলিব্যাগের নিচে ও পাশে ৮থেকে ১২টি ছিদ্র করতে হয়। এই ছিদ্র দিয়ে পলিব্যাগের মাটিতে জমা হওয়া অতিরিক্ত পানি বের হয়ে আসে।

মাটি : পলিব্যাগে ভরাটের জন্য দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি উত্তম। পলিব্যাগে ভর্তি করার জন্য মাটি শুকিয়ে গুঁড়া করে চালনি দিয়ে চেলে নিতে হয় (চিত্র ১৩.৮)। পলিব্যাগের জন্য বনজঙ্গলের উপর স্তরের মাটি ভাল। এই মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকে। বনজ বা ঝোপ-ঝাড়ের মাটি না পাওয়া গেলে ভিটি মাটি দিয়ে ও পলিব্যাগ পূর্ণ করা যায়। এতে উন্নতমানের চারা তৈরি হয়।

মাটি শোধন : অতি ক্ষুদ্র আকারের বীজ বা স্পর্শকাতর বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য ব্যবহৃত ট্রে-তে মাটি শোধন করে নেওয়া ভাল। এতে ক্ষুদ্রাবস্থায় রোগ ক্রান্ত হয়ে মারা যায় না। তাপ দিয়ে বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে মাটি শোধন করা যায়। এজন্য আগুনের তাপ, গরম পানি এবং রাসায়নিক দ্রব্য হিসেবে ফরমালিন ব্যবহার করা যায়।

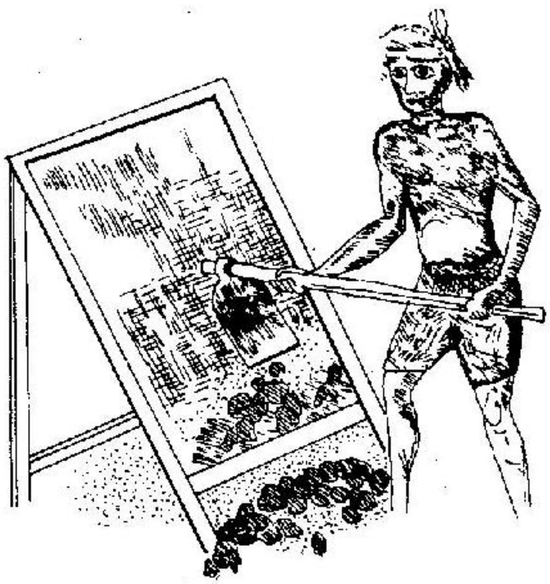

চিত্র ১৩.৮ : মাটির গুঁড়া চালনি দিয়ে চেলে নেওয়া।

মাটি তৈরি : পলিব্যাগ পূরণ করার জন্য সংগৃহীত মাটিতে জৈব সার বা কমপোস্ট মিশাতে হয়। জৈব রাসায়নিক সার প্রয়োগের হার নিচে দেওয়া হলো।

প্রতি ১০০ কেজি আধা–শুষ্ক গুঁড়া মাটিতে মাটির গুণাগুণ অনুসারে—

পচা জৈব সার	২০ থেকে ২৫ কেজি
ইউরিয়া	৫০০ থেকে ৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম
ছাই	২ থেকে ৩ কেজি

মাটিতে উপরোক্ত সার মিশিয়ে মিশ্রণটি ১৫ থেকে ২০ দিন ছায়ায় জাঁক দিয়ে রাখতে হয়। তারপর সম্পূর্ণ মাটি পুনরায় শুকিয়ে ও মিশিয়ে বস্তায় ভরে রেখে দেওয়া যায়।

পলিব্যাগের মাটি ভর্তিকরণ

মাটি ভর্তি করার আগে পরীক্ষা করে নিতে হয় যেন পলিব্যাগে ছেঁড়া–ফাটা না থাকে। তারপর পলিব্যাগে ছিদ্র করে নিতে হয়। পলিব্যাগটি ফুলিয়ে বাম হাতে ধরে ডান হাতে মাটি ভরতে হবে। পলিব্যাগ ভর্তি হলে ব্যাগের উপরিভাগ ২ হাতে ধরে ২ থেকে ৩ টি ঝাঁকুনি দিতে হয় এবং হাতে বাঁশের নল দিয়ে মাটি চেপে দিতে হয়। এরপর পলিব্যাগটি পুনরায় কানায় কানায় ভরতে হয়। এ অবস্থায় পলিব্যাগটি সোজা খাড়া থাকে। পলিব্যাগ পূর্ণভাবে না ভরলে তা বেঁকে যেতে পারে।

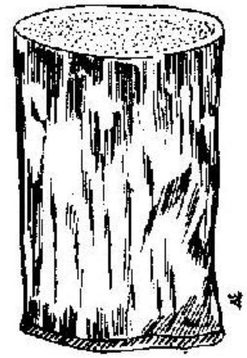

ক : ভুল পদ্ধতি খ. সঠিক পদ্ধতি

চিত্র ১৩.৯ : পলিব্যাগে মাটি ভর্তিকরণ।

পলিব্যাগ বীজতলায় সাজানো

মাটি ভর্তি করার পর পলিব্যাগ নির্ধারিত তৈরি করা বেডে বসাতে হয়। পলিব্যাগের বেড তৈরি করার সময় বেডের উপরিভাগ দুরমুজ করে সমান করে নিতে হয়। বেডের যে কোনো এক পাশ থেকে পলিব্যাগ বসাতে হয়। পলিব্যাগ বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হয় তা যেন আঁটসাঁটো হয়। পলিব্যাগ যেন বাঁকা না হয়ে যায়।

পলিব্যাগে বীজ বা চারা রোপণ

মাটি ভর্তি পলিব্যাগ একটি কাঠি দিয়ে ছিদ্র করে দুটি করে বীজ রোপণ করতে হয়। বীজের আকার বড় হলে তা মাটির ৪ থেকে ৫ সে.মি গভীরে এবং ছোট হলে ১ থেকে ৩ সে.মি গভীরে রোপণ করলেই চলে। কোনো কারণে পলিব্যাগের বীজ অঙ্কুরিত না হলে অঙ্কুরোদগম ট্রে-তে জন্মানো বীজ চারা এনে ও রোপণ করা যায়

অঙ্কুরোদগম ট্রে-তে বীজ বপন

বীজের আকার খুব ছোট হলে অঙ্কুরোদগম ট্রে-তে এর অঙ্কুর গজিয়ে নেওয়া যায়। প্রথমে ছিদ্রযুক্ত ট্রে-র তলায় ২ থেকে ৩ ভাজ খবরের কাগজ বা ছিদ্র যুক্ত পলিথিন শিট বা কাপড় বিছাতে হয়। এই স্তরের উপর সামান্য ইটের গুঁড়া বা পাথর চূর্ণ দিতে হয় তারপর শোধিত মাটির মিশ্রণ দিয়ে ট্রে ভর্তি করতে হয়। মাটি ভর্তি করার পর বিশুদ্ধ পানি ভর্তি পাত্রে ট্রেটি এমন ভাবে রাখতে হবে যেন ট্রে-র তলার ছিদ্র দিয়ে পানি শোষিত হয়ে ট্রে-র মাটি ভিজে যায়। এরপর দ্বিগুণ পরিমাণ ছাই মিশ্রিত বীজ সমভাবে ছিটিয়ে বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর ট্রে-র মাটি পুনরায় হালকাভাবে ভিজিয়ে দিতে হয়। এই ট্রে-তে চারা গজানোর পর সেই চারা পলিব্যাগে রোপণ করে উন্নতমানের চারা তৈরি করা যায়।

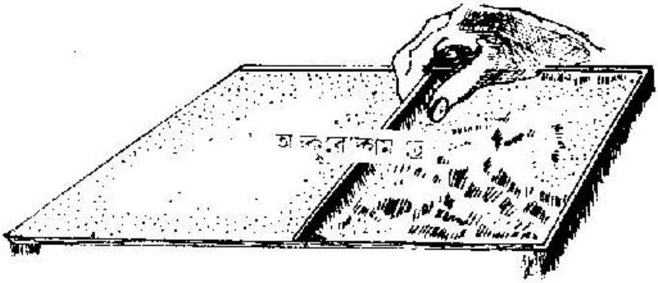

চিত্র ১৩.১০ : অঙ্কুরোদ্গম ট্রে।

পলিব্যাগে চারা ব্যবস্থাপনা

পলিব্যাগে জন্মানো চারার ক্ষেত্রে (এবং বীজতলায় জন্মানো চারার) নিম্নরূপ ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করতে হয়—

(১) ছায়া দান (Shed) : অনেক প্রজাতির বা জাতের বীজ থেকে উৎপাদিত চারা প্রত্যক্ষ রোদে তাপ সহ্য করতে পারে না। সেজন্য সদ্য অঙ্কুরিত চারাকে রোদের তাপ থেকে রক্ষার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়। সেগুন ও গামারের স্টাম্প চারার ছায়ার প্রয়োজন হয় না।

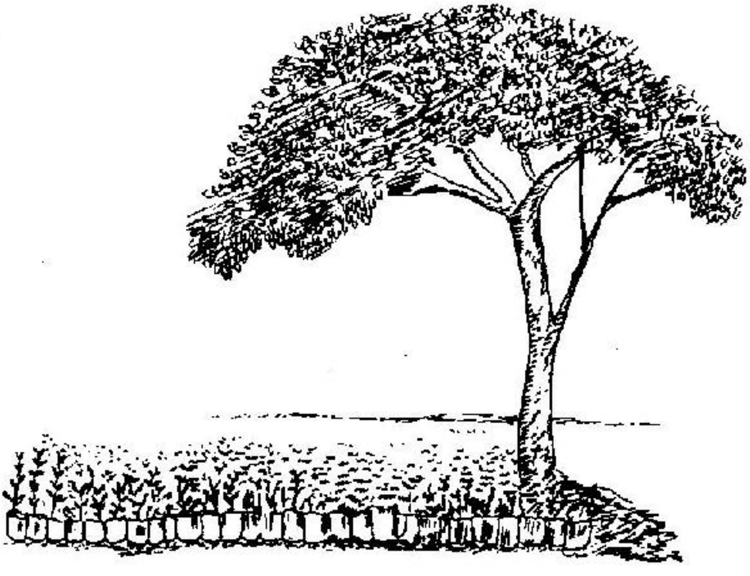

চিত্র ১৩.১১ : পলিব্যাগে জন্মানো চারায় ছায়া দান।

চারার উপরে বাঁশ ও চাটাই দ্বারা শেড তৈরি করা যায়। শেডের উচ্চতা মাটি থেকে ১ মিটার হওয়া দরকার। শেডের ফ্রেম তৈরির জন্য বাঁশ ছাড়াও কাঠ বা লোহার ফ্রেম তৈরি করা যায়। বীজতলা পূর্ব-পশ্চিম দিকে লম্বা হলে শেড দক্ষিণে কিছুটা হেলিয়ে স্থাপন করতে হয়, যাতে দুপুরের কড়া রোদ চারা গাছে না লাগে।

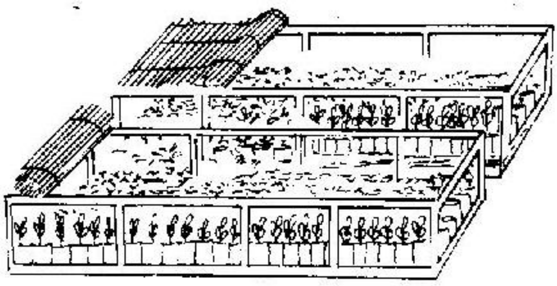

চিত্র ১৩.১২ : আধুনিক পলি চারা বীজতলা

(২) **মালচিং (Mulching) বা জাবড়া দেওয়া :** মাটির উপরিভাগ (বীজতলা বা পলিব্যাগের মাটির উপরিভাগ) আবর্জনা, আধ পঁচা কমপোস্ট, খড়, ছন, পাতা ইত্যাদি দ্বারা হালকাভাবে ঢেকে দেওয়াকে মালচিং বলে। মালচিং মাটির রস সংরক্ষণে সহায়তা করে। শীতকালে মাটি উষ্ণ রাখে। নারকেল, সুপারি, আমড়া, মেহগনি প্রভৃতি গাছের অপেক্ষাকৃত বড় চারায় মালচিং ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। নার্সারিতে মালচিং পদ্ধতি ব্যবহার করলে পানি সেচ ব্যয় কম হয়। এতে চারার অঙ্কুরোদ্গম হার বেশি হয়। চারার মৃত্যু হার কম হয়।

(৩) **সেচ ও পানি নিকাশ :** পলিব্যাগে বা বীজতলায় বীজ ও চারা রোপণের পর নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয়। পানি সেচ দেওয়ার পর কোনো স্থানে পানি আটকে থাকলে তা অপসারণের ব্যবস্থা করতে হয়। বীজ বপন বা চারা রোপণের প্রথম অবস্থায় ঝাঝরি দিয়ে হালকা সেচের মাধ্যমে মাটির উপরিভাগ ভিজিয়ে দিতে হয়। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। পানি সেচ সকাল বা বিকেলে দেওয়া ভাল।

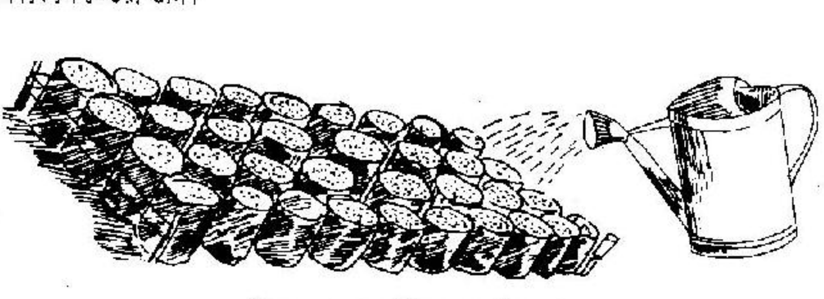

চিত্র ১৩.১৩ : পলিব্যাগে পানি সেচ

(৪) **আগাছা পরিষ্কার করা :** নার্সারির বীজতলা বা পলিব্যাগে চারার গোড়ায় আগাছা জন্মাতে দেওয়া ঠিক নয়। আগাছা চারাকে দুর্বল করে দেয়। আগাছা ছোট থাকতেই পরিষ্কার করা ভাল। মাটি শক্ত হয়ে গেলে হালকা পানি সেচ দিয়ে মাটি নরম করে আগাছা উপড়ে ফেলা যায়।

(৫) **চারা পাতলাকরণ :** বীজতলায় বা পলিব্যাগে চারার সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে তা পাতলা করে দিতে হয়। কোনো একটি পলিব্যাগে একের অধিক চারা থাকা ঠিক নয়। এতে চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। চারা তোলার সময় সবল চারা রেখে দুর্বল চারাটি তুলে ফেলতে হয়। আগাছার অনুরূপ চারা তোলার সময় ও মাটি শুকনো থাকলে হালকা সেচ দিয়ে নিতে হয়।

(৬) **চারায় সার প্রয়োগ করা :** নার্সারিতে উন্নতমানের চারা তৈরি করতে হলে পানি সেচ দেওয়া ও আগাছা পরিষ্কার করার পাশাপাশি সার প্রয়োগ করতে হয়। এতে চারা দ্রুত বাড়ে, চারা সবল থাকে এবং রোগ–বালাই কম হয়। প্রতি বীজতলায় নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করা যায় :

বীজতলার আকার : ১২ মিটার × ১.২ মিটার

সারের পরিমাণ

শুষ্ক গোবর বা কমপোস্ট গুঁড়া	১৫ থেকে ২০ কেজি
ইউরিয়া	২২০ গ্রাম
টিএসপি	১২০ গ্রাম
এমপি	১৬০ গ্রাম

জৈব সার মাটির উপরে ছড়িয়ে দিতে হয়। উপরে বর্ণিত রাসায়নিক সারসমূহ একত্রে ২০ লিটার পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে ঝাঝরি দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যায়। সার প্রয়োগের পর গাছে হালকা সেচ দিতে হয়।

সার প্রয়োগের সময় চারা ১০–১৫ সে.মি. উঁচু হওয়ার পর চারার বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে ৩ থেকে ৫ মাস পর পুনরায় একই পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হয়।

সাবধানতা : চারা বিক্রি বা রোপণ সময় বিলম্বিত হলে বীজতলায় বা পলিব্যাগ চারায় অতিরিক্ত সার দেওয়া ঠিক নয়।

(৭) **শূন্যস্থান পূরণ করা :** বীজতলায় বা পলিব্যাগে চারা কম থাকলে বা না থাকলে অন্যস্থান থেকে চারা তুলে শূন্যস্থান পূরণ করা যায়। চারার শূন্যস্থান পূরণের কাজ মেঘলা দিনে এবং বিকেলে করাই ভাল। শূন্যস্থানে চারা খুব সাবধানে লাগাতে হয় যাতে সে চারা পুনরায় মারা না যায়।

(৮) **শিকড় ছাঁটাই করা :** চারা কিছুটা বয়স্ক হওয়ার পর এর শিকড় পলিব্যাগ ভেদ করে বেরিয়ে গেলে তা কেটে দিতে হয়। শিকড় কাঁচি দিয়ে ছাঁটাই করা যায় আবার খুরপি বা ধারালো তার টেনেও ছাঁটাই করা যায়। শিকড় ছাঁটাই না করলে তা মাটিতে প্রবেশ করে। ফলে পলিব্যাগের চারা তুলতে অসুবিধা হয়। শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৯) **চারা শ্রেণিবিন্যাস করা :** চারা বড় হতে থাকলে এদের উচ্চতা অনুসারে গ্রেডিং করতে হয়। অন্যথায় বড় চারার পাশে ছোট চারা থাকলে তা ছায়ায় পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(১০) **চারা শক্তকরণ :** বীজতলায় ও পলিব্যাগে চারা বেশ যত্নের সাথে বেড়ে উঠে। এসব চারা অন্যত্র রোপণের পর নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে মরে যেতে পারে। অথবা চারার বৃদ্ধিহার কমে যেতে পারে। তাই রোপণের জন্য চারা তোলার মাস খানেক আগে

থেকেই কিছুটা কষ্টসহিষ্ণু করে তুলতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে চারা শক্তকরণ (hardening) বলে। নিম্নলিখিত উপায়ে চারা শক্ত করা যায় বা কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ানো যায়।

* চারা নার্সারির শেডের নিচ থেকে সরিয়ে অল্প রোদে রাখতে হয়।
* পানি সেচের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়ে দিতে হয়।
* পলিব্যাগের শিকড় ছাঁটাই করতে হয়।
* সার ব্যবহার কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়।
* রোপণ করার আগে চারা রোদে রাখতে হয়।

(১১) **চারার রোগ ও পোকা দমন :** নার্সারিতে চারার রোগ পোকা দমনের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

* বীজ তলার মাটি ও বীজ শোধন করা
* চারা রোগাক্রান্ত হলে—

কুপ্রাভিট (Cupravit)
ডাইথেন এম-৪৫ (Dithane M-45)
বোর্দোমিশ্রণ (Bordeauy mixture) ইত্যাদি ওষুধ প্রয়োগ করা।

* চারায় পোকার আক্রমণ হলে

ডায়াজিনন ৫০ ইসি (Diazinon 50 EC)
নগস ১০০ ইসি (Nogos 100 EC)
ডায়েলড্রিন ৪০ ডব্লিউ পি (Dieldrim 40 WP)
সুমিথিয়ন ৫০ ইসি (Sumithion 50 EC)
হেপ্টক্লোর ৪০ ডব্লিউ পি (Heptachlor 40 WP)
প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করে দমন করা।

(১২) **বিবিধ পরিচর্যা :** নার্সারি বা পলিব্যাগে চারার বিবিধ পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে —

* চারার শাখা, পাতা ছাঁটাই
* চারার মূল শিকড় কেটে দেওয়া
* ইঁদুর ও পাখি দমন
* গরু-ছাগল দমন
* চারায় ও বীজতলায় চারার প্রজাতি ও জাতে ট্যাগ লাগানো
* বীজতলার ভিতরে চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা

(১৩) **চারা পরিবহণ :** বনজ গাছের চারা সঠিকভাবে স্থানান্তর বা পরিবহণ করা প্রয়োজন। নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করার পর যথাশীঘ্র পরিবহণ করতে হয় যাতে চারা শুকিয়ে না যায়। চারা পরিবহনের সময় যাতে এর গোড়ার মাটি পড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। পরিবহণের সময় চারায় যাতে কড়া রোদ না লাগে সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়।

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয় সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষ অংশে সংযোজন করা হয়েছে

চতুর্দশ অধ্যায়

চারা রোপণ ব্যবস্থাপনা ও বনজ বৃক্ষ উৎপাদন

বনবৃক্ষের চারা রোপণ করে সফলতা অর্জন প্রধানত সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণের উপর নির্ভর করে। চারা রোপণ পদ্ধতি সঠিক না হলে চারা দ্রুত বড় হওয়া এবং সুঠাম আকৃতি প্রাপ্তির বিষয়টি বহুলভাবে বৃক্ষ রোপণোত্তর পরিচর্যার উপর নির্ভর করে। তাই এই অনুচ্ছেদে বনবৃক্ষ রোপণের সঠিক পদ্ধতি ও পরিচর্যাসমূহ বর্ণনা করা হলো

চারা রোপণের ধাপ

একটি চারা রোপণের কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কতকগুলো নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে সম্পন্ন করতে হয়।

১. **স্থান নির্বাচন :** চারা রোপণের প্রথম ধাপ হচ্ছে স্থান নির্বাচন। চারা রোপণ করার উপযোগী আদর্শ স্থানের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে—

(১) জমি উঁচু হতে পারে, যাতে বন্যার পানি না উঠে ;

(২) মাটি উর্বর হতে হয় ;

(৩) মাটির বুনট দো-আঁশ হতে হয় ;

(৪) চারা রোপণের জায়গা খোলামেলা হতে হয় ;

(৫) মাটি গভীর হতে হয় ;

(৬) মাটি সুনিষ্কাশিত হতে হয় ;

(৭) নির্বাচিত স্থানে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকা ;

(৮) সহনশীল জলাবদ্ধতায় চারা রোপণ করলে মাঝারি নিচু ও নিচু জমিও নির্বাচন করা যায় ;

(৯) পাহাড়ি এলাকার ঢাল ও তলদেশ গাছ ভাল হয় ;

(১০) বসতবাড়ি হলে ফাঁকা উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হয়।

২. চারা নির্বাচন

(১) নির্বাচিত স্থানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে চারার প্রজাতি ও জাত নির্বাচন করতে হয় ;

(২) জায়গাটি সূর্যালোকযুক্ত হলে অর্থাৎ পাহাড় ও বসতবাড়ির দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে হলে ভাল হয় ;

(৩) স্থানটি ছায়াযুক্ত হলে সেই মোতাবেক ছায়া সহ্যশীল প্রজাতির চারা নির্বাচন করতে হয় ;

(৪) নির্বাচিত স্থান নিচু হলে সেখানকার জন্য জারুল, মান্দার, শিশু প্রভৃতি রোপণ করা যায় ;

(৫) চারা সতেজ ও সবল হতে হয় ;

(৬) চারা নিরোগ ও পোকামুক্ত হতে হয় ;

(৭) চারার আকৃতি স্বাভাবিক হয় ;

(৮) চারার মূল শিকড় অক্ষত থাকে ;

(৯) চারার গোড়ার মাটি ও শিকড় শুকিয়ে না যাওয়া ;

(১০) চারার কাণ্ড সোজা ও পাতা স্বাভাবিক সবুজ হওয়া।

৩. **গর্ত তৈরি**

(১) স্থান ও চারা নির্বাচনের পর গর্ত তৈরি করতে হয় ;

(২) ছোট কোদাল দ্বারা গর্ত তৈরি করা যায় ;

(৩) চারার প্রজাতি অনুসারে গর্তের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ করে নিতে হয় ;

(৪) গর্তের উপরের অর্ধেক মাটিকে আলাদা রাখতে হবে গর্তের প্রথম মাটি বলে,

(৫) গর্তের নিচের অর্ধেক মাটিকে আলাদা রাখতে হয়— একে গর্তের দ্বিতীয় মাটি বলে;

(৬) গর্তের ভিতরের ধাপগুলো সমান করতে হয়।

(৭) গর্তের তলার মাটি হালকাভাবে কুপিয়ে নরম করে দিতে হয় ;

চারা তৈরির জন্য প্রয়োজনে মাটি চেলে নেয়া ভাল।

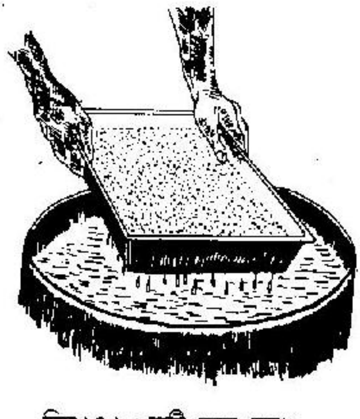

চিত্র ১৪.১ : মাটি চেলে নেয়া।

(৮) চারার আকার অনুসারে গর্তের আকার নিম্নরূপ হতে পারে।

দৈর্ঘ্য	--	৪০ সে.মি. থেকে ৭০ সে.মি.
প্রস্থ	—	৪০ সে.মি. থেকে ৭০ সে.মি.
গভীরতা	--	৫০ সে.মি. থেকে ৮০ সে.মি.

৪. গর্তে সার প্রয়োগ

(১) গর্তে নির্ধারিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়। সারের পরিমাণ গর্তের আকার অনুসারে নিম্নরূপ হতে পারে—

গোবর	:	১০ থেকে ২০ কেজি	এম পি	:	৪০ থেকে ৭০ গ্রাম
ছাই	:	১ থেকে ২ কেজি	টি এস পি	:	৫০ থেকে ১০০ গ্রাম
ইউরিয়া	:	১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম	ইউরিয়া	:	১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম
টিএসপি	:	৫০ থেকে ১০০ গ্রাম	ছাই	:	১ থেকে ২ কেজি
এমপি	:	৪০ থেকে ৭০ গ্রাম	গোবর	:	১০ থেকে ২০ কেজি

(২) গর্তের প্রথম মাটি গর্তের তলায় দিতে হয় ;

(৩) তারপর গর্তের দ্বিতীয় মাটির পরিমাপে গোবর ও ছাইসহ অন্যান্য সার মিশিয়ে গর্তের উপর দিতে হয় ;

(৪) সার মিশানোর পর গর্তটি ১০ থেকে ১৬ দিন রেখে দিতে হয় ;

(৫) তারপর গর্তের মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরা করে চাপ রোপণ করতে হয়।

৫. চারার প্রস্তুতি

(১) পলিব্যাগ উৎপন্ন চারা উত্তোলনের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

ক : ভুল পদ্ধতি খ : সঠিক পদ্ধতি

চিত্র ১৪.২ : পলিব্যাগে চারা ধরা।

চিত্র ১৪.৩ : চারা ধরা।

(২) পলিব্যাগের চারা রোপণের সময় সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় ;

(৩) চারায় অতিরিক্ত পরিমাণে শুকনা শিকড় থাকলে তা ছাঁটাই করে দেওয়া যায় ;

ক) একক পদ্ধতি

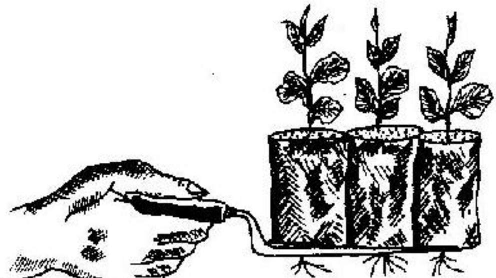

(খ) বীজ তলায় একত্রিক অবস্থায়

চিত্র ১৪.৪ : চারার শিকড় ছাঁটাই।

(৪) চারায় রোগ বা পোকাক্রান্ত পাতা থাকলে তা ছেঁটে দিতে হয়;

(৫) চারায় অতিরিক্ত পাতা থাকলে তা কিছু পরিমাণ ছেঁটে দিতে হয়;

(৬) চারায় অতিরিক্ত কুঁশি বা পার্শ্ব শাখা থাকলে তাও ছাঁটাই করা যায়;

(৭) চারা রোপণ করার আগে হালকা রোদে রেখে কিছুটা হার্ডেনিং (hardening) করে নেওয়া ভাল;

(৮) চারার গোড়ার মাটি অক্ষত রাখতে হয়;

(৯) চারার মূল শিকড় যাতে কেটে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়

২. চারা রোপণ

(১) গর্তে সার প্রয়োগের ১০ থেকে ১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হয়;

(২) প্রথমে চারার গোড়ার আকার অনুসারে মাটি ভর্তি গর্তের মাঝখানে একটি গর্ত করতে হয়;

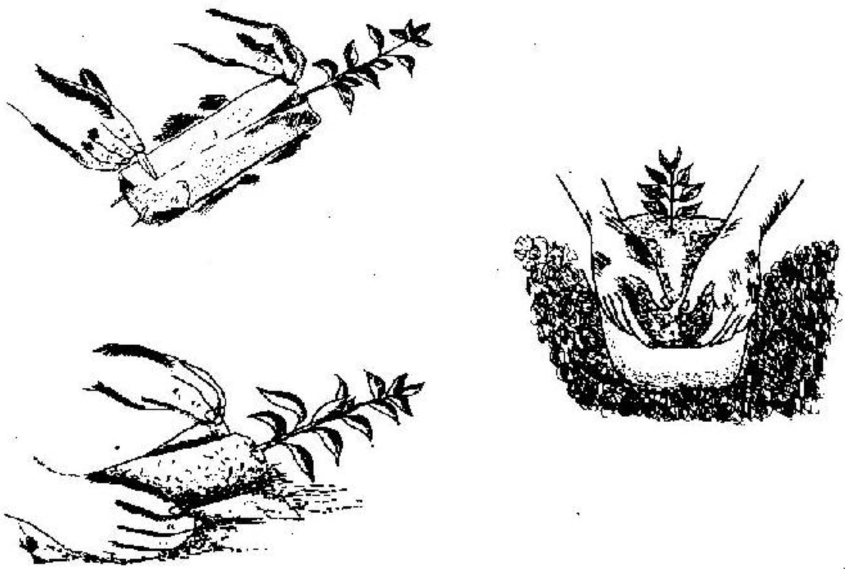

চিত্র ১৪.৫ : মাটির গর্তে চারা বসানো।

(৩) নির্ধারিত চারা টবে বা পলিব্যাগে থাকলে চারা খুলে নিতে হয়;

(৪) তারপর চারাটি ২ হতে গর্তে বসিয়ে দিতে হয়;

(৫) চারার গোড়া হালকাভাবে চেপে দিতে হয় (চিত্র ১৪.৬);

(৬) পাশের নরম মাটি এমনভাবে চাপতে হবে যেন চারাটি সোজা থাকে;

(৭) বিকেল বেলা চারা রোপণের উত্তম সময়

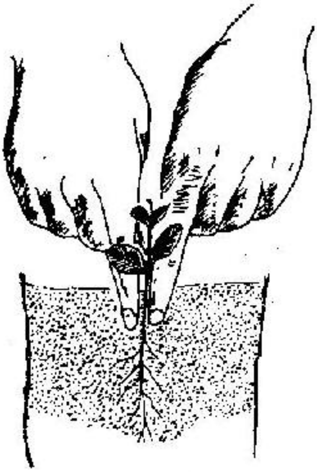

চিত্র ১৪.৬ : চারার গোড়ার মাটি হালকা চেপে দেয়া।

৪. পানি সেচ

(১) চারা রোপণের পর চারার গোড়ায় পানি সেচ দিতে হয় (চিত্র ১৪.৭) ;

(২) প্রতিটি গাছের গোড়ায় এক বালতি বা এক ওয়াটারকেন ঝঝারি পানি দিলেই চলে ;

(৩) পানি এমনভাবে গাছের গোড়ায় এবং পাশে দিতে হয় যেন গোড়ার মাটি সরে না যায় ;

(৪) সাবধানে পানি সেচ দিতে হয় যাতে গাছ হেলে না পড়ে ;

চিত্র ১৪.৭ : চারার গোড়ায় পানি সেচ দেয়া।

BANSDOC Library
Accession No. 17810

(৫) চারার গোড়ায় পানি দেওয়ার পর গাছের গোড়ায় আর পা না দাবানো ;
(৬) পানি দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের গোড়া একটু উঁচু থাকে এবং সেখানে পানি না জমে ;
(৭) চারা রোপণ শেষে পানি দেওয়ার পর পরবর্তী পানি সেচ মাটি অবস্থা অনুযায়ী দিতে হয়। মাটি যতোক্ষণ আর্দ্র থাকে ততোক্ষণ পানি সেচের প্রয়োজন নাই।

৮. চারার খুঁটি বাঁধা

(১) চারা রোপণ ও পানি সেচ দেওয়ার পর চারায় খুঁটি বাঁধতে হয় ;
(২) খুঁটি বাঁশের বা কাঠের (ডাল শাখা) হতে পারে ;

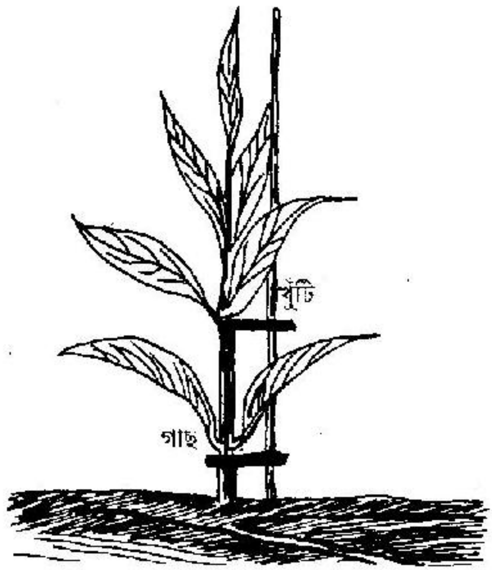

চিত্র ১৪.৮ : চারায় খুঁটি বাঁধা।

(৩) খুঁটি শক্ত হবে যাতে গাছটি ধরে রাখতে পারে ;
(৪) খুঁটির দৈর্ঘ্য চারার উচ্চতার প্রায় সমান হয় ;
(৫) খুঁটি মাটির নিচে ৩০ থেকে ৪০ সে.মি. পুঁতে দিতে হয় ;
(৬) খুঁটির সাথে ৩ থেকে ৪ স্থানে হাল্কাভাবে বাঁধতে হয় ;
(৭) নরম চিকন রশি দিয়ে বাঁধতে হয় ;
(৮) চারার উচ্চতা বেশি হলে বা চারা ভারী হলে কৌণিকভাবে একাধিক খুঁটি ব্যবহার করা যেতে পারে ;

৯. চারায় বেড়া দেওয়া

(১) চারাকে গরু–ছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত বেড়া দিতে হয় ;
(২) সচরাচর বাঁশ দ্বারা বেড়া দেওয়া হয় ;

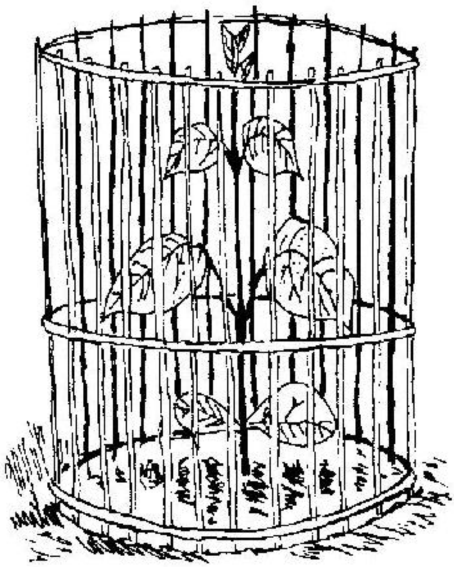

চিত্র ১৪.৯ : চারায় বেড়া দেয়া।

(৩) বেড়ার খুঁটি হিসেবে গাছের শক্ত ডাল ব্যবহার করা যায় ;

(৪) বন বাগান প্রতিষ্ঠা করা হলে প্রতিটি গাছে বেড়া না দিয়ে শক্ত করে সীমানা বেড়া দিতে হয়।

চিত্র ১৪.১০ : বন বাগানের চারার সীমানায় বেড়া দেয়া

১০. ছায়া প্রদান

(১) চারা রোপণের পরপরই খুব নাজুক থাকে। সেসময় চারাকে প্রচণ্ড রোদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ছায়া দিতে হয় ;

(২) চারার বেড়ায় লতা-পাতা দিয়েও ছায়ার ব্যবস্থা করা যায় ;

চিত্র ১৪.১১ : চারায় ছায়া প্রদান।

(৩) চারার গোড়ায় মালচ দিলে গাছের গোড়া ঠাণ্ডা থাকে ;

(৪) শুকনো লতা-পাতা ও কচুরি দিয়ে গাছের গোড়ায় জাবড়া (mulch) দেওয়া যায়।

বনজ বৃক্ষের সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা

রোপণ করা বৃক্ষ থেকে দ্রুত ও উন্নত ফলন পেতে হলে চারা অবস্থা থেকেই গাছের বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হয়। বাংলাদেশের পাহাড়ি সমতল ও তৈরি মাটি (সড়ক, বাঁধ, বসত-ভিটা) সকল ক্ষেত্রেই মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা কমে গেছে। এমতাবস্থায় গাছে সুষম মাত্রায় সার না দিয়ে গাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায় না। তাই সকল বনায়ন কার্যক্রমের প্রধান বিষয়ের মধ্যেই রয়েছে বনজ বৃক্ষে সুষম সার প্রয়োগ ও উপযুক্ত পরিচর্যা।

সারের প্রকার

বনজ গাছের প্রধানত নিম্নলিখিত সার ব্যবহার করা যায়, যথা–

(ক) জৈব সার -- গোবর, কমপোস্ট

(খ) রাসায়নিক সার -- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও চুন

(গ) তরল সার -- অণুপুষ্টি স্প্রে, যথা-দস্তা, বোরন, লোহা, কপার

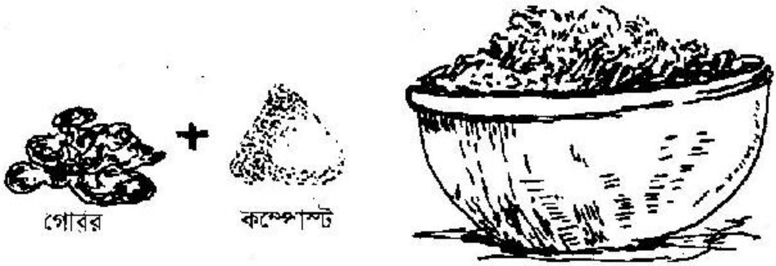

চিত্র ১৪.১২ : বিভিন্ন প্রকার সার।

সারের পরিমাণ

গাছের গোড়ায় প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন সারের পরিমাণ, মাটি, গাছের প্রজাতি ও বয়সের উপর নির্ভর করে। নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর আলোকে গাছে প্রয়োগযোগ্য সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

১. জৈব সার গাছের গোড়ায় মাটির উপরে ছড়িয়ে দিতে হয়।

২. আধা পঁচা কমপোস্ট সার গাছের গোড়ায় মাল্চ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

৩. অন্যান্য সার উপর মাটির সাথে হালকাভাবে মিশিয়ে দিলে ভাল হয়।

৪. বাড়ন্ত গাছের বেলায়, গোড়ার ৫০ থেকে ১৫০ সেমি দূরে সার দ্রব্য দেওয়া যায়।

৫. লিগুমে বৃক্ষ যেমন— ইপিল ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া, রেইনট্রি, কড়ই, মিনজিরি, বকফুল প্রভৃতি গাছ সার দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

৬. বছরে দু'বার অর্থাৎ বর্ষার আগেও পরে সার প্রয়োগ করা ভাল।

৭. সার প্রয়োগের পর হাল্কা সেচ দেওয়া উত্তম।

গাছে সার প্রয়োগ সুপারিশ (সার মিশ্রণ কেজি প্রতি, প্রতি গাছে) ৪/৬ মাস পর পর।

গাছের গ্রুপ	গাছের বয়স				
	২ বছরের	২ থেকে ৪	৪ থেকে ৬	৬ থেকে ১০	১০ বছরের
কম	বছর	বছর	বছর	বেশি	
ইপিল ইপিল	০.৫	০.৭	১.০	১.০	১.০
গ্লিরিসিডিয়া					
রেইনট্রি,	১	১.৫	২.০	৩.০	৪.০
কড়ই					
আম, জাম	১.৫	২.০	৩.০	৪.৫	৪.০
মেহগনি, অর্জুন	০.৭	০.৯	১.৩	২.৫	৪.০
ইউক্যালিপ্টাস	০.৩	০.৫	০.৭	১.০	২.০
দেবদারু					
শাল, সেগুন	০.৮	১.৪	২.০	২.৫	৩.০
গামার চামলা	০.৪	০.৭	১.০	১.০	২.৫
পাহাড়ি গাছ	০.২	০.৬	১.০	১.৫	২.০
বিবিধ কৃষি বন	০.৩	১.০	২.০	২.৫	৩.০
খেজুর, নারকেল	১.০	২.০	৩.০	৪.০	৫.০

সার মিশ্রণ তৈরি সার

দ্রব্য গোবর বা কমপোস্ট	সাধারণ বনজ গাছ	লিগ্যুম গাছ
শুকনো গুঁড়া	১৩ কেজি	১৫ কেজি

ছাই	২ কেজি	২ কেজি
ইউরিয়া	২ কেজি	
এসএসপি	২ কেজি	২ কেজি
পটাশ	১ কেজি	১ কেজি
মোট	২০ কেজি	২০ কেজি

নার্সারিতে চারা উৎপাদনে যন্ত্রপাতি যেমন— কোদাল, নিড়ানী, ঝাঁঝি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

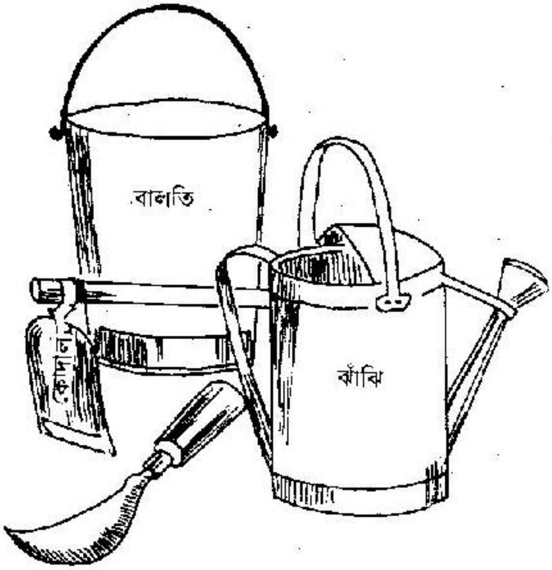

চিত্র ১৪.১৩ : চারার নার্সারিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি।

বৃক্ষ ব্যবস্থাপনা : প্রুনিং ও ট্রেনিং

একটি কাষ্ঠল গাছের (Timber plant) উৎপাদন গাছটির মূল কাণ্ডের শাখা–প্রশাখার উপর নির্ভর করে। একটি গাছের মূল্যমান নির্ধারিত হয় এর ব্যবহারযোগ্য কাঠের পরিমাণের উপর। গাছের মূল কাণ্ড ও প্রধান কয়েকটি শাখার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেশি হলে এবং কাঠ সোজা থাকলে ব্যবহারযোগ্য কাঠের পরিমাণ বেশি হয়। কাঠের মানও ভাল হয়। কাঠের ব্যবহারযোগ্য পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এবং কাঠের আকারগত মান উন্নত করার জন্য বৃক্ষের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রুনিং ও ট্রেনিং প্রয়োজন।

বৃক্ষের প্রুনিং-এর উপকারিতা

গাছের অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত ডালপালা শাখা নির্দিষ্ট নিয়ম মোতাবেক অপসারণকে প্রুনিং (pruning) বা ছাঁটাই বলা হয়। শুধু কাষ্ঠল নয়, সকল ধরনের গাছের জন্যই প্রুনিং উপকারী। প্রুনিং–এর প্রধান প্রধান উপকারিতা হলো —

১. গাছের আকার আকৃতি ঠিক রাখা ;

২. রোগ ও পোকাক্রান্ত প্রশাখা ছেঁটে দেওয়া ;

৩. ছাঁটাই অংশ উপস্থিতভাবে জ্বালানি, বেড়া ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায় ;

৪. ছাঁটাইয়ে গাছের মূল কাণ্ডের পার্শ্ব বা বেড় বর্ধন বাড়ে ;

৫. গাছ ঝড়–তুফানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না ;

৬. গাছের কেনোপির ভিতরে আলো বাতাস চলাচল বাড়ে ;

৭. ছাঁটাইয়ের পর গাছের পল্লব বর্ধন (foliar growth) বাড়ে ;

৮. কৃষি বন ছাঁটাই করলে আন্তঃফসলের উপকার হয় ;

৯. ছাঁটাই দ্রব্য পশু–পাখির খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ;

১০. ছাঁটাইয়ে গাছের পরগাছা বিনষ্ট হয় যেমন– স্বর্ণলতা, বন্য অর্কিড।

প্রুনিং পদ্ধতি ও সময়

গাছের প্রুনিং পদ্ধতি প্রধানত তিন প্রকার, যথা–

(ক) হালকা প্রুনিং (Light prunning)

(খ) মধ্যম প্রুনিং (Medium prunning)

(গ) গভীর প্রুনিং (Deep prunning)

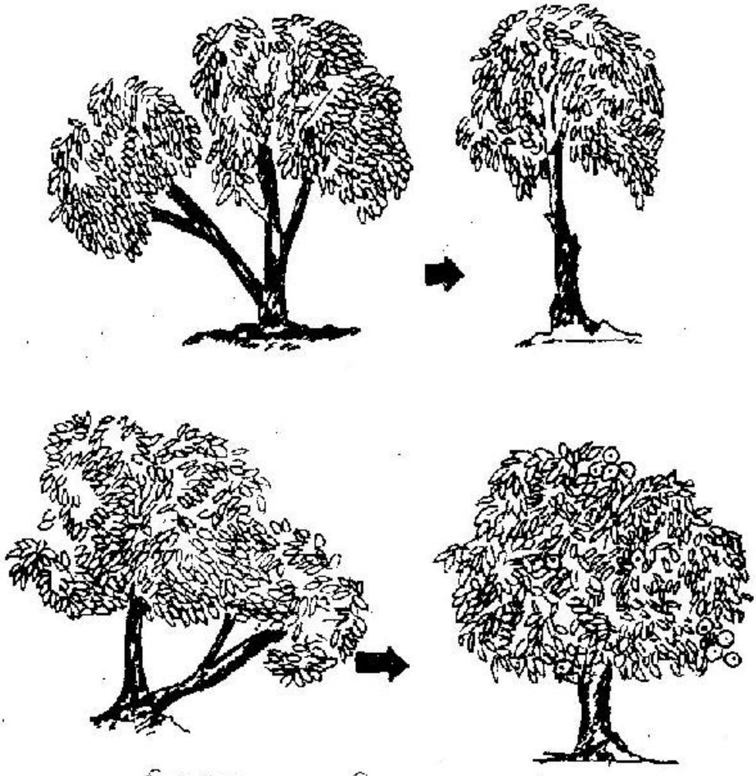

চিত্র ১৪.১৪ : বৃক্ষের প্রুনিং করা অবস্থা।

প্রুনিং পদ্ধতি নির্বাচন

রোপণ করা কোন গাছ কোন পদ্ধতিতে প্রুনিং করা হবে তা নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা–

১. **গাছের প্রজাতি :** কাষ্ঠল বৃক্ষ কম ছাঁটাই করা হয়। যেমন– শাল, সেগুন, মেহগনি, গামার। বহুমুখী ব্যবহার সম্পন্ন গাছ বেশি ছাঁটাই করা হয় যেমন– ইপিল ইপিল, জিগা মন্দার, হিজল।

২. **গাছ রোপণের উদ্দেশ্য :** মূল কাণ্ড লম্বা করার জন্য গাছের পার্শ্ব শাখা বেশি প্রুনিং করা হয়, যেমন– রেইনট্রি, কড়ই, আম, জাম ও কাঁঠাল।

৩. **গাছ রোপণের স্থান :** জনবলের চেয়ে বসতবাড়িতে রাস্তায় ও কৃষি বনে লাগানো গাছে প্রুনিং করার প্রয়োজন হয়।

৪. **প্রুনিং সময় :** প্রতি বছর প্রুনিং করা হলে হালকা প্রুনিং বা মধ্যম প্রুনিং করতে হয়। গাছের চারা অবস্থায় বেশি প্রুনিং করা হয় না।

৫. **উপস্থিত অবস্থা :** উপস্থিত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিরিখে প্রুনিং সম্পর্কে উপরে বর্ণিত (১ থেকে ৪) বিষয়ের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

বৃক্ষের ট্রেনিং ও ব্যবস্থাপনা

কোনো গাছকে একটি উপযুক্ত আকার–আকৃতিগত কাঠামো দানের বৃক্ষের ট্রেনিং (Tree training) বলা হয়। গাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ট্রেনিং একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ট্রেনিং-এর উপকারিতা

১. ব্যবহারোপযোগী কাঠের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ট্রেনিং–এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য ;

২. সুদৃশ্য বন বাগানের জন্য ট্রেনিং অত্যাবশ্যক ;

৩. ট্রেনিং গাছের কাঠামো শক্ত করে ;

৪. ট্রেনিং করা গাছ ঝড় তুফানে সহজে ভেঙ্গে পড়ে না ;

৫. ব্যস্ত রাস্তার পাশে লাগালে গাছ ট্রেনিং করে উপকার পাওয়া যায়।

ট্রেনিং পদ্ধতি

ট্রেনিং পদ্ধতি প্রধানত তিন প্রকার হতে পারে। যথা-

(ক) **সাধারণ ট্রেনিং :** মূল কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা সমানভাবে বাড়তে দেওয়া ;

(খ) **মূল কাণ্ড ট্রেনিং :** মূল কাণ্ড লম্বা ও বড় হতে দেওয়া ;

(গ) **শাখা প্রধান ট্রেনিং :** মূল কাণ্ডের চেয়ে একাধিক শাখা বড় হতে দেওয়া।

প্রুনিং ও ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা পাশাপাশি সম্পাদিত হয়। ট্রেনিংকে অনেকটা উদ্দেশ্যভিত্তিক সুপরিকল্পিত প্রুনিংও বলা যায়। তাই ট্রেনিং পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রুনিং–এর বিষয়াবলী অনেকটা প্রযোজ্য।

বনজ বৃক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি

বনজ বৃক্ষ উৎপাদনের প্রধান প্রধান বিষয় হচ্ছে প্রজাতি নির্বাচন, মাটি, রোপণ সময়, ভূমিকর্ষণ, সার প্রয়োগ, বীজের প্রকার, রোপণ দূরত্ব, সেচ ও নিষ্কাশন, আগাছা দমন, পোকা দমন, রোগ–বালাই দমন, পরবর্তী সার প্রয়োগ, শাখা–প্রশাখা সংগ্রহ, কাঠ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ। অবশ্য গাছ রোপণের স্থানভেদে যথা– বসত, বন বাগান, সড়ক, বাঁধ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রাঙ্গণ, বনাঞ্চল, কৃষিবন ইত্যাদি ভেদে রোপণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় পার্থক্য থাকতে পারে। এ অধ্যায়ে কয়েকটি বনজ গাছের উৎপাদন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

সেগুন

বৈজ্ঞানিক নাম	:	*Tectona grandis*
গোত্র	:	Verbenaceae
ইংরেজি নাম	:	Teak
ধরন	:	প্রান্তীয় বনভূমির পাতাঝরা উদ্ভিদ।

উৎপাদন এলাকা : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বর্তমানে পরিকল্পিতভাবে চাষ করা হচ্ছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগে বসতবাড়ি ও সামাজিক বন হিসেবে সড়ক বাঁধের ধারে লাগানো হচ্ছে। ময়মনসিংহ , টাংগাইল ও যশোরে সেগুন গাছের বৃদ্ধি বেশ সন্তোষজনক। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে এর অন্তর্ভুক্তি কম।

ব্যবহার : সেগুন গাছের মূল ব্যবহার কাঠ হিসেবে। মূল্যবান আসবাবপত্র দরজা, জানালা, খাট, শো–কেস, সোফা, আলনা, বাদ্যযন্ত্র, আলমারি, যাবতীয় আসবাব তৈরির জন্য সেগুন কাঠ খুবই জনপ্রিয় ও পছন্দনীয়। সেগুন বাংলাদেশে আসবাব কাঠ হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট কাঠ। বাণিজ্যিক দিক থেকে সেগুন কাঠ 'এ' কোয়ালিটি কাঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। মানের দিক থেকে বাংলাদেশে তিন ধরনের সেগুন কাঠ পাওয়া যায়, যথা– বার্মা সেগুন (Burma teak), পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম সেগুন (Chittagong tceak) এবং যশোরী সেগুন (Jessore teak)। মানের দিক থেকে বার্মা সেগুন উন্নতমানের, চট্টগ্রাম সেগুন মধ্যম মানের এবং যশোরী সেগুন কিছুটা দুর্বল।

সেগুন কাঠের আঁশ ও আঁশের বিন্যাস খুবই সুন্দর। পরিপক্ক সার কাঠে ঘুন ধরে না।

প্রজাতি নির্বাচন : বাংলাদেশের সকল স্থানেই একটি প্রজাতির সেগুন গাছ বেশি দেখা যায়। প্রজাতির নাম *Tectonia grandis.* বার্মা টিক জাতের সেগুন গাছ বাংলাদেশে অধিক জনপ্রিয়।

ভূমি ও মাটি : সেগুন প্রধানত উচ্চ ভূমির বৃক্ষ। এ গাছ বিলম্বিত জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। এজন্য সেগুন বনের নির্বাচিত স্থান সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। বসতবাড়ি, উঁচু সড়ক, বাঁধে, সাধারণত জলাবদ্ধতা দেখা দেয় না বলে সেখানে সফলতার সাথে সেগুন গাছ লাগানো যায়। দো–আঁশ গভীর উর্বর মাটিতে সেগুন গাছ ভাল হয়, গছ দ্রুত বাড়ে ও উন্নতমানের কাঠ উৎপন্ন হয়।

সেগুনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

বীজ বপনের সময়	--	মার্চ থেকে মে
চারা রোপণের সময়	--	জুন থেকে আগস্ট
রোপণ দূরত্ব	--	১৩ মিটার
গাছের স্বাভাবিক উচ্চতা	--	২৫ মিটার

বীজ সংগ্রহের সময়	---	নভেম্বর, ডিসেম্বর
বীজের অঙ্কুরোদগমের সময়	---	১০ থেকে ২০ দিন
চারা তৈরির উপকরণ	---	প্রধানত স্টাম্প (Stump)

রোপণ সময় : বর্ষাকাল সেগুন চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু করে ভাদ্র মাস অর্থাৎ জুন থেকে শুরু করে আগস্ট মাস পর্যন্ত সেগুনের চারা রোপণ করা যায়। তবে জুলাই মাসে রোপণ করাই ভাল। এতে চারা অতি দ্রুত সবল ও সতেজ হয়ে উঠে।

ভূমি কর্ষণ : নিচু পাহাড়ের ঢাল বা উঁচু সমভূমিতে সেগুনের চারা রোপণ করতে হলে জায়গাটি ভালভাবে পরিষ্কার করে সমান করে নিতে হয়। সেখানে আগাছার পরিমাণ বেশি থাকলে কোদাল দিয়ে হালকাভাবে কুপিয়ে নেওয়া যায়। চারা রোপণ করার জন্য গর্ত করে নিতে হয়। চারার আকার অনুসারে রোপণ গর্তের আকার ৫০ থেকে ৮০ সে.মি. (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা) হতে পারে। গর্ত করে তা কয়েকদিন খোলা রেখে দিতে হয় যাতে সেখানে রোদ লেগে মাটি শুকিয়ে যায়।

সার প্রয়োগ : সেগুন গাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে চারা রোপণ গর্তে এবং রোপণ পরবর্তী সময়ে সুষমভাবে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। রোপণ গর্তের মাটির সাথে সার মিশিয়ে ১০ থেকে ১৫ দিন রেখে দিতে হয়। তারপর গর্তের মাটি পুনরায় কুপিয়ে গুঁড়া করে যথাযথ নিয়মে সবল চারা রোপণ করতে হয়। রোপণ গর্তে সার প্রয়োগ সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলো—

সারের নাম	সারের পরিমাণ
জৈব সার	১৫ থেকে ২০ কেজি
ছাই	১ থেকে ২ কেজি
ইউরিয়া	৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ থেকে ২০০ গ্রাম
এমপি	১০০ থেকে ২০০ গ্রাম

এছাড়াও উপরিলিখিত সার মিশ্রণ নির্ধারিত হারে সঠিক পদ্ধতিতে রোপণ গর্তে ও রোপণ পরবর্তী সময়ে প্রয়োগ করা যায়।

বীজের প্রকার : সেগুন গাছের চারা তৈরির জন্য প্রধানত স্টাম্প ব্যবহার করা হয়। বীজ থেকে চারা তৈরি করা অনেক সময়ের কাজ তার চেয়ে সেগুন গাছের শিকড় থেকে স্টাম্প তৈরি করে রোপণ করা ভাল। সেগুন গাছের বীজ মার্চ, এপ্রিল বা মে মাসে সংগ্রহ করে বীজতলায় বুনতে হয়। তারপর পরিচর্যা করে চারা বড় হওয়ার পর রোপণ করতে হয়। কিন্তু মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে স্টাম্প তৈরি করে সেই বছরই চারা রোপণ করা যায়। অবশ্য সাবধানতার সাথে এক দেড় বছর বয়সী চারাও রোপণ করা যায়।

রোপণ দূরত্ব : বাগান হিসেবে সেগুন গাছ রোপণে গাছ থেকে গাছ এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হচ্ছে ১১ থেকে ১৪ মিটার। বর্গাকার বা ত্রিভুজাকার নক্সা অবলম্বন করে চারা রোপণ করা যায়। তবে সড়ক বাঁধে এক সারিতে গাছ রোপণ করলে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২ থেকে ৩ মিটার কমিয়ে দেওয়া যায়।

সেচ ও নিকাশ : সেগুনের চারা গাছে প্রথম ১ থেকে ২ বছর নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয় এবং গাছ দ্রুত বড় হয়ে শিকড় মাটির গভীরে চলে গেলে আর তেমন সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে সমতল ভূমিতে সেগুন বাগান করতে গেলে যাতে জলাবদ্ধতা দেখা না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। অতিবৃষ্টির পানি সরে যাওয়ার জন্য বাগানের মাঝে মাঝে নালা কেটে দিতে হয়।

আগাছা, রোগ ও পোকা দমন : চারা রোপণের পর সেগুন গাছের গোড়া আগাছামুক্ত রাখতে হয়। গাছে পোকার আক্রমণের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে কীটনাশক বা রোগনাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা : গাছে বেড়া দেওয়া, চারায় খুঁটি বেঁধে দেওয়া, মূল কাণ্ডের পার্শ্বকুঁড়ি ইত্যাদি অপসারণ।

শিশু

ইংরেজি নাম	:	Sisso
বৈজ্ঞানিক নাম	:	*Dalbergia sisso*
গোত্র	:	Leguminoceae
ধরন	:	শিশু একটি পাতাঝরা উদ্ভিদ।

উৎপাদন এলাকা : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমভূমিতে শিশু গাছ জন্মানো যায়। উঁচু ও বন্যামুক্ত মাঝারি উঁচু জমিতে সারা বাংলাদেশেই শিশু গাছ জন্মানো যায়।

ব্যবহার : আসবাবপত্র, খুঁটি, খেলনা, নৌকা প্রভৃতি কাজে শিশু গাছের ব্যবহার বেশি। শিশু কাঠ শক্ত, দৃঢ় কিন্তু নমনীয়। পরিপক্ব সার কাঠ স্থায়ী। কাঠের বর্ণ গাঢ় খয়েরি। শিশু কাঠে ঘুন ধরে না। কাঁচা কাঠ রোদে ফেলে রাখলে বেঁকে যায়। কাঠের ফ্রেন নিয়মিত, সোজা। কাঠের আঁশের বুনট (texture) মসৃণ। কাঠ বেশ ভারি। পানিতে থাকলেও সহজে পঁচে যায় না। কাঠ ছাড়াও শিশু মণ্ড ও গো-খাদ্য পাতা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

প্রজাতি নির্বাচন : বাংলাদেশে শিশু গাছের যে প্রজাতি বেশি রোপণ করা হচ্ছে তার নাম *Delbergia sissoo*। বাংলাদেশে জন্মানো বিভিন্ন এলাকার শিশু গাছের জাতগত (varietal) পার্থক্য দেখা যায় না।

ভূমি ও মাটি : শিশু গাছ লাগানোর জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হয়। উঁচু জমির বন বাগান, বসতবাড়ি, সড়ক বাঁধ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রাঙ্গণে শিশু গাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক। দো-আঁশ থেকে এঁটেল মাটিতে শিশু গাছ জন্মানো যায়। মাটির pH ৬.০ থেকে ৭.৫ হলে ভাল হয়।

রোপণ সময় : শিশু গাছ রোপণ করার উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। জুন থেকে আগস্ট বা আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসে শিশু গাছ রোপণ করতে হয়। মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে বীজ বপন করে তৈরি চারা পরবর্তী বছরের বর্ষায় রোপণ করা ভাল। তবে যত্নের সাথে চারা তৈরি করে উপযুক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করে সে বছরই চারা রোপণ করা যায়। বীজ ছাড়াও শিশু গাছের স্টাম্প (stump) তৈরি করেও রোপণ করা হয়। যথাযথভাবে রোপণ করা হলে শিশু গাছের চারার মৃত্যুহার কম হয়।

ভূমিকর্ষণ : বন বাগান হিসেবে শিশু গাছের চারা রোপণ করলে সমস্ত জমিটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি আলগা করতে হয়। সাথে সাথে আগাছা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয়। রাস্তা বাঁধ বা অন্যান্য স্থানে চারা রোপণ করার পূর্বে জায়গাটি পরিষ্কার গর্ত করে নিতে হয়। গর্তের আকার

চারার আকার অনুসারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা ৫০–৬০ সে.মি হতে পারে। বন বাগানেও জমি চাষ করার পর নির্দিষ্ট দূরত্বে মাপ মোতাবেক গর্ত করতে হবে। গর্ত তৈরির পর এর তলদেশে কয়েকদিন রোদ লাগানো ভাল।

সার প্রয়োগ : চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটির সাথে নিম্নরূপ সার মিশিয়ে ১০ থেকে ১৫ দিন রেখে দিতে হয়

সারের নাম	সারের পরিমাণ
জৈব সার	১০ থেকে ১৫ কেজি
ছাই	১ থেকে ২ কেজি
ইউরিয়া	৫০ থেকে ১০০ গ্রাম
টিএসপি	২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম
এমপি	৫০ থেকে ১০০ গ্রাম

রোপণ গর্তে সার প্রয়োগের জন্য সার মিশ্রণ পাওয়া গেলে বা তা তৈরি করে প্রয়োগ করা যায়। গাছ রোপণ পরবর্তী পর্যায়েও হিসাব মতো মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হয়।

বীজের প্রকার

শিশু গাছের চারা তৈরির জন্য বীজ স্টাম্প উভয়ই ব্যবহার করা যায়। বীজ বা স্টাম্প থেকে নার্সারিতে উপযুক্ত পদ্ধতিতে চারা তৈরি করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : শিশু গাছের রোপণ দূরত্ব অনেকটা গাছ লাগানোর উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। অনেক বড় গাছ তৈরি করতে হলে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৯ থেকে ১০ মিটার দিতে হয়। আরও আগে গাছ কেটে ফেলা, ডাল শাখা ছাঁটাই, পাতা গো–খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা উদ্দেশ্য থাকলে রোপণ দূরত্ব ১ থেকে ৩ মিটার কমিয়ে দেওয়া যায়। গাছ থেকে গাছ এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব সমান রেখে বর্গাকার বা ত্রিভুজাকার নক্সায় গাছ রোপণ করা যায়।

সেচ ও নিকাশ : বন বাগান হিসেবে গাছ রোপণ করলে বর্ষাকালে পানি নিকাশের গুরুত্ব রয়েছে। খরার সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয়। বন বাগানে হালকা প্লাবন সেচ দেওয়া যায়। কিন্তু বসত ও সড়ক বাঁধে লাগানো শিশু গাছের চারায় বালতি বা ওয়াটার ক্যান দিয়ে পানি সেচ দেওয়া যায়।

আগাছা দমন : শিশু গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে ছোট কোদাল, খুরপি বা দা–কাঁচি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। গাছ বড় হয়ে গেলে তেমন আগাছা দমনের প্রয়োজন হয় না।

রোগ ও পোকা দমন : শিশু গাছে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। তবে গাছ রোগ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে সাথে সাথে দমনের ব্যবস্থা নিতে হয়।

মেহগনি

ইংরেজি নাম : Mahagani
বৈজ্ঞানিক নাম : *Swietenia mahagani*
গোত্র : Meliaceae

মেহগনি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলীয় বনভূমির চিরসবুজজাতীয় উদ্ভিদ।

উৎপাদন এলাকা : যশোর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে মেহগনি গাছ বেশি পাওয়া যায়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সড়ক বাঁধে, বসতবাড়ি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রাঙ্গণ, সামাজিক বন ও ব্যক্তিগত বন বাগান হিসেবে মেহগনি গাছের চাষাবাদ বাড়ছে।

ব্যবহার : মেহগনি গাছের প্রধান ব্যবহার কাঠ। উত্তম আসবাবপত্র দরজা জানালা, বাদ্যযন্ত্র, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ছাঁটাই শাখা পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মেহগনির কাঠ দৃঢ়, সহনশীল, অনমনীয়, ভারি ও টেকসই, কাঠের রঙ লাল খয়েরি, গ্রেন সরল। আঁশের বুনরট মসৃণ আঁশ খুবই সরু সার অংশে ঘুন ধরে না। মেহগনি কাঠ প্লাইউড ও গাম তৈরিতেও ব্যবহার করা যায়।

প্রজাতি নির্বাচন : মেহগনি গাছের প্রজাতি হিসেবে ২টি নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশে *Swietenia macroplylla* প্রজাতি প্রধান। এই প্রজাতির মধ্যে জাতগত বৈশিষ্ট্য বা এদের পার্থক্য তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না।

ভূমি ও মাটি : উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে মেহগনি গাছ ভাল জন্মে। ঘন ঘন জলাবদ্ধতা বা বিলম্বিত অতিবৃষ্টিজনিত পানি লাগা বা মাটির অভ্যন্তরীণ দুর্বল নিকাশ মেহগনি গাছের জন্য ক্ষতিকর। দো-আঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি মেহগনি গাছের জন্য উত্তম। মাটির pH ৬.০ থেকে ৭.৫ থাকা ভাল। মেহগনি গাছের জন্য গভীর ও উর্বর মাটি প্রয়োজন।

রোপণ সময় : জুন থেকে শুরু করে আগস্ট মাস পর্যন্ত মেহগনি চারা রোপণ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার পর চারা রোপণ করলে রোপণ পরবর্তী পর্যায়ে অতিরিক্ত সেচ দিতে হয় না। বীজতলায় চারা করতে হলে মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে বীজ সংগ্রহ করে বুনতে হয়।

বীজের প্রকার : মেহগনি গাছের জন্য প্রধানত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা রোপণ করা হয়। তবে স্টাম্পও রোপণ করা যায়। তৈরি করা গেলে বা পাওয়া গেলে স্টাম্প চারা দ্রুত বড় হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে মেহগনির বীজ সংগ্রহ করে নার্সারির বীজতলায় বুনতে হয়। এই চারা তারপর শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বা পরবর্তী বছর বর্ষায় রোপণ করা যায়।

রোপণ দূরত্ব : বন বাগানে রোপণ করতে হলে মেহগনির গাছ থেকে গাছ ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭ থেকে ১০ মিটার হতে পারে। তবে সড়ক-বাঁধে এক সারিতে গাছ লাগালে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১ থেকে ৩ মিটার কমিয়ে দেওয়া যায়। বর্গাকার বা ত্রিভুজাকার নক্সায় মেহগনি গাছ রোপণ করা যায়।

সেচ ও নিকাশ : মেহগনি গাছের দৈহিক অব্যাহত রাখতে হলে খরার সময় পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। আবার অতিবৃষ্টির সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি লেগে না থাকে সেজন্য নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। জলাবদ্ধ অবস্থায় মেহগনি গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

আগাছা ও রোগ-পোকা দমন : মেহগনি গাছের গোড়া সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হয়। গাছে রোগপোকার আক্রমণের লক্ষণ দেখা মাত্র কীটনাশক ও রোগনাশক স্প্রে করতে হয়। মেহগনি গাছের চারার ডগা প্রায়ই রোগ বা পোকাক্রান্ত হয়ে মরে যায়। এতে গাছের ক্ষতি হয়। তাই রোগ পোকা দমনের জন্য উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা : মেহগনি গাছের অন্যান্য পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে

১. চারা অবস্থায় মূল কাণ্ডের পার্শ্বকুঁড়ি অপসারণ

২. চারার খুঁটি ও বেড়া দেওয়া

৩. সেচের পর গছের গোড়ায় জাবড়া দেওয়া
৪. গাছ বড় হওয়ার পর ডাল পাতা ছাঁটাই ও কাঠামো তৈরি ।

ভূমিকর্ষণ : আজকাল সড়ক, বাঁধ, বসত, অফিস-আদালত ছাড়াও সমতল ভূমিতে মেহগনির বন বাগান প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বন বাগান করতে গেলে জমিতে কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে মাটি আলগা করতে হয়। সাথে সথে আগাছা জম এবং জমি সমান করে নিতে হয়। অন্যান্য স্থানেও মেহগনি চারা রোপণ করার আগে নির্বাচিত জায়গা আবর্জনামুক্ত ও সমান করে নিতে হয়। মেহগনির চারা রোপণ করার জন্য গর্ত করতে হয়. চারার আকার অনুসারে গর্তের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার ৪০ থেকে ৭০ সে.মি ভাল। গর্ত করার পরও গর্তের মাটিতে কয়েকদিন রোদ লাগাতে হয়।

মেহগনি গাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য

বীজ বপন সময়	--	মার্চ থেকে এপ্রিল
চারা রোপণ সময়	--	জুন থেকে আগস্ট
রোপণ দূরত্ব	--	৯ মিটার
গাছের স্বাভাবিক উচ্চতা	--	২৫ মিটার
বীজ সংগ্রহের সময়	--	জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি
বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময়	--	২০ থেকে ৩০ দিন
চারা তৈরির উপকরণ	--	বীজ ও স্টাম্প
ছাঁটাই	—	ডাল কাটা যায়

কাঠের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) – ০.৬৩ থেকে ০.৭৬

সার প্রয়োগ : মেহগনি গাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে চারা রোপণ গর্তে এবং রোপণ পরবর্তী সময়ে নিয়মিত সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রথমে জৈব ও রাসায়নিক সার গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে ১০ থেকে ১৫দিন রেখে দিতে হয়. তারপর গর্তের মাটি পুনরায় কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে সেখানে চারা লাগাতে হয়। রোপণ গর্তে নিম্নলিখিত পরিমাণ সার দেওয়া যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ
জৈব সার	১০ থেকে ১৫ কেজি
ছাই	১ থেকে ২ কেজি
ইউরিয়া	২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ থেকে ১০০ গ্রাম
এমপি	৫০–১০০ গ্রাম

এসব সারের পরিবর্তে সুষম সার মিশ্রণ নির্ধারিত হারে ও সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায়।

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ের বিষয় সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষ অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বনজ বৃক্ষের সাধারণ পরিচিতি

চন্দনা কড়ই বা শ্বেত কড়ই (White siris)
Albizia procera
Leguminosae (Mimosoidae)

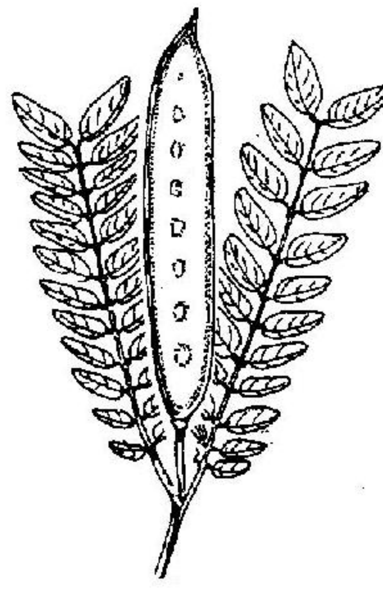

বৃক্ষ : বৃহদাকার প্রায় পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৩০ থেকে ৩২ মিটার।

বাকল : ধূসর হলদে, মসৃণ।

ফুল : মে থেকে সেপ্টেম্বর।

বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ২২,০০০ থেকে ২৬,০০০টি।

কাঠ : সার কাঠ, শক্ত, আসবাব, নির্মাণ।

ডালপালা : কম। জমির আইলেও জন্মে। ডালপাতা প্রুনিং করা যায়।

ব্যবহার : নির্মাণ কাঠ, জ্বালানি।

মৃত্তিকা : খরা ও সামান্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে, মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

এলাকা : সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল এলাকায় বেশি জন্মে।

প্রধান মড্যুল : সীমানা বন মড্যুল। কৃষি বন ও মাঠ ফসল মড্যুল বসত মড্যুল।

শিরিষ বা কালীকড়ই (Black Siris)
Albizlia jebbeck
Leguminosae

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ,

উচ্চতা : ৩০ থেকে ৩৫ মিটার

উচ্চতা : ২০ থেকে ২৭ মিটার

কাঠ : শক্ত, আসবাব ও নির্মাণ, গাঢ় বাদামি, ভারি।

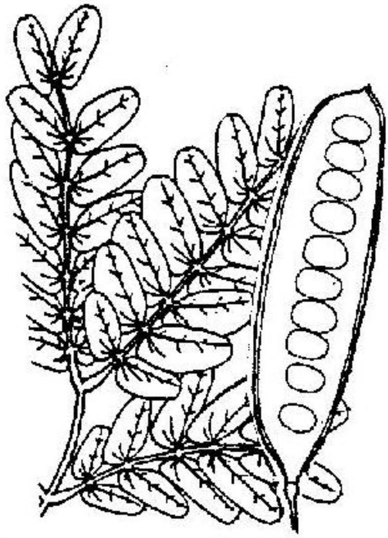

পাতা : গো-খাদ্য।

ডালপালা : বিস্তৃত, কাটা যায়।

বীজ সংগ্রহ : জানুয়ারি থেকে মার্চ।

বীজের ওজন : প্রতি সে.মি. ৮,০০০ থেকে ১১,০০০টি।

মৃত্তিকা : মাটির উর্বরতা বাড়ায়। চা বাগানে ছায়া গাছ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনুর্বর জমিতেও জন্মে।

বংশবিস্তার : বীজ ও কাটিং।

ব্যবহার : নির্মাণ কাঠ, জ্বালানি।

এলাকা : সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এলাকায় বেশি জন্মে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলেও জন্মে

প্রধান মড্যুল : বন বাগান, সড়ক বাঁধ মড্যুল, বসত মড্যুল।

রক্ত চন্দন বা রঞ্জন

Adenanthera pavonina

Leguminosae (Mimosoidae)

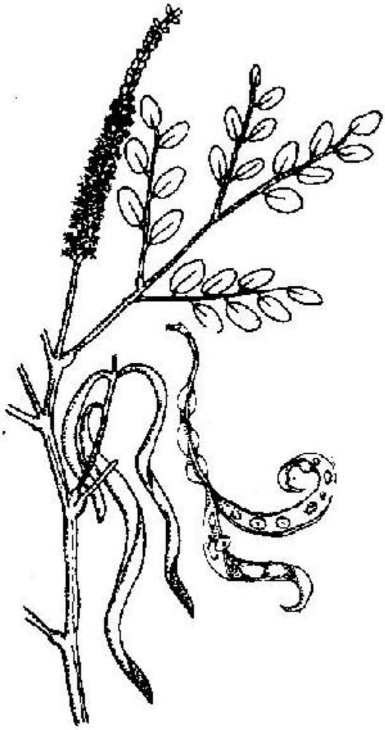

বৃক্ষ : মধ্যম থেকে বৃহদাকার সুদর্শন গাছ, পাতাঝরা প্রকৃতি।

বাকল : বাদামি বা ধূসর বাদামি।

উচ্চতা : ২৩ থেকে ৩০ মিটার।

কাঠ : লাল, শক্ত।

ফুল : মার্চ থেকে এপ্রিল।

বীজ সংগ্রহ : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।

মৃত্তিকা : মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

ব্যবহার : আসবাব তৈরি, নির্মাণ ; ছায়া গাছ।

এলাকা : সারা দেশেই বসতবাড়িতে জন্মে।

প্রধান : মড্যুল, বসত মড্যুল। বন বাগান।

তেলি কদম (Henna plant or Wonder tree)

Leucaena sp

Leguminosae

বৃক্ষ : দ্রুত বর্ধনশীল পাতাঝরা মধ্যমাকার বৃক্ষ। উচ্চতা ১০ থেকে ২০ মিটার।

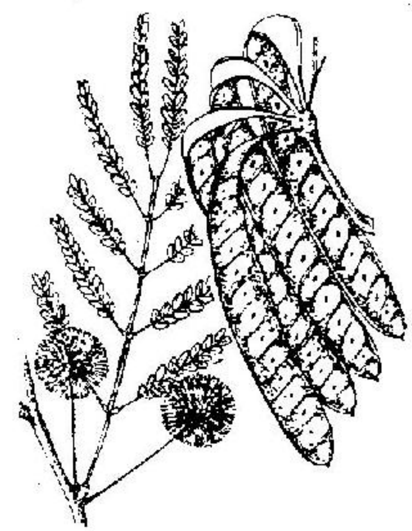

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

পাতা : পশু খাদ্য।

বীজ সংগ্রহ : অক্টোবর থেকে নভেম্বর।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ২৬,০০০ থেকে ২৯,০০০টি।

ব্যবহার : খুটি, নির্মাণ ও জ্বালানি।

এলাকা : বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনাসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বেশি জন্মে।

প্রধান মডুল : বন বাগান মডুল।
সীমানা বন মডুল।

খয়ের (Cutele tree)
Acacia catechu
Leguminosae (Mimosoidae)

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের পাতাঝরা গাছ।

কাণ্ড : ধূসর, শাখায় কাঁটা আছে, কাঁটার মাথা বাঁকানো।

পাতা : পশু খাদ্য।

ফুল : মে থেকে জুন।

বীজ সংগ্রহ : জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৩৫,০০০ থেকে ৪৫,০০০টি

মৃত্তিকা : উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি দো-আঁশ মাটি।

পরিবেশ : মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

ব্যবহার : নির্মাণ ও সরঞ্জাম, চাকা খয়ের তৈরি হয়।

এলাকা : দেশের উত্তরাঞ্চলে রাস্তা, বাঁধ ও বসতবাড়ি ও জমির পাশে লাগানো হয়

প্রধান মডুল : কৃষি বন মাঠ ফসল মডুল, বসত বন মডুল সড়ক বাঁধ মডুল।

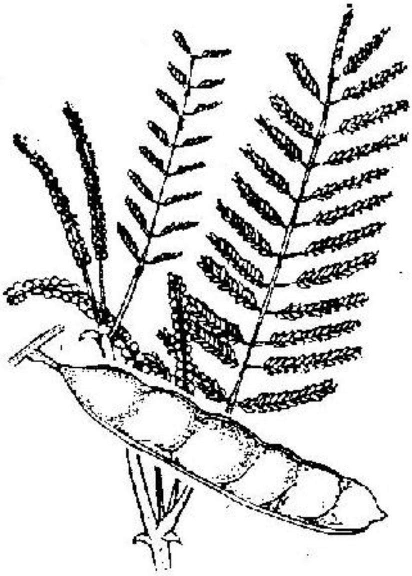

আকাশমনি (Akashmoni)
Acacia auriculiformis
Leguminosae

বৃক্ষ : মধ্যমাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৮ থেকে ১২ মিটার।

কাঠ : মধ্যম থেকে শক্ত।

বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল।

বীজের ওজন : ৩৮,০০০ থেকে ৪০,০০০টি।

মৃত্তিকা : অনুর্বর জমিতে লাগানো যায়। মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

ব্যবহার : কাঠ, জ্বালানি।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে।

প্রধান মডুল : সড়ক, বাঁধ মডুল বন বাগান (সামাজিক)।

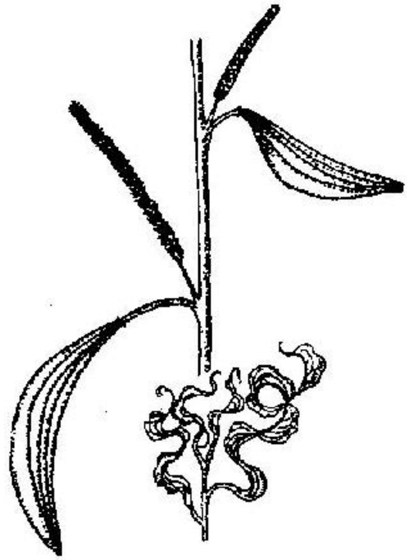

ম্যানজিয়াম (Mangium)

Acacia mangium

Leguminosae (Momosoidae)

বৃক্ষ : ছোট ও মধ্যম আকারের গাছ। দ্রুত বর্ধনশীল।

উচ্চতা : ১২ থেকে ১৫ মিটার

ডালপালা : মধ্যম বিস্তৃত, ছাঁটাই করা যায়।

পাতা : ঘন সবুজ, পুরু।

কাঠ : নরম থেকে মধ্যম শক্ত।

ফুল : মে থেকে জুন।

বীজ সংগ্রহ : অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর

মৃত্তিকা : অম্লীয় মাটি সুনিষ্কাশিত, বেলে ও দো-আঁশ মাটি। মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

ব্যবহার : প্রধানত জ্বালানি। তবে আসবাবও তৈরি করা যায়।

এলাকা : প্রায় সারা দেশেই এগাছ জন্মাতে দেখা যায়।

প্রধান মডুল : সীমানা বন বাগান, সড়ক-বাঁধ মডুল।

মটর কড়ই বা খড়িকড়ই বা অসীম গাছ

Albijia ludidior, A. lucida

Leguminosae (Mimosoedae)

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের লম্বা চিরসবুজ গাছ।

উচ্চতা : ৮ থেকে ১৫ মিটার।

কাঠ : শক্ত।

ফুল : এপ্রিল থেকে জুন।

বংশবিস্তার : বীজ ও শোষক (Root sucker)

বীজ সংগ্রহ : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর।

মৃত্তিকা : সিক্ত বেলে দো-আঁশ মাটিতে জন্মাতে পারে।

ব্যবহার : আসবাব ও নির্মাণ। লাক্ষা সংগ্রহ করা যায়।

এলাকা : দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেশি জন্মে।

প্রধান মড্যুল : সীমানা বন মড্যুল।
বন বাগান মড্যুল।

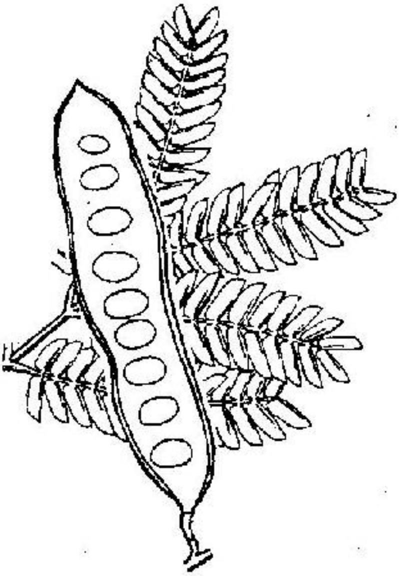

সোনালু বা বাঁদর লাঠি (Monkey stick)
Cassia fistula
Leguminosae

বৃক্ষ : মধ্যমাকৃতির পাতাঝরা বৃক্ষ, ধীর বর্ধনশীল।

ফুল : খুবই সুন্দর।

কাঠ : খুব শক্ত।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৬০০০ থেকে ৭০০০টি

মৃত্তিকা : গভীর মাটি, অনুর্বর মাটিতেও (বেলে মাটি ব্যতীত) জন্মে।

ব্যবহার : শক্ত খুটি, নির্মাণ, সৌন্দর্য গাছ, জ্বালানি।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে তবে দেশে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বেশি।

প্রধান মড্যুল : সীমানা বন মড্যুল। সড়ক বাঁধ মড্যুল।

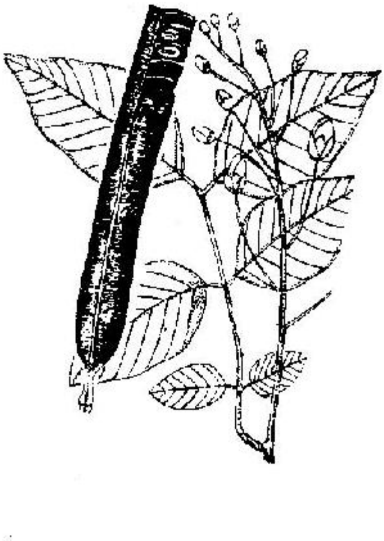

অশোক (Asoka tree)
Saraca asoca, S. indica
Leguminosae, Caesalpineae

বৃক্ষ : চিরসবুজ ক্ষুদ্রাকৃতির গাছ।

উচ্চতা : ৮ থেকে ৯ মিটার

ডালপালা : ঘন পল্লবময়।

বাকল : ধূসর থেকে গাঢ় বাদামি।

পাতা : ঘন সবুজ, চকচকে।

ফুল : লাল থোকা।

বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৫০ থেকে ৬০টি।

ব্যবহার : হালকা কাঠ, ঔষধি, জ্বালানি

এলাকা : দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বেশি।

প্রধান মডুল : উন্মুক্ত মাঠ, সড়ক ও সামাজিক বন।

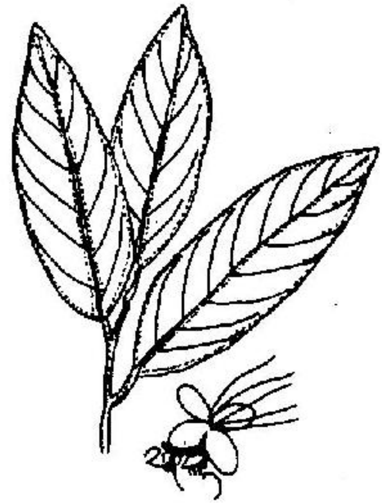

বিলাতি আমড়া (Madras thorn) বা উল্টা কাঁটা

Pithecellobium dulce

Leguminosae (Mimosoidae)

বৃক্ষ : চিরসবুজ বৃক্ষ বা গুল্ম।

উচ্চতা : ৪ থেকে ৬মিটার।

কাঠ : শক্ত।

কাণ্ড : কাণ্ড ও পাতার গোড়ায় কাঁটা আছে, কাঁটার মাথা উপরের দিকে বাঁকানো।

ডালপালা : ছড়ানো নিয়মিত প্রুনিং করা যায়।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : পানির ধারে জন্মে। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। ছায়ার নিচে জন্মাতে পারে. মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

ব্যবহার : বেড়া হিসেবে লাগানো যায়। কাঠ কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রধান মড্যুল : সীমানা বন, বহুস্তর কৃষি বন।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মানো যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বেশি জন্মে। এই গাছকে সেখানে স্থানীভাবে উল্টা কাঁটা বলে।

মেহগনি (Mahogony)

Swietenia macrophylla

বৃক্ষ : লম্বা চিরসবুজ গাছ। সুদর্শন গাছ।

বাকল : চটার মতো খসে পড়ে।

কাঠ : খুবই শক্ত।

উচ্চতা : ২৫ থেকে ৩০ মিটার।

ডালপালা : ঘন পল্লব। বিস্তৃতি মধ্যম।

মৃত্তিকা : উঁচু জমিতে ভাল হয়। লাল মাটিতে জন্মানো যায়। ছায়া পছন্দ করে না।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৬০০ থেকে ২০০০টি।

ব্যবহার : উন্নতমানের আসবাব তৈরি হয়, প্লাইউড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। পাহাড়ি এলাকায় বেশি দেখা যায়। বসতবাড়িতেও জন্মানো যায়।

প্রধান মড্যুল : সড়ক বাঁধ মড্যুল, বন বাগান ও সীমানা বন, বসত বন, সামাজিক বন।

শাল (Shal)

Shorea robusta

Dipterocarpaceae

বৃক্ষ : সোজা কাণ্ডবিশিষ্ট পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ২০ থেকে ৩০ মিটার।

কাঠ : খুব শক্ত, বাদামি।

মৃত্তিকা : উঁচু জমি, জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। ঈষৎ অম্লীয় মাটিতেও ভাল জন্মে।

বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১০০০ থেকে ১৫০০ টি।

ব্যবহার : খুঁটি, নির্মাণ কাঠ।

এলাকা : ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল এলাকার ভাওয়াল গড় ও দিনাজপুর এলাকার শালবন।

প্রধান মড্যুল : বন বাগান, সীমানা বন, প্রাকৃতিক বন।

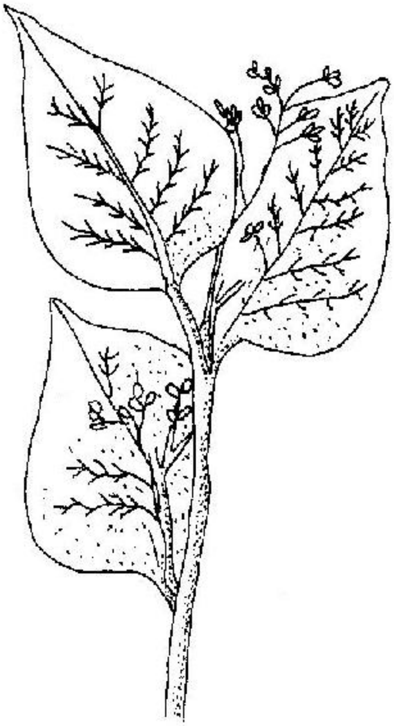

গর্জন (Garjan)

Dipterocarpus turbinatus) (কালি গর্জন) *Diptero carpaceae, D. alatus* শীল গর্জন, *D. ostatus* ধনি গর্জন

বৃক্ষ : বৃহদাকার, চিরহরিৎ বৃক্ষ ৪০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।

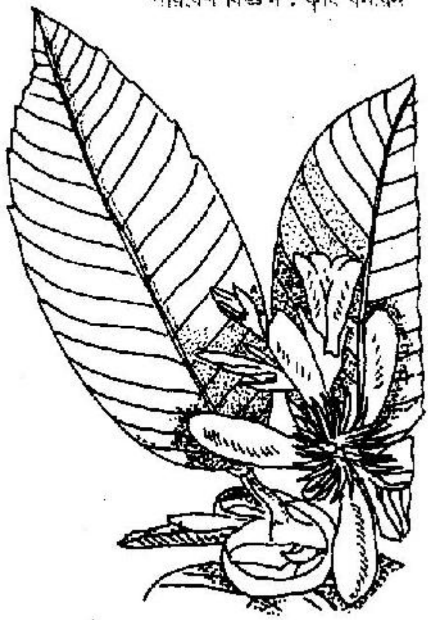

উচ্চতা : ২০ থেকে ৩০মিটার।

কাঠ : কাঠ শক্ত, বর্ণ ধূসর বাদামি হালকা।

মৃত্তিকা : পাহাড়ি মৃত্তিকায় ভাল হয়, উঁচু জমি। গভীর মাটি প্রয়োজন। অম্লীয় মাটিতেও জন্মে।

বীজ : মে থেকে জুন।

বীজ সংগ্রহ : প্রতি কেজিতে ১৪০ থেকে ১৬০টি।

ব্যবহার : নির্মাণ কাঠ, আসবাব।

এলাকা : পার্বত্য জেলাসমূহের পাহাড়িয়া এলাকার ঢালে ভাল জন্মে

প্রধান মডুল : প্রাকৃতিক বন বাগান।

সেগুন (Teak)
Tectona grandis
Verbenaceae

বৃক্ষ : দীর্ঘজীবী বৃহদাকার পাতঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ২৫ থেকে ৩৫ মিটার উঁচু।

কাঠ : শক্ত, মূল্যবান, হালকা বাদামি।

মৃত্তিকা : উঁচু জমি, জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। গভীর মাটি প্রয়োজন।

বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।

বীজের ওজন : ২০০০ থেকে ২৫০০টি।

ব্যবহার : আসবাবপত্র নির্মাণ।

এলাকা : চট্টগ্রাম, পার্বত্য জেলাসমূহ, যশোর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ এলাকা।

প্রধান মডুল : প্রাকৃতিক বাগান ও বন বাগান। সড়ক ও বাঁধ মডুল।

নাগেশ্বর (Nageswar)

Mesun ferrea, lesua cagassarium

Cutiferae

বৃক্ষ : মধ্যম থেকে বড় আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। গাছের বর্ধন ধীর।

উচ্চতা : ১৫ থেকে ১৮ মিটার উঁচু।

কাঠ : খুব শক্ত, ভারি

পাতা : পাতার উপরের দিক খসখসে। নিচের দিকে মোমের আবরণ থাকে।

ফুল : ফুলের নির্যাস দিয়ে সুগন্ধি তৈরি হয়।

বীজ সংগ্রহ : অক্টোবর থেকে নভেম্বর।

মৃত্তিকা : উঁচু জমি, দো-আঁশ গভীর মাটি।

বীজের ওজন : জাত ভেদে ৩০০ থেকে ১০০০টি।

ব্যবহার : নির্মাণ কাঠ ও জ্বালানি।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মাতে দেখা যায় তবে পাহাড়িয়া এলাকায় বেশি।

প্রধান মড্যুল : প্রাকৃতিক বন ও বন বাগান।

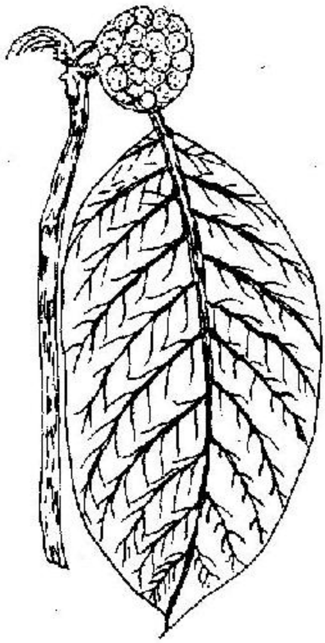

চাপালিশ (Chapalish)

Artocarpus haplasha

Moraceae

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৩০ থেকে ৩৫ মিটার।

কাঠ : শক্ত হলদে বাদামি।

মৃত্তিকা : উঁচু জমি, মধ্যম উর্বর, লোনা মাটিতে ভাল হয় না পাহাড়ি মাটিতে জন্মে।

বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে আগস্ট।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৮০০ থেকে ২২০০টি।

ব্যবহার : আসবাব, নির্মাণ ও জ্বালানি।

এলাকা : পার্বত্য জেলা সংগ্রহ এবং লাল মাটি ও বরেন্দ্র এলাকার উঁচু জমি।

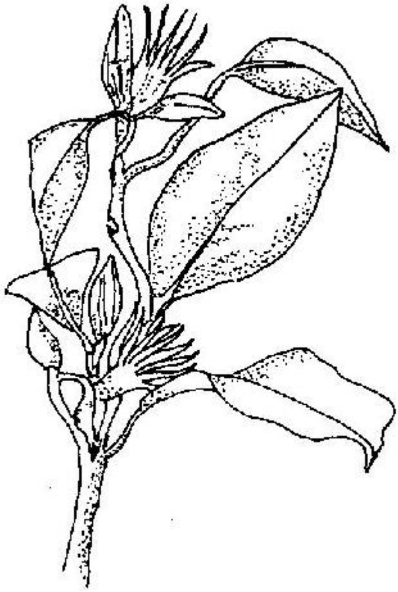

কাঁকড়া (Kakra)

Bruguiera gymnorhiza

Rhizophoraceae

বৃক্ষ : সুন্দরবনের চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৯ থেকে ১৩ মিটার।

কাঠ : শক্ত, হালকা লাল।

মৃত্তিকা : লোনা জমি, সুন্দর বন এলাকা ও উপকূলীয় মাটি।

বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৭০ থেকে ৮০টি ফল।

ব্যবহার : খুটি ও নির্মাণ, জ্বালানি।

এলাকা : সুন্দরবনসহ দাক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা।

প্রধান মড্যুল : প্রাকৃতিক সুন্দরবন, উপকূলীয় বন।

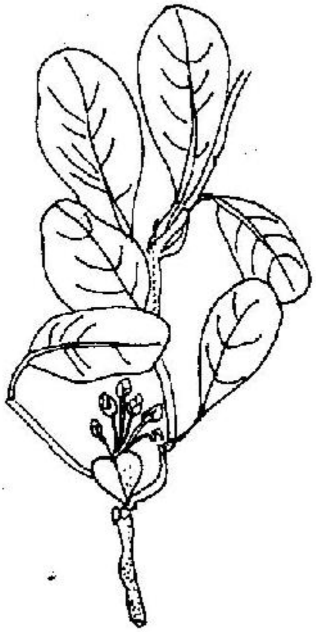

বাইন (Byne)

Avicennia officinalis

Avicenniaceae

বৃক্ষ : সুন্দরবনের গাছ, ছোট চিরসবুজ বৃক্ষ। গরান বনের গাছ। নিচু এলাকায় জন্মে।

উচ্চতা : ৯ থেকে ১০ মিটার।

বাকল : পাতলা, ধূসর বাদামি।

কাঠ : মধ্যম নরম থেকে শক্ত।

মৃত্তিকা : উপকূলীয় সুন্দরবনের মৃত্তিকা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে

বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ২৫০ থেকে ৩৫০টি ফল

ব্যবহৃত : হালকা নির্মাণ ও জ্বালানি।

এলাকা : উপকূলীয় জেলাসমূহের দক্ষিণাংশ।

জোনাকি জাম/কাঞ্জাইল বা উড়িআম

Bischofia javanica

Euphorbiaceae

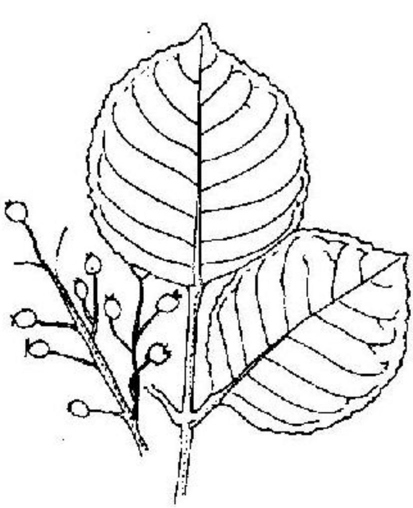

বৃক্ষ : বৃহদাকার বৃক্ষ, চিরসবুজ প্রকৃতি।

উচ্চতা : ২০ থেকে ২৫ মিটার।

ডালপালা : ছড়ানো।

কাঠ : শক্ত, পানিতে পচে না।

মৃত্তিকা : নদীর তীরে বা জলাশয়ের পাড়ে সিক্ত মাটিতে জন্মে। ছায়াতেও জন্মাতে পারে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। বেলে দো-আঁশ মাটিতেও জন্মানো যায়।

ব্যবহার : নির্মাণ কাজে কাঠ ব্যবহার হয়। পেন্সিল তৈরিতেও কাঠ ব্যবহৃত হয়

এলাকা : সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

প্রধান মড্যুল : পাহাড়ি বন, প্রাকৃতিক বন, বহুস্তর পাহাড়ি বন।

কেওড়া

Sonneratia aptale

Sonneratiaceae

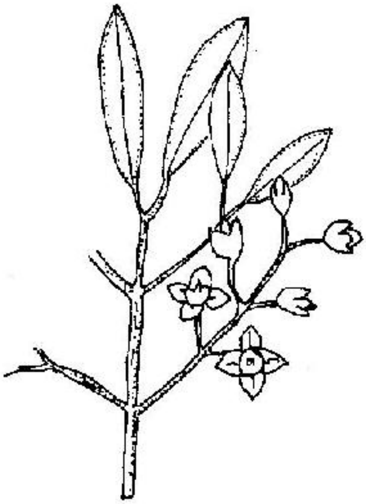

বৃক্ষ : বৃহদাকার চিরসবুজ গরানজাতীয় গাছ জোয়ারভাটা স্থানে জন্মে। সুন্দরবনে জন্মে। শ্বাসমূল থাকে। দ্রুত বর্ধনশীল।

উচ্চতা : ২৫ থেকে ৩০ মিটার।

বাকল : কালচে।

কাঠ : মধ্যম শক্ত, নির্মাণ তক্তা ভাল হয়।

বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।

মৃত্তিকা : লোনা জমি, সুন্দরবনের মাটি ও উপকূলীয় মাটি।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৪০ থেকে ১৫০টি।

ব্যবহার : নির্মাণ ও জ্বালানি।

এলাকা : বৃহত্তর খুলনা, পটুয়াখালীসহ উপকূলীয় জোয়ার বিধৌত এলাকা।

মন্তব্য : প্রাকৃতিক বাগান ও বন বাগান, উপকূলীয় বনায়ন।

বিলাতী জারুল (Queen flower)

Lagerstroemia speciosa (L. flos-deginae)

Lythraceae

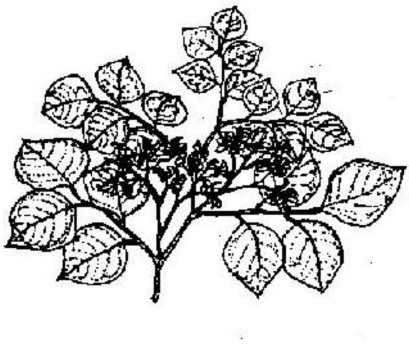

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতঝরা গাছ।

উচ্চতা : ৭ থেকে ১২ মিটার।

কাণ্ড : সোজা নয়।

কাঠ : শক্ত, পানিতে সহজে পচে না।

মৃত্তিকা : অনুর্বর নিচু জমিতেও জন্মানো যায়। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

ফুল : এপ্রিল থেকে মে, দেখতে হালকা বেগুনি রঙ, খুব সুন্দর।

বীজ সংগ্রহ : জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১,২ থেকে ১,৫ লক্ষ

ব্যবহার : নির্মাণ ও নৌকার সরঞ্জাম, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : পাহাড় থেকে পানির ধার সকল স্থানেই জন্মে। বসতবাড়ির নিচু সীমানায় বেশি লাগানো হয়।

প্রধান মড্যুল : বন বাগান, সড়ক-বাঁধ বন, সামাজিক বন, সৌন্দর্য স্থান।

গামার (Gamar)
Gmelina arborea
Verbenaceae

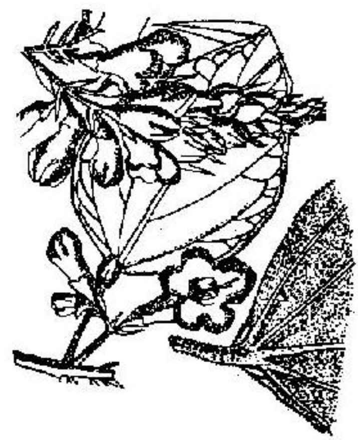

বৃক্ষ : পাতাঝরা বৃহদাকার উদ্ভিদ।

উচ্চতা : ৩০ থেকে ৩৫ মিটার।

ডালপালা : ছড়ানো, ছাঁটাই করা যায়।

কাঠ : খুব শক্ত, হালকা, বর্ণ সাদা

মৃত্তিকা : অনেক ধরনের মাটিতেই জন্মে, তবে উর্বর উপত্যকায় ভাল জন্মে।

বংশবিস্তার : বীজ, কলম ও স্ট্যাম্প।

বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৮০০ থেকে ২২০০টি।

ব্যবহার : নির্মাণে কাঠ হিসেবে উত্তম, আসবাবপত্র তৈরি হয়।

এলাকা : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় ও সমভূমির বনে বেশি দেখা যায়।

প্রধান মড্যুল : প্রাকৃতিক বন, বন বাগান মড্যুল।

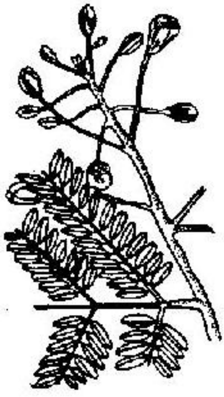

ইউক্যালিপটাস (Red gumtree)
Eucalyptus camaldulensis
Myrtaceae

বৃক্ষ : চিরসবুজ লম্বা বৃক্ষ, দ্রুত বর্ধনশীল।

উচ্চতা : ২২ থেকে ২৫ মিটার।

বাকল : মসৃণ।

পাতা : লেবুর মতো গন্ধযুক্ত।

কাণ্ড : সোজা, লম্বা।

কাঠ : নরম।

ডালপালা : কম।

বীজ সংগ্রহ : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৩ থেকে ৪ লক্ষ।

ব্যবহার : খুঁটি, আসবাব, মণ্ড, প্যাকিং বাক্স।

এলাকা : সারা দেশেই বিভিন্ন প্রজাতির ইউক্যালিপ্টাস জন্মাতে দেখা যায়।

প্রধান মড্যুল : বন বাগান, সামাজিক বন।

পাটকা বা সিটকি (Patka)

Grewia microcos, Microcos paniculata

Tiliaceae

বৃক্ষ : গুল্ম বা ছোট গাছ। চিরসবুজ, দ্রুত বর্ধনশীল।

উচ্চতা : ৩ থেকে ৫ মিটার।

কাঠ : মধ্যম শক্ত ও হালকা।

ডালপালা : মধ্যম, ছাঁটাই করা যায়।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : চিরসবুজ বনে মিশ্রভাবে জন্মে। জলাশয় ও খালবিলের পাশে জন্মে। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। অনুর্বর জমিতে লাগানো যায়।

বীজ সংগ্রহ : জুলাই থেকে আগস্ট।

ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। ডালপালা দিয়ে কৃষি জমিতে বেড়া দেওয়া যায়। কাঠ দ্বারা কোনো কোনো সময় কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়।

এলাকা : লোনা বন ব্যতীত দেশের সকল বন ও এলাকায় জন্মানো যায়।

প্রধান মড্যুল : বহুস্তর, কৃষি বন, মিশ্রবন, সড়ক-বাঁধের ঢাল।

ছাতিম (Devil's tree)

Alstonia scholaris

Apocynaceae

বৃক্ষ : বৃহদাকার উঁচু চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ১৫ থেকে ২০ মিটার।

কাণ্ড : শিরাযুক্ত।

কাঠ : মধ্যম, ডালপালা নরম।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ২.৫ থেকে ২.৮ লক্ষ।

মৃত্তিকা : নিচু জমি থেকে শুরু করে পাহাড়িয়া মাটি সব জায়গায় জন্মে।

ব্যবহার : কাঠ দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহৃত হয় ঔষধি গুণ রয়েছে।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পাহাড়িয়া এলাকায় ও জলাশয়ের ধারে বেশি দেখা যায়।

প্রধান মন্ডল : বসত বন, সামাজিক বন।

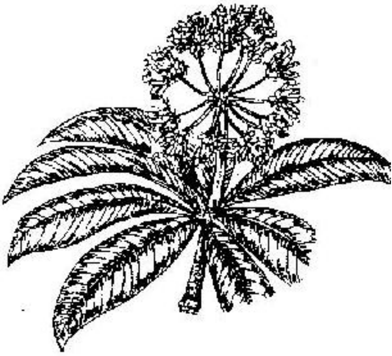

গাব বা দেশী গাব (River ebony)

Diospyros peregrina, D. embrayopteris

Ebenaceae

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৭ থেকে ১২ মিটার।

কাণ্ড : খাটো, শিরাযুক্ত।

বাকল : কালচে।

বীজ সংগ্রহ : জুলাই থেকে আগস্ট

মৃত্তিকা : বিভিন্ন প্রকার মাটিতে জন্মে। সিক্ত ও ছায়াযুক্ত স্থানেও জন্মানো যায়। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। চারা গাছ বড় গাছের নিচেও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। কাঁচা গাবের রস নৌকা ও জালে লাগানো হয়।

এলাকা : সারা দেশেই গাব গাছ জন্মে। বসতবাড়িতেও গাব গাছ বেশি দেখা যায়

প্রধান মন্ডল : বসত বন, বহুস্তর কৃষি বন।

চম্পা বা স্বর্ণ চম্পা (Champa)

Michelia champaca

Magnoliaceae

বৃক্ষ : বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ

উচ্চতা : ৩০ থেকে ৩৫ মিটার।

কাণ্ড : সোজা, লম্বা।

কাঠ : শক্ত মূল্যবান কাঠ, হলদের বাদামি।

ফুল : হলুদ বর্ণের গন্ধযুক্ত।

বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৪০০০ থেকে ১৬০০০টি।

এলাকা : সিলেট চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চল।

প্রধান মড্যুল : পাহাড়ি বন, সড়ক বন, সামাজিক বন, বসত বন।

পানি হিজল (Pani hijal)

Salix tetrasperma

Salicaceae

বৃক্ষ : মধ্যমাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৭ থেকে ১২ মিটার।

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : জলাশয়ের ধারে সিক্ত মাটিতে জন্মে। আংশিক ছায়া ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ–এপ্রিল।

ব্যবহার : কাঠ হালকা নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। ডালপালা ছাঁটাই করা যায়। পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। নিচু এলাকায় বেশি দেখা যায়। সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের প্রাকৃতিক বনেও জন্মাতে দেখা যায়।

প্রধান মড্যুল : নিচু ও মাঝারি নিচু ভূমি কৃষি বন।

পুনিয়াল বা সুলতানা চম্পা (Alexandridn laurel)

Calophyllum inophyllum

Gutiferae

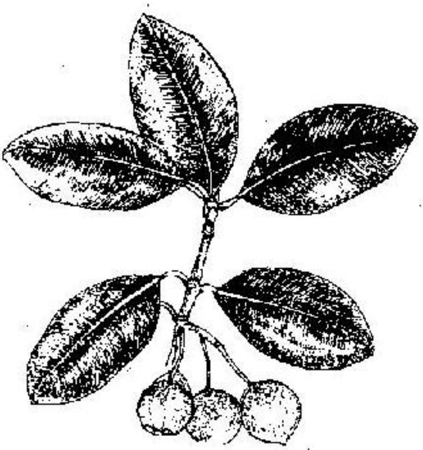

বৃক্ষ : মধ্যমাকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ১৫ থেকে ১৮ মিটার।

কাণ্ড : গুড়ি মোটা ও আঁকাবাঁকা।

বাকল : কালচে বাদামি।

কাঠ : শক্ত, লালচে বাদামি, ভারি।

বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ২৫০ থেকে ৩০০টি ফল।

ব্যবহার : নৌকা ও জাহাজের নির্মাণ সরঞ্জাম।

এলাকা : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল।

প্রধান মড্যুল : বসত বন, পাহাড়ি বন, সামাজিক বন মড্যুলসমূহ।

বনজিয়াল বা চিকুন বা ধলসাগর (Nettle tree বা Charcoal tree)

Trema orientalis

Ulmaceae

বৃক্ষ : ছোট গাছ, দ্রুত বর্ধনশীল।

উচ্চতা : ৩ থেকে ৫ মিটার।

বীজ সংগ্রহ : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।

কাঠ : হালকা।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনুর্বর জমিতেও জন্মে। বসতবাড়ির নিচুর সীমানায়ও জন্মাতে দেখা যায়। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

ব্যবহার : প্রধানত জ্বালানি ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঠ চায়ের বাক্স তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়।

এলাকা : সারা দেশেই যেখানে সেখানে জন্মাতে দেখা যায়।

প্রধান মড্যুল : সামাজিক মিশ্রবন, বসত বন।

বন নরঙ্গা বা ছাগললেদা (Ban naranga)

Suregada multiflora

Euphorbiaceae

বৃক্ষ : ছোট থেকে মধ্যম আকৃতির গাছ, পাতাঝরা প্রকৃতির, সুদর্শন।

উচ্চতা : ৮ থেকে ১৪ মিটার

কাঠ : হালকা

ফল : ফল ও বীজ ছাগলের পায়খানার মতো।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : শুষ্ক ও সিক্ত উভয় মাটিতেই জন্মে। আংশিক ছায়াতেও জন্মে। অনুর্বর জমিতে লাগানো যায়। তবে দো-আঁশ মাটি উত্তম।

বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুন।

ব্যবহার : বীজ খাওয়া যায়। কাঠ দিয়ে যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম তৈরি করা যায়; গাছের বাকল বেশ শক্ত।

এলাকা : প্রাকৃতিক বন এবং গ্রামীণ এলাকায় জন্মে। গাছ অযত্নেই দ্রুত বড় হয়।

প্রধান মডিউল : সামাজিক মিশ্র বন।

রেইনট্রি বা রেন্ডি কড়ই (Rain tree)

Samanea saman

Leguminosae

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ, দ্রুত বর্ধনশীল।

উচ্চতা : ২২ থেকে ২৭ মিটার।

কাণ্ড : মোটা, মাধ্যম লম্বা, কাঠ শক্ত।

ডালপালা : ছড়ানো, ছাঁটাই করা যায়।

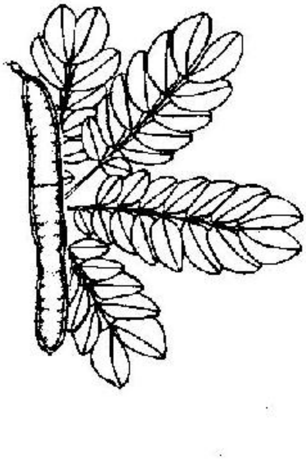

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সব ধরনের মাটিতেই জন্মাতে পারে। তবে উঁচু দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। মাটির উর্বরতা বাড়ায়, বসতবাড়ি, রাস্তার পাশে ও সামাজিক বনে সারি করে লাগানো যায়।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৪৫০০ থেকে ৭৫০০ টি।

ব্যবহার : নির্মাণ, আসবাব, লাকড়ি, সব কিছুই করা যায়। পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চল তথা বরিশাল, যশোর, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনা এলাকায় বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

প্রধান মডুল : বসত বন মডুল ও বাঁধ, মাঠ সীমানা।

ইপিল ইপিল (Ipil Ipil)

Leucaena leucocephala

Leguminosae

উচ্চতা : বৃক্ষ ৪ থেকে ৬ মিটার উঁচু।

মৃত্তিকা : মধ্যম উর্বর জমি।

তাপ-চাহিদা : ১৫ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

নাইট্রোজেন সংযোজন : ৫ টন বায়োমাস থেকে ১২৫ কেজি।

বীজ সংগ্রহ : অক্টোবর থেকে নভেম্বর।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টি।

ব্যবহার : দিয়াশলাই শিল্প ও মণ্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসেবে ভাল। পাতা ও কচি ডগা পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এলাকা : সারা দেশেই বসতবাড়ি, সামাজিক বন ও রাস্তার পাশে লাগানো যায়।

প্রধান মডুল : ইপিলইপিল ও মাঠ ফসল মডুল ইপিলইপিল+বকাইন+মাঠ ফসল+পাহাড়ি ইপিলইপিল মাঠ ফসল মডুল।

মিনজিরি (Minjiri)

Cassia siamea

Leguminosae

বৃক্ষ : মধ্যমাকার চিরসবুজ বৃক্ষ, পাতার বর্ণ গাঢ় সবুজ, সুদর্শন গাছ।

উচ্চতা : ১৪ থেকে ১৭ মিটার।

কাণ্ড : কাঠ মধ্যম কাণ্ড একটু আঁকাবাঁকা

ডালপালা : ছড়ানো, ছাটাই করা যায়

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৫০০০ থেকে ৭০০০ টি।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : মাটির উর্বরতা বাড়ায়। তবে উঁচু ও মাঝারি উঁচু দো-আঁশ মাটি ভাল হয়। রাস্তার পাশে বেশি

লাগানো যায়। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। এলি ফসল হিসেবে ভাল।

ব্যবহার : সস্তা আসবাব, খুটি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা যায়। ছায়া–দায়ী জীবন্ত বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জ্বালানি হিসেবে ভাল। বছরে তিন বার ডাল পাতা কাটা যায়।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৫ টন বায়োমাস থেকে ৫০ থেকে ৭০ কেজি।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি জন্মে। বসতবাড়িতে এবং রাস্তার পাশে জন্মে।

প্রধান মডুল : সড়ক–বাঁধ মডুল , বন বাগান মডুল।

গ্লিরিসিডিয়া

Gliricidia sepium
Leguminosae

বৃক্ষ : দ্রুত বর্ধনশীল গুল্ম/বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৩ থেকে ৪ মিটার।

কাঠ : নরম, ঘন পল্লব রয়েছে।

মৃত্তিকা : অম্লীয়, কম উর্বর জমিতে জন্মে। মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

তাপ চাহিদা : ৮ থেকে ৩৫° সেলসিয়াস।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৪ থেকে ৫ টন বায়োমাস থেকে ৮০ থেকে ১০০ কেজি N./

ব্যবহার : জ্বালানি, ছায়া গাছ, সবুজ সার

এলাকা : প্রায় সারা দেশেই গ্লিরিসিডিয়া গাছ জন্মানো যায়। তবে লোনা ও লাল পাহাড়ি মাটিতে কিছুটা কম হয়।

প্রধান মডুল : সীমানা বন মডুল, সবুজ সার ফসলবিন্যাস।

ডালবার্জিয়া (Dalbergia)

Dalbergia assamica

Leguminosae.

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ২০–২৫ মিটার।

কাঠ : শক্ত।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : মাটির উর্বরতা বাড়ায় প্রধানত উঁচু নিকাশযুক্ত জমিতে জন্মে

ব্যবহার : কাঠ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। চা বাগানে ছায়া প্রদানকারী গাছ (Shade tree) হিসেবে এই গাছ লাগানো যায়।

এলাকা : সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি দেখা যায়। তবে অন্যান্য স্থানে, উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে জন্মে থকে।

প্রধান মডুল : সড়ক বাঁধ মডুল বন বাগান মডুল।

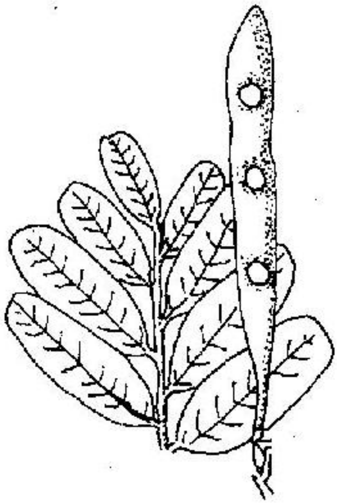

শিশু গাছ (Sisso)

Dalbergia sisso

Leguminosae

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ

উচ্চতা : ২২ থেকে ২৫ মিটার।

কাঠ : শক্ত, হালকা ও গাঢ় দাগযুক্ত।

বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুন।

মৃত্তিকা : বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

ব্যবহার : আসবাব ও খেলাধুলার সরঞ্জাম, জ্বালানি, গো-খাদ্য।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। কিছুটা নিচু জমিতেও জন্মে। বর্তমানে উত্তরাঞ্চলে বেশি লাগানো হচ্ছে।

প্রধান মডুল : সড়ক-বাঁধ মডুল বন বাগান মডুল।

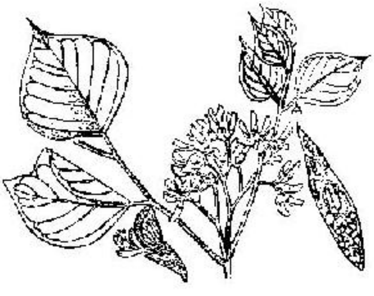

পালিতা মান্দার (Coral tree)

Erythrina orientalis

Leguminosae.

বৃক্ষ : মধ্যমাকার দ্রুত বর্ধনশীল গাছ।

উচ্চতা : ৮ থেকে ১২ মিটার।

কাঠ : নরম কাণ্ড ও শাখায় কাঁটা আছে।

মৃত্তিকা চাহিদা : অনুর্বর জমি জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে, নিচু জমিতে জন্মে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে।

ফুল : খুব সুন্দর লাল থোকা থোকা।

বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুন।

ব্যবহার : জ্বালানি, জীবন্ত বেড়া। সুপারি বাগান ছায়াগাছ হিসেবে লাগানো যায়।

পাতা : গো–খাদ্য, মাটিতে পচে উর্বরতা বাড়ায়।

বংশবিস্তার : ডাল বা শাখা কাটিং।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে নিচু এলাকায় বেশি দেখা যায়।

প্রধান মডুল : কৃষি বন মাঠ ফসল মডুল সীমানা বন মডুল।

খৈয়া বাবলা বা জিলাপি (Khaiya babool)
Pitheallobium dulce
Leguminosae

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের কাটাযুক্ত পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতা ১৫ মিটার পর্যন্ত।

মৃত্তিকা : লোনা ও কর্দমাক্ত মাটি ও বালিয়াড়ি সহ্য করতে পারে

কাঠ : হালকা ও নরম।

ফল : ফলের আকার জিলাপির মতো

বীজ সংগ্রহ : এপ্রিল থেকে মে

ব্যবহার : কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়

এলাকা : দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

প্রধান মডুল : সড়ক বাঁধ মডুল বন বাগান মডুল

মিরাকল গাছ (Miracle tree)
Albizzia falcataria
Leguminosae

বৃক্ষ : বৃহদাকার চির সবুজ বৃক্ষ দ্রুত বাড়ে, ঘন শাখাবিশিষ্ট।

উচ্চতা : ২৫ থেকে ৩০ মিটার

কাঠ : নরম থেকে মধ্যম শক্ত

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে মে

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৪০০ থেকে ১৮০০টি

তাপ চাহিদা : ১৫° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৫ টন বায়োমাস থেকে ৮০ থেকে ১০০ কেজি।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু ও মাঝারি উঁচু দো-আঁশ মাটি ভাল। শিকড় মাটির উপরে বেশি থাকে সহজেই ঝড়ে পড়ে যায়।

ব্যবহার : জ্বালানি, পাল্প ও সাধারণ নির্মাণ ও আসবাব।

এলাকা : সিলেট এলাকায় চা বাগানে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশি দেখা যায়। তবে দেশের অন্যান্য স্থানেও কম-বেশি জন্মে থাকে।

প্রধান মড্যুল : বন বাগান মড্যুল সড়ক-বাঁধ মড্যুল চা বাগান মড্যুল।

মলাকোনা গাছ বা সিলোন সাউ (Ceylon sau)
Albizzia mollucana
Leguminosae

বৃক্ষ : বৃহদাকার, দ্রুত বর্ধনশীল চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ২০ থেকে ২৭ মিটার।

ডালপালা : ঘন পল্লববিশিষ্ট প্রধান শাখাসমূহ মোটা।

কাঠ : মধ্যম গোড়া মোটা।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে মে।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১২০০ থেকে ১৬০০ টি।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : মাটির উর্বরতা বাড়ায়। শিকড় বিস্তার মাটির উপরে বেশি। এজন্য ঝড়ে প্রায়ই পড়ে যায়। অধিক হারে মাটির রস শোষণ করে বলে আশেপাশের গাছ ভাল হয় না।

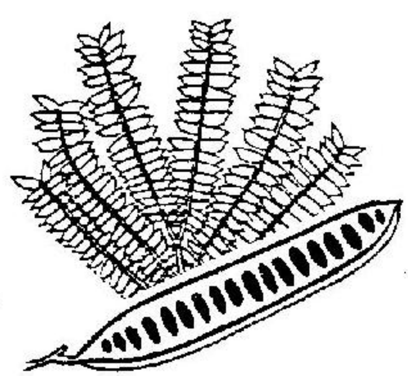

ব্যবহার : মণ্ড জ্বালানি প্রভৃতি ভাল। হালকা নির্মাণ ও আসবাবের কাজে

ব্যবহার করা যায়। চা বাগানে ছায়াগাছ হিসেবে লাগাতে দেখা যায়।

এলাকা : সিলেট ও চট্টগ্রামে বেশি দেখা যায়। দেশের অন্যান্য স্থানেও জন্মে তবে কম।

প্রধান মড্যুল : বন বাগান মড্যুল, চা বাগান মড্যুল, সড়ক–বাঁধ মড্যুল।

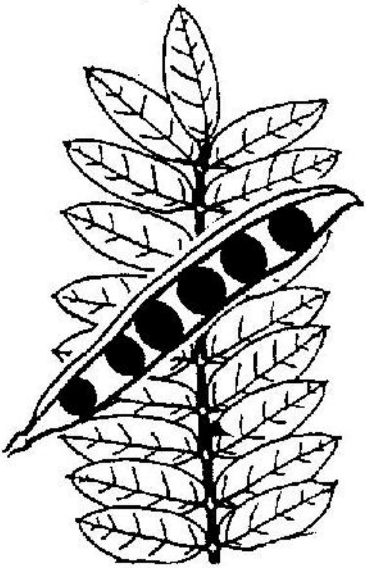

ডেরিস (Derris)

Derris robusta

Leguminosae.

বৃক্ষ : বৃহদাকার সাময়িক পাতাঝরা গাছ, দ্রুত বর্ধনশীল।

উচ্চতা : ২০ থেকে ২৫ মিটার।

কাঠ : মধ্যম কাণ্ড মোটা ও লম্বা, বিস্তৃতি মধ্যম।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে মে

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টি

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু দো–আঁশ মাটিতে ভাল হয়।

ব্যবহার : নির্মাণ ও লাকড়ি। চা বাগানে ছায়াগাছ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : সিলেট ও চট্টগ্রামে বেশি জন্মে। তবে সারা দেশেই কম বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

প্রধান মড্যুল : বন বাগান মড্যুল, সীমানা বন মড্যুল, চা বাগান মড্যুল।

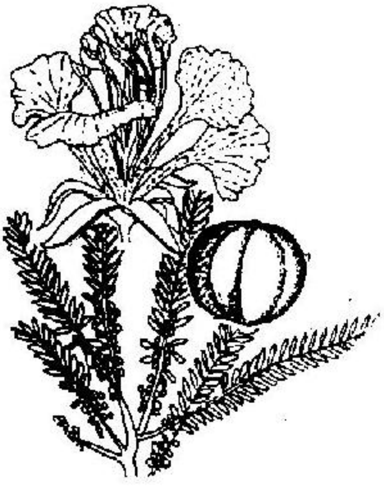

আমলকি (Amlaki)

Emblica offinalis

Euphorbiaceae

বৃক্ষ : ছোট ও মাঝারি আকারের পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৬ থেকে ৮ মিটার।

কাঠ : নরম, লাল বা বাদামি লাল।

ফুল–ফল : খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

বীজ সংগ্রহ : নভেম্বর থেকে জানুয়ারি।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৩৫০০ থেকে ৪০০০ টি।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : মাটির পরিবেশ উন্নত করে অনুর্বর মাটিতে জন্মানো যায়। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না

ব্যবহার : ফল, জ্বালানি ও ঔষধি ব্যবহার।

এলাকা : প্রায় সারা দেশেই জন্মে, তবে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বেশি।

প্রধান মড্যুল : বসত বন মড্যুল, বহুস্তরবিশিষ্ট কৃষিবন মড্যুল, বন বাগান মড্যুল।

বাবলা (Black babool)
Acacia nilotica
Leguminosae.

বৃক্ষ : পাতাঝরা মধ্যম আকৃতি, কাঁটাযুক্ত।

উচ্চতা : ১১ মিটার পর্যন্ত।

বাকল : গাছের বাকল কালচে বাদামি অমসৃণ

ফুল : সোনালি হলদে।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৭,০০০ থেকে ১১,০০০ টি।

ব্যবহার : কৃষি যন্ত্রপাতি (যেমন— গভীর চাকা) তৈরির ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

প্রধান মড্যুল : সড়ক–বাঁধ মড্যুল, কৃষিবন ও মাঠ ফসল মড্যুল।

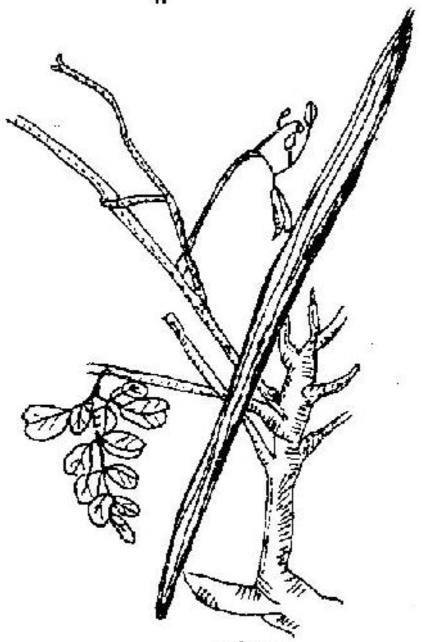

সজিনা (Drum stick)
Moringa oleifera
Moringaceae.

বৃক্ষ : মধ্যমাকার পাতাঝরা বৃক্ষ

উচ্চতা : ১০ মিটার।

কাঠ : নরম।

ফল : সবজি।

ফুল ও পাতা : গো–খাদ্য।

বীজ সংগ্রহ : এপ্রিল থেকে মে

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৮,০০০–৯,০০০ টি

ব্যবহার : সবজি ও জ্বালানি কাঠ।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে তবে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেশি জন্মে।

প্রধান মড্যুল : বসত মড্যুল, সীমানা বন মড্যুল।

কৃষ্ণচূড়া (Pigeon tree)
Delonix regiae
Caesalpineae.

বৃক্ষ : দ্রুত বর্ধনশীল, বৃহদাকার, প্রায় চিরহরিৎ বৃক্ষ

কাঠ : নরম।

মৃত্তিকা : অনুর্বর মাটিতে জন্মে। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর–জানুয়ারি।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৫০০ থেকে ২০০০ টি।

ব্যবহার : সৌন্দর্য গাছ, জ্বালানি।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে উচু পাহাড়ি এলাকায় কম

প্রধান মড্যুল : সড়ক–বাঁধ মড্যুল, মাঠ ও জন সমাগম স্থান।

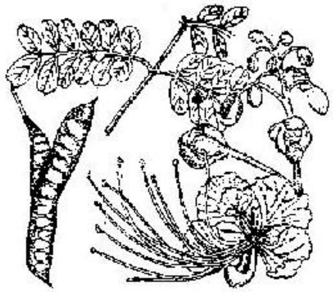

শিলকড়ই (Shil kuroi)
Albizzia procera
Leguminosae.

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ২৫ মিটার পর্যন্ত।

বাকল : হলদে সাদা মসৃণ।

ফল ও পাতা : গো–খাদ্য।

কাঠ : শক্ত, বর্ণ বাদামি.

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৮,০০০ থেকে ১৩,০০০ টি

ব্যবহার : নির্মাণ কাঠ আসবাব ও জ্বালানি।

এলাকা : দেশের পূর্বাঞ্চলে ও পাহাড়ি এলাকায় বেশি জন্মে। তবে মধ্যাঞ্চলে ও কিছু কিছু জন্মে থাকে।

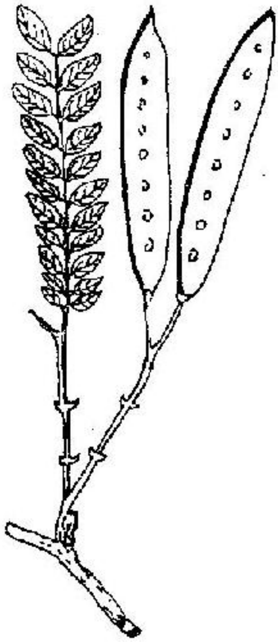

প্রধান মন্ডল : বড় বৃক্ষ সীমানা ও মাঠ ফসল নতুন বহুস্তরবিশিষ্ট কৃষি বন মন্ডল।

তেঁতুল

তেঁতুল (Tamarind)
Tamarindus indica
Leguminosae

বৃক্ষ : চিরহরিৎ বৃক্ষ।
উচ্চতা : ২০ থেকে ২৫ মিটার।
বাকল : বাদামি অমসৃণ।
কাঠ : লালচে বাদামি শক্ত
ফল : টক।
বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।
বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৮০০ টি।
মৃত্তিকা : উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি, মধ্যম বুনট।
ব্যবহার : ফল, কাঠ ও জ্বালানি ব্যবহার, নির্মাণ ও আসবাব কাঠ।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে বেশি জন্মে।
প্রধান মন্ডল : বসত মন্ডল, সীমানা বন মন্ডল।

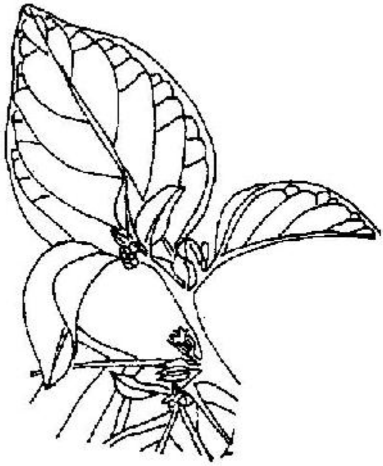

পানি মান্দার (Alder)
Erythrina fusca
Leguminosae (Papilionoidae)

বৃক্ষ : ক্ষুদ্র থেকে মধ্যমাকার বৃক্ষ, পাতাঝরা।
উচ্চতা : ৬ থেকে ৮ মিটার।
কান্ড : কাঁটা যুক্ত।
কাঠ : নরম।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনুর্বর, নিচু স্থানেও জন্মে। জলাবদ্ধতা কিছুটা সহ্য করতে পারে।
বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুন
ব্যবহার : জীবন্ত বেড়া, জ্বালানি।
পাতা : গো–খাদ্য।
বংশ বিস্তার : শাখা।
এলাকা : বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে বেশি জন্মে।
প্রধান মন্ডল : সীমানা বন মন্ডল, বসত মন্ডল, কৃষি বন মাটি ফসল মন্ডল।

বিলিম্বি (Blimbing)
Averhoa bilimbi
Oxalidaceae

বৃক্ষ	:	ছোট গুল্মজাতীয় গাছ।
উচ্চতা	:	৩ থেকে ৫ মিটার।
কাণ্ড	:	খাটো, গোড়া থেকে শাখা বের হয়।
ফল	:	খাওয়া হয়
মৃত্তিকা	:	বেলে ও বেলে-দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।
বীজ সংগ্রহ	:	নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর।
কাঠ	:	নরম, কাঠ হিসেবে ব্যবহার নাই।
পাতা	:	ঔষধি ব্যবহার আছে।
এলাকা	:	ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায় ভাল জন্মে।
প্রধান মণ্ডল	:	বসত মণ্ডল, বহু স্তরবিশিষ্ট কৃষিবন মণ্ডল।

পলাশ বা কিংশুক (Bastard teak)

Butea monosperma

Leguminosae.

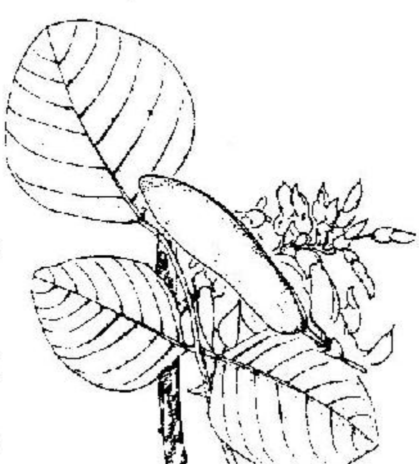

বৃক্ষ	:	মাঝারি আকারের পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৬ থেকে ৮ মিটার
কাণ্ড	:	আঁকাবাঁকা
ফুল	:	কমলা রঙের বড় ফুল।
কাঠ	:	নরম, হালকা বাদামি থেকে সাদা।
বীজ সংগ্রহ	:	জুন থেকে জুলাই।
বীজের ওজন	:	প্রতি কেজিতে ৯,০০০ থেকে ১৫,০০০ টি।
ব্যবহার	:	সুন্দর গাছ হালকা কাঠ জ্বালানি।
এলাকা	:	দেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে বেশি জন্মে
প্রধান মণ্ডল	:	বসত মণ্ডল, সীমানা বন মণ্ডল বন বাগান সীমানা মণ্ডল (মাঠসহ)

শ্বেতখয়ের বা গয়াবাবলা

Alangium salvifolium

Leguminosae (Mimosoideae)

বৃক্ষ	:	মধ্যম থেকে বৃহদাকার দ্রুত বর্ধনশীল গাছ।
উচ্চতা	:	২০ থেকে ২২ মিটার।
ফুল	:	হালকা হলদে ও ঘিয়ে, মার্চ থেকে জুলাই সময়ে ফোটে।
কাণ্ড	:	কালচে, কিছু কিছু কাঁটা থাকে।

মৃত্তিকা : মাটির উর্বরতা বাড়ায়। উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে জন্মে।

বীজ সংগ্রহ : নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি।

ব্যবহার : গাড়ির চাকা ও নির্মাণ। বাকল থেকে ট্যানিন তৈরি হয়। কৃষি যন্ত্রপাতি ও নৌকা তৈরি। খয়েরও তৈরি করা যায়।

এলাকা : দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খয়ের বাবলা গাছের সাথে বেশি জন্মে।

প্রধান মডেল : কৃষি বন ও মাঠ ফসল মডেল, সড়ক-বাঁধ মডেল।

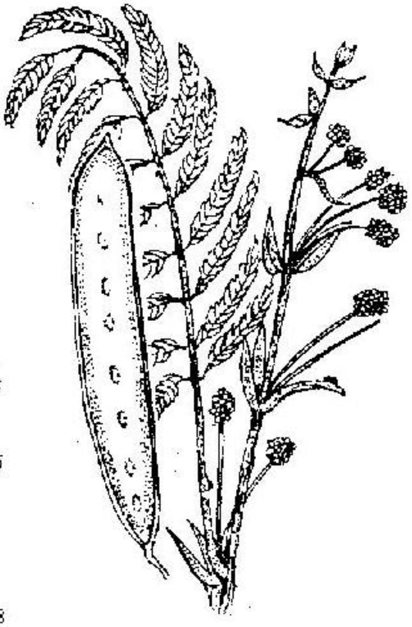

চাকুয়া কড়ই (Chakua koroi) **শ্যাম সুন্দর**
Albizia chinensis
Leguminosae. (Mimosideae)

বৃক্ষ : বৃহদাকার দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ।

উচ্চতা : ২৫ থেকে ৩০ মিটার।

ফুল : মে থেকে আগস্ট।

বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর থেকে মার্চ।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৩৫,০০০ থেকে ৪৫,০০০ টি।

মৃত্তিকা : অম্ল মাটি, জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

বংশবিস্তার : বীজ কাটিং ও স্ট্যাম্প।

ব্যবহার : জ্বালানি প্যাকেজিং কাঠ।

এলাকা : বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও পাহাড়ি অঞ্চলে (চা বাগান) বেশি পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও দিনাজপুর এলাকায়ও জন্মাতে দেখা যায়।

প্রধান মডেল : বন মডেল, সীমানা বন মডেল।

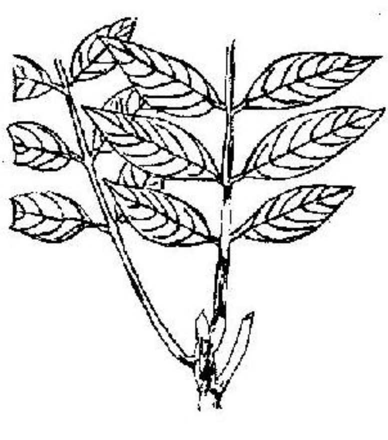

কড়ই (Kala siris)
Albizia odoratissima
Leguminosae.

বৃক্ষ : বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ২২ থেকে ২৫ মিটার।

কাঠ : নরম।

মৃত্তিকা : উর্বরতা বাড়ায়। তবে পানি চাহিদা বেশি, উঁচু বেলে মাটিতে জন্মে

ফুল : মার্চ থেকে এপ্রিল।
ডালপালা : মধ্যম।
ব্যবহার : চা বাগানে ছায়াগাছ ও জ্বালানি।
এলাকা : সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এলাকাসহ সারা দেশেই জন্মে।
প্রধান মড্যুল : বন–বাগান মড্যুল, বসত মড্যুল, চা বাগান (মড্যুল)।

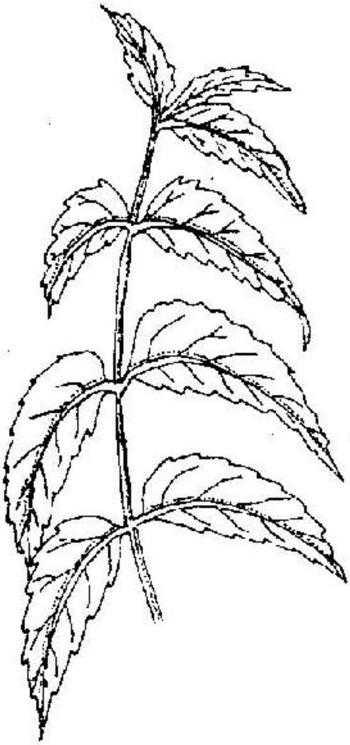

ঘোড়া নিম (Ghora nim) **বা পাহাড়ি নিম**
Melia azadirach
Meliaceae.
বৃক্ষ : নিম গোত্রের পাতাঝরা বৃক্ষ, দ্রুত বর্ধনশীল.
উচ্চতা : ২০ থেকে ২৭ মিটার।
কাঠ : নরম ও মধ্যম নরম।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু ও মাঝারি উঁচু দোআঁশ মধ্যম উর্বর মাটি।
বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৯০ থেকে ১২০ টি।
ব্যবহার : নির্মাণ, ঔষধি ও জ্বালানি কাঠ।
এলাকা : প্রায় সারা দেশেই জন্মে।
প্রধান মড্যুল : সামাজিক বন, সড়ক–বাঁধ বন মড্যুল।

চালা বা উদাল (Chala)
Sterculia villosa
Sterculiaceae.
বৃক্ষ : মধ্যমাকারের পাতাঝরা বৃক্ষ, দ্রুত বর্ধনশীল।
উচ্চতা : ১১ থেকে ১৬ মিটার।
ডালপালা : ছাঁটাই করা যায়।
কাঠ : নরম, হালকা।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : হালকা মাটিতে জন্মে। পাতাঝরা বনে ভাল জন্মে। শুষ্ক জমিতেও জন্মাতে পারে।
বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুন।
ব্যবহার : জ্বালানি কাঠ ও দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
এলাকা : সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইলের মধুপুরে বেশি জন্মে

এছাড়া ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরসহ সারা দেশেই জন্মে থাকে।
প্রধান মন্ডল : সামাজিক মিশ্রবন পাহাড়ি ও লালমাটির সীমানা বন মন্ডল।

মহুয়া (Mahua)
Madhuca indica
Magnoliaceae.

বৃক্ষ : মধ্যম থেকে বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ

উচ্চতা : ১৫ থেকে ২২ মিটার উঁচু।

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : মাঝারি উঁচু ও উঁচুর গভীর প্রশম মাটি মধ্যম উর্বর।

বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।

ব্যবহার : হালকা নির্মাণ, ভেষজ ব্যবহার ও জ্বালানি কাঠ

এলাকা : বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শালবনে বিক্ষিপ্ত ভাবে জন্মে।

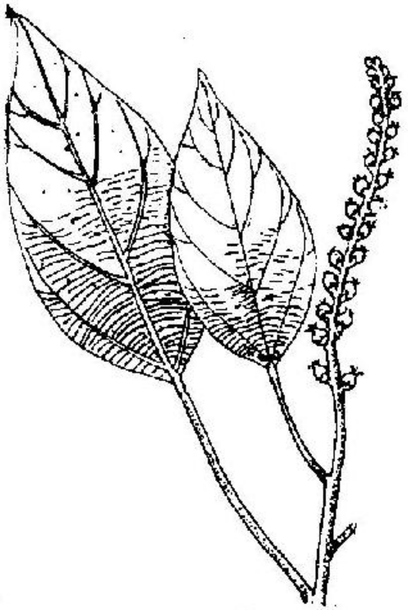

কামেলা বা সুন্দরী (Kamela)
Mallotus philippensis
Euphoriaceae.

বৃক্ষ : ছোট গাছ, চিরসবুজ প্রকৃতি, দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

উচ্চতা : ৩–৫ মিটার।

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুন।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মে। সিক্ত ও শুষ্ক মাটি এ গাছের জন্য অসুবিধা নাই। তবে বেলে দো–আঁশ মাটি ভাল। আংশিক ছায়ায় বেঁচে থাকতে পারে। এই গাছ খরা প্রতিরোধক।

ব্যবহার : কাঠ কৃষি যন্ত্রপাতির হাতল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফল থেকে কামেলা বা সিন্দুরী রঙ তৈরি করা যায়। এই রঙ দিয়ে সিল্ক কাপড়ে রঙ দেয়া হয়।

এলাকা : সকল প্রাকৃতিক বন ও শালবনে পাওয়া যায় এছাড়া গ্রামীণ

পরিবেশে সারা দেশেই জন্মাতে দেখা যায়।

অরা বা শয়লা (Shoaila)
Sonneratia caseolaris, S. aside
Sonneratiaceae.

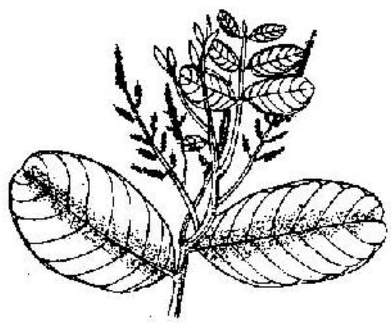

বৃক্ষ : ছোট অনুচ্চ গাছ। চির সবুজ।

উচ্চতা : ৩ থেকে ৫ মিটার।

কাঠ : নরম।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। দেশের অভ্যন্তরে ও জোয়ার ভাটা এলাকায় বাড়িতে জন্মে। পলি মাটিতে ভাল জন্মে।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।

ব্যবহার : ফল টক স্বাদযুক্ত, খাওয়া যায়। জ্বালানি হিসেবে এর ব্যবহার বেশি।

এলাকা : বরিশাল, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলায় বেশি জন্মে। তবে সারা দেশেই বিক্ষিপ্তভাবে ২-৪টি গাছ দেখা যায়।

কুসুম (Lac tree)
Scheichera oleosa, S. trijuga
Sapindaceae.

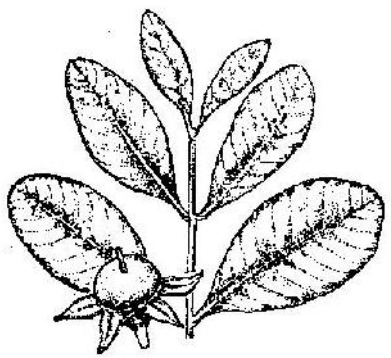

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতাঝরা উদ্ভিদ।

উচ্চতা : ২০ থেকে ২৫ মিটার।

কাঠ : শক্ত।

বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : শুষ্ক ও সুনিষ্কাশিত মাটিতে জন্মে। বেলে দো-আঁশ ও দো আঁশ মাটি উত্তম।

ব্যবহার : কাঠ নির্মাণ কাজ ও যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। একপ্রকার লাক্ষা কীট চাষে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : দেশের শালবন ও মধুপুর এলাকায় বেশি জন্মাতে দেখা যায়। দেশের অন্যান্য এলাকায়ও কমবেশি জন্মাতে দেখা যায়।

তুঁত (Mulberry)
Morus indica
Moraceae.

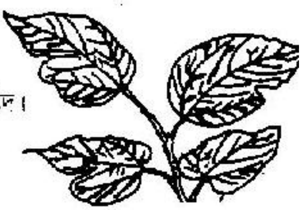

বৃক্ষ : ছোট ও মধ্যম আকারের চিরসবুজ উদ্ভিদ।

উচ্চতা : ৩ থেকে ৫ মিটার।

কাঠ : মধ্যম ও শক্ত।

বংশবিস্তার : বীজ ও কলম।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। ছায়াতেও জন্মে। তবে দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। বসতবাড়ি, রাস্তার পাশে ও কৃষি জমিতে জন্মে।

ব্যবহার : কাঠ দিয়ে ব্যাডমিন্টন ও টেনিসের র‍্যাকেট বানানো হয়। কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়। আসবাবপত্রসহ বহু ধরনের সরঞ্জাম তৈরি করা যায়।

এলাকা : রেশম শিল্প এলাকায় এর বাগান করা হয়। এছাড়া সারা দেশেই রাস্তার পাশে জন্মানো যায়।

অর্জুন (White murdah)
Terminalia arjuna
Combretaceae.

বৃক্ষ : মধ্যম থেকে বৃহদাকার পত্রঝরা গাছ।

বাকল : মোটা, মসৃন, চল্টা উঠে

উচ্চতা : ১৫ থেকে ২২ মিটার।

বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুন।

বীজের ওজন : ৭০০ থেকে ৮০০ টি

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : নদ-নদী বিল হাওড়ের ধারে পলি মাটিতে ভাল জন্মে। মাটির বুনট দো-আঁশ হলে উত্তম। আংশিক ছায়াতে জন্মে। শিকড় অগভীর। সাময়িক জলাবদ্ধতায় টিকে থাকতে পারে।

ব্যবহার : ঔষধি গুণ আছে। কাঠ গাড়ি ও সরঞ্জামাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নির্মাণ কাজ ও খুঁটিতেও ব্যবহার করা যায়। অর্জুনের পাতা তসর রেশম পোকার খাদ্য।

এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলাতেই রাস্তার পাশে ও বসতবাড়িতে অর্জুন গাছ দেখা যায়।

বোতল ব্রাশ (Battle brush)
Callistemon lanceolatus
Myrtaceae.

বৃক্ষ : ছোট আকারের চিরসবুজ সুদর্শন গাছ।
উচ্চতা : ৩ থেকে ৫ মিটার।
কাঠ : নরম।
বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল মাস।
ব্যবহার : হালকা নির্মাণ কাঠ জ্বালানি সৌন্দর্য গাছ।
এলাকা : প্রায় সারা দেশেই উঁচু জমিতে জন্মে।

নিম (Margosa tree)
Azadirachta indica
Meliaceae.

বৃক্ষ : মধ্যম থেকে বৃহদাকার চিরসবুজ গাছ
উচ্চতা : ১৫ থেকে ২৫ মিটার।
কাঠ : শক্ত।
বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৩০০০ থেকে ৩৫০০ টি
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সিক্ত মাটিতে ভাল জন্মে তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বেলে মাটিতে বা পানি তল গভীর হলে সে মাটিতে নিম গাছ ভাল জন্মে।
ব্যবহার : ঔষধি গুণ আছে। নির্মাণ ও সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
এলাকা : দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সারা দেশেই বসতবাড়িতে ও রাস্তার পাশে নিম গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

হরিতকি (Chebulic myrobalan)
Terminalia chebula
Combretaceae.

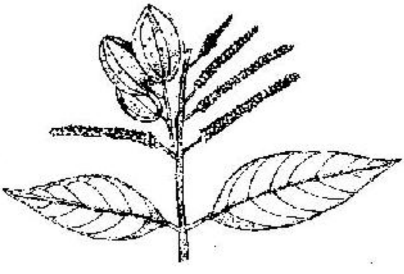

বৃক্ষ : মধ্যম থেকে বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা : ২৮ থেকে ৩২ মিটার।
কাঠ : খুব শক্ত, গাঢ় বেগুনি।
বীজ সংগ্রহ : জানুয়ারি থেকে মার্চ।
বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৪০ থেকে ২২৫ ফল।
ব্যবহার : আসবাব বা কৃষি যন্ত্রপাতি।
এলাকা : পাহাড়ি এলাকাসহ প্রায় সকল উঁচু জমিতেই জন্মে।
প্রধান মণ্ডল : বসত বন মণ্ডল।

বহেরা (Belleric myrobalan)
Terminalia bellirica
Combraceae.

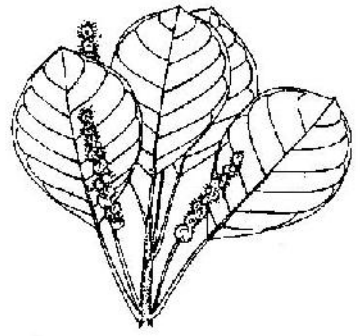

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার পত্রঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৩০ থেকে ৪০ মিটার।
বাকল	:	নীলাভ ধূসর।
ডালপালা	:	কম, গাছের আগায় পাতা থাকে।
পাতা	:	পাতার বোটা লম্বা
কাঠ	:	নরম, হলদে পানিতে পঁচে না।
বীজ সংগ্রহ	:	নভেম্বর–ডিসেম্বর।
বীজের ওজন	:	প্রতি কেজিতে ৪৫০–৪৫০ টি।
ব্যবহার	:	ঔষধ প্যাকিং বাক্স, পাতা গবাদির খাদ্য।
এলাকা	:	গজারী বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে। তবে সারা দেশেই পাওয়া যায়।

কুমারীবুড়া/নিম পিটালী (Kumaribura/Nim pitali)
Mallotus albus
Euphorbiaceae.

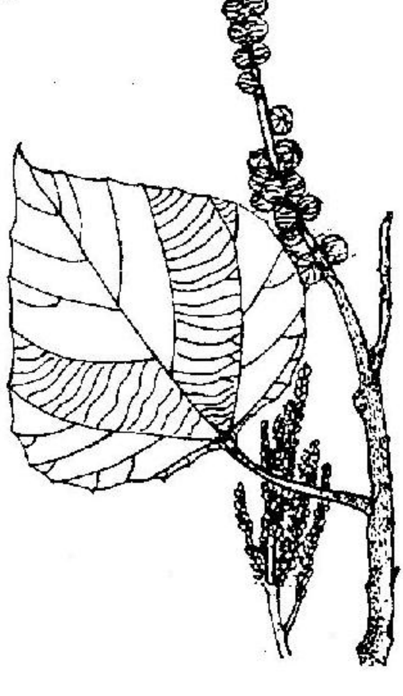

বৃক্ষ	:	ছোট ও মধ্যম আকারের গাছ। চিরসবুজ প্রকৃতির দ্রুত বাড়ে।
উচ্চতা	:	৫ থেকে ১২ মিটার।
কাঠ	:	নরম ও মধ্যম শক্ত
বীজ সংগ্রহ	:	আগস্ট–সেপ্টেম্বর।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ	:	গভীর মাটিতে ভাল জন্মে। সিক্ত মাটিতে ভাল হয়। তবে মাটি নিকাশযুক্ত হতে হয়। গাছ আংশিক ছায়াতেও জন্মাতে পারে। মাটির বুনট বেলে দো–আঁশ হলে ভাল
ব্যবহার	:	জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় বেশি। ঔষধি গুণ আছে। কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়

এলাকা	: পাহাড়ি বন শাল বন, সিক্ত মাটি ও বসতবাড়ির ছায়ায় সারা দেশেই জন্মাতে দেখা যায়।

দেবদারু (Mast tree)
Polyalthia longifolia
Annonaceae.

বৃক্ষ	: চিরসবুজ বৃক্ষ, সুদর্শন।
উচ্চতা	: ১০ থেকে ২০ মিটার (জাতভেদে)
ডালপালা	: ঘন তবে বিস্তৃতি কম।
কাঠ	: হালকা, নরম।
বীজ সংগ্রহ	: জুলাই থেকে আগস্ট।
ব্যবহার	: প্যাকিং বাক্স ও দিয়াশলাইয়ের কাঠি।
এলাকা	: সৌন্দর্য স্থান, নিম্নাঞ্চলে জন্মে।
প্রধান মন্ডল	: সৌন্দর্য স্থান, সড়ক-বাঁধ ও সামাজিক বন মন্ডলসমূহ।

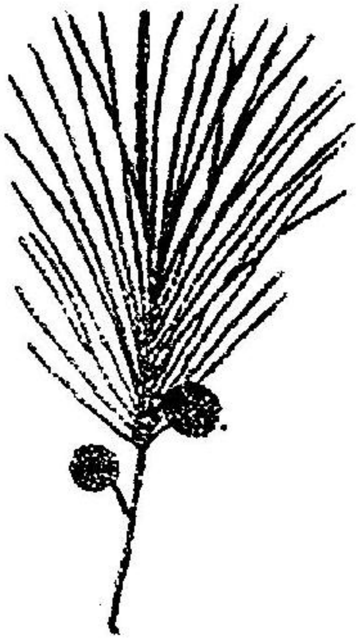

ঝাউ (Jhau)
Casuarina equisetifolia
Casuarinaceae.

বৃক্ষ	: বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ২৫ থেকে ৩০ মিটার উঁচু কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ সুদর্শন গাছ।
কাঠ	: শক্ত ফেটে যায়।
বীজ সংগ্রহ	: মে থেকে জুন।
বীজের ওজন	: প্রতি কেজিতে ৭ থেকে ৮ টি।
ব্যবহার	: হালকা কাঠ, সুন্দর গাছ, জ্বালানি।
এলাকা	: দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বেশি জন্মে

শেফালি (Shefali) বা শিউলি (Sheoli)
Nyctanthesa arbortristua
Oleaceae.

বৃক্ষ	: মধ্যমাকার পাতাঝরা গাছ।
উচ্চতা	: ৪ থেকে ৫ মিটার।
বাকল	: লোমযুক্ত পাতা খসখসে।

কাণ্ড : প্রায় চতুষ্কোণ।
বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।
বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১১০০০ থেকে ১৩০০০ টি।
ব্যবহার : ফুল, জ্বালানি।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মে।

কদম (Kadam)
Anthocephallus cadamba
Rubiaceae.

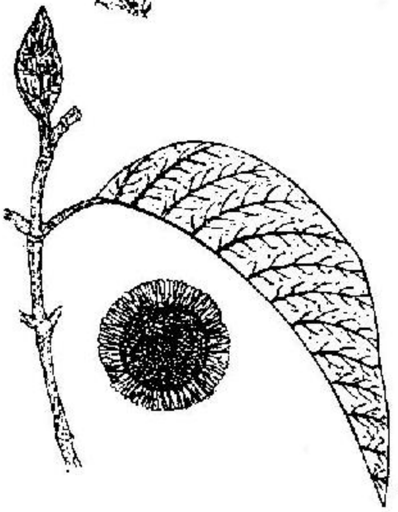

বৃক্ষ : পাতাঝরা বৃহদাকার বৃক্ষ। ফুল সুন্দর, হলদে
উচ্চতা : ১৮ থেকে ২২ মিটার।
কাঠ : নরম, শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৯ থেকে ১৫ লক্ষ।
ব্যবহার : মধ্যম শক্ত কাঠ, ফুল জ্বালানি।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মে।

শিমুল (Silk cotton tree)
Bombax ceiba
Bombacaceae.

বৃক্ষ : বড় উঁচু পাতাঝরা গাছ।
উচ্চতা : ১২ থেকে ১৮ মিটার।
কাণ্ড : গুড়ি খুব মোটা।
ফুল : বড় লাল।
ডালপালা : বিস্তৃত।
বাকল : মসৃণ, ধূসর।
কাঠ : নরম, প্যাকিং বাক্সে ব্যবহৃত হয়।
বীজ সংগ্রহ : এপ্রিল।
বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ২০০০০ থেকে ৪০০০০ টি।
ব্যবহার : হালকা ও নির্মাণ ও তুলা জ্বালানি।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মে, তবে উত্তরাঞ্চলে বেশি।

কানাইডিঙ্গি বা খোনা (Midnight horror)
Oroxylum indicum
Bignoniaceae

বৃক্ষ : ছোট গাছ, চিরসবুজ।
উচ্চতা : ৩ থেকে ৫ মিটার।
ডালপালা : বহির্মুখী ছড়ানো।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। তবে সুনিষ্কাশিত জমিতে ভাল জন্মে। প্রচণ্ড সূর্যালোকে বৃদ্ধি দ্রুত হয়।
বীজ সংগ্রহ : ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ।
ব্যবহার : কাঠ অস্থায়ী নির্মাণে ব্যবহার করা যায়। চট্টগ্রাম এলাকায় এর কাঁচা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।
এলাকা : মিশ্র প্রাকৃতিক বনের শুষ্ক স্থানে জন্মানো যায়। পাহাড়ি বন ও শালবনে জন্মে। ময়মনসিংহ, সিলেট ও কুমিল্লা এলাকায়ও বেশি পাওয়া যায়।

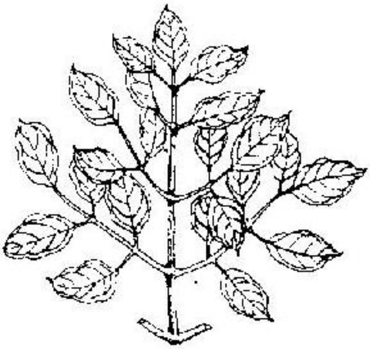

বকুল (Medlar)
Minusops elene
Sapotaceae

বৃক্ষ : মধ্যম থেকে বড় চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা : ১২ থেকে ১৫ মিটার।
কাঠ : শক্ত, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়।
ফুল : এপ্রিল থেকে জুন।
ডালপালা : বিস্তৃত।
বীজ সংগ্রহ : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।
মৃত্তিকা : সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। হালকা ছায়াতেও জন্মাতে পারে।
ব্যবহার : ঔষধি গুণ আছে। পাকা ফল খাওয়া যায়। ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ভাল।
এলাকা : বাহারী গাছ ও সুগন্ধি ফুলের জন্য সারা দেশেই পাওয়া যায়।

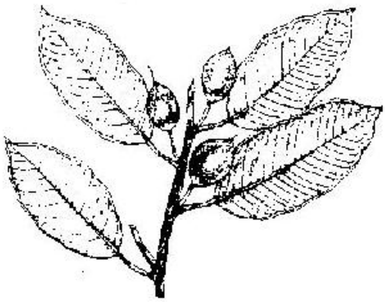

পেয়ারা (Guava)
Psidium guajava
Myrtaceae

বৃক্ষ : ছোট থেকে মধ্যম চিরহরিৎ বৃক্ষ
উচ্চতা : ৫ থেকে ৮ মিটার।
কাঠ : শক্ত, ভারি ও টেকসই।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উর্বর দো-আঁশ উঁচু জমি।
বীজ সংগ্রহ : জুলাই থেকে আগস্ট।
বীজের ওজন : প্রতি ফলে ২০০ থেকে ৫০০টি।
ব্যবহার : ফল, হালকা কাঠ, জ্বালানি।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মে, তবে ইদানিং পাহাড়ি এলাকায় চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
প্রধান মডেল : বহুস্তর কৃষি বন, আন্তঃবৃক্ষ।

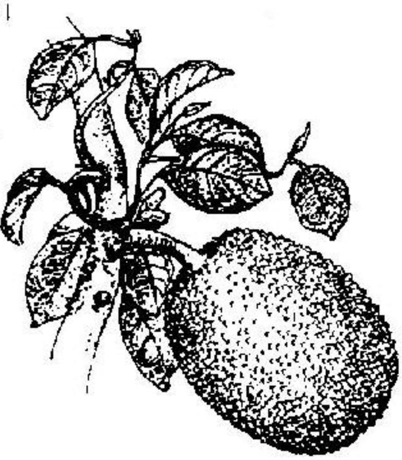

কাঁঠাল (Jack Fruit)
Atrocarpus heterophyllus

বৃক্ষ : বৃহদাকার চিরহরিৎ বৃক্ষ।
উচ্চতা : ১৫ থেকে ২০ মিটার।
কাঠ : হলদে শক্ত।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু লাল মাটি, উর্বর দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ।
বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুলাই।
বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৪০ থেকে ৫০টি।
ব্যবহার : নির্মাণ, ফল ও পাতা ছাগলের খাদ্য।
এলাকা : ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহের লালমাটি এলাকা।

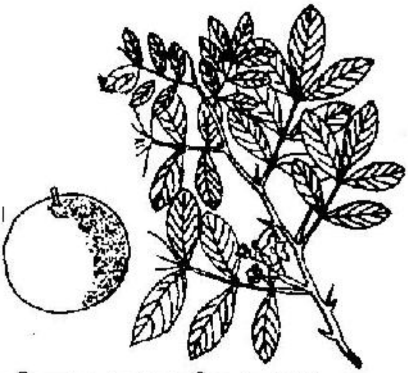

কদবেল (Wood apple)
Feronia lemonia
Rutaceae

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের পাতাঝরা গাছ।
উচ্চতা : ৭ থেকে ১৩ মিটার।
কাঠ : শক্ত।
ফুল : ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ
বীজ সংগ্রহ : অক্টোবর থেকে নভেম্বর।
মৃত্তিকা : অনেক মাটিতেই জন্মে উঁচু জমি ভাল। তবে সাময়িক জলাবদ্ধতা ও কাদামাটি সহ্য করতে পারে।
ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। কাঠ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে রাজশাহী ও কুষ্টিয়াসহ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভাল জন্মে।

সফেদা (Sapadilla or Sapota)

Achras sapota

Sapotaceae

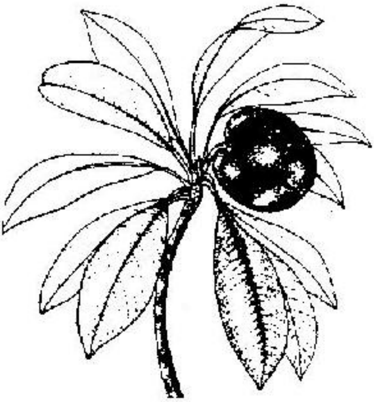

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের চিরসবুজ গাছ।
উচ্চতা : ৭ থেকে ১২ মিটার।
কাঠ : নরম।
পাতা : ঘন পল্লব, বিস্তৃতি বেশি।
কাণ্ড : সোজা নয়, গোড়া থেকে প্রশাখা বের হয়।
বংশ বিস্তার : বীজ ও জোড় কলম।
ফুল : মে থেকে জুন।
বীজ সংগ্রহ : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।
মৃত্তিকা : দো-আঁশ মাটিতে জন্মে। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। পানির ধারে লাগানো যায়।
ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। গাছের কষ গাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি ভাল।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে যশোর খুলনা ও সাতক্ষীরা এলাকায় বেশি জন্মে।

তাল (Palmae)

Borassus flabelli forpis

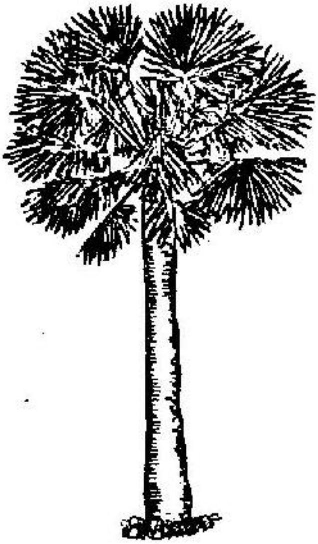

বৃক্ষ : শাখা-প্রশাখাবিহীন উঁচু শক্ত গাছ।
উচ্চতা : ২২ মিটার পর্যন্ত।
কাঠ : সার অংশ খুব শক্ত।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি। পলি ও এঁটেল মাটি।
বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
ব্যবহার : নির্মাণ কাঠ ও কারু কাজ।
এলাকা : বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, যশোরসহ অন্যান্য উঁচু সমভূমি।

বেল (Wood Apple)

Aegle marmelos

Rutaceae

বৃক্ষ : মাঝারি উচ্চতা পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা : ৭ থেকে ৯ মিটার

পাতা : পাতার গোড়ায় কাঁটা আছে।

কাঠ : হলদে সাদা, মধ্যম শক্ত।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু উর্বর গভীর মাটি, বিক্রিয়া প্রশম।

বীজ সংগ্রহ : এপ্রিল–মে।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৫০০০ থেকে ৬০০০টি।

ব্যবহার : ফল, নির্মাণ কাঠ, জ্বালানি।

এলাকা : প্রায় সারা দেশেই জন্মে তবে দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে বেশি জন্মে।

খেজুর (Date palm)
Phoenix sylvestris
Palmae.

বৃক্ষ : প্রশাখাবিহীন সুদর্শন, গাছ কষ্টসহিষ্ণু।

উচ্চতা : ১২ থেকে ১৫ মিটার।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু ও মাঝারি উঁচু উর্বর ও মধ্যম উর্বর দো-আঁশ মাটি।

বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুন।

ব্যবহার : ফল, রস, গুড়, জ্বালানি।

এলাকা : বৃহত্তর যশোর, বরিশাল, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া।

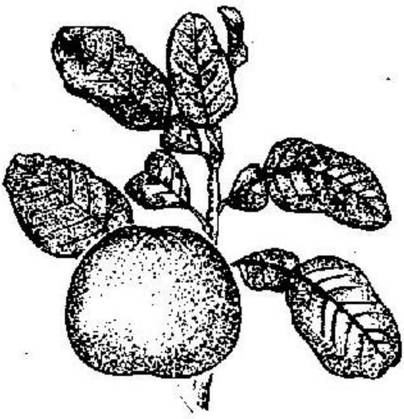

জাম্বুরা (Pumello)
Citrus grandis
Rutaceae

বৃক্ষ : চিরহরিৎ মধ্যমাকার গাছ।

উচ্চতা : ৯ থেকে ১২ মিটার।

কাঠ : নরম।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু অম্লীয় জমি, উর্বর মাটি, গভীর, সুনিকাশযুক্ত।

বীজ সংগ্রহ : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।

ব্যবহার : ফল, হালকা কাঠ ও জ্বালানি।

এলাকা : প্রায় সারা দেশেই জন্মে তবে সিলেট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশি।

আমড়া (Hogplum)
Spondiua pinnata
Anacardiaceae.

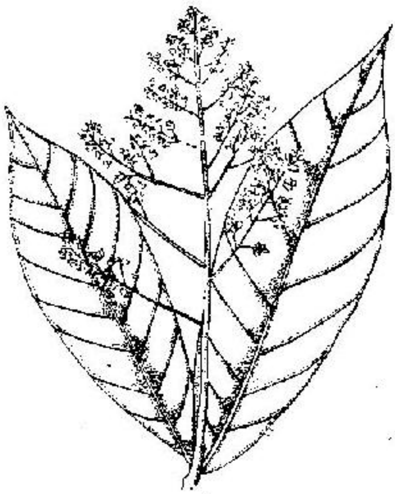

বৃক্ষ : মাঝারি আকারের পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা : ৫ থেকে ৬ মিটার উঁচু
কাঠ : নরম।
মৃত্তিকা : লোনা জোয়ার বিধৌত এলাকাসহ উঁচু ও মাঝারি উঁচু উর্বর মাটি।
বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
ব্যবহার : ফল ও জ্বালানি।
এলাকা : বৃহত্তর বরিশাল ও তৎসংলগ্ন এলাকা।

লটকন (Anatto dye plant)
Bixaceae.

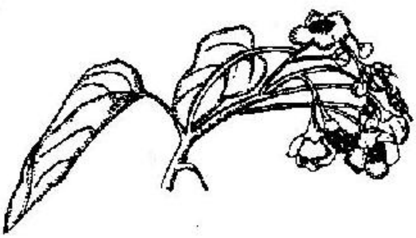

বৃক্ষ : ছোট ও মধ্যম আকারের গুল্ম বা বৃক্ষ।
উচ্চতা : ৪ থেকে ৫ মিটার
ফুল : জুলাই থেকে অক্টোবর।
বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
মৃত্তিকা : বেলে দো-আঁশ মাটিতে জন্মানো যায়।
ব্যবহার : রঙ উৎপাদিত হয়, ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
এলাকা : প্রায় সারা দেশেই জন্মে থাকে।

লিচু (Litchi)
Litchi chinensis
Sapindaceac.

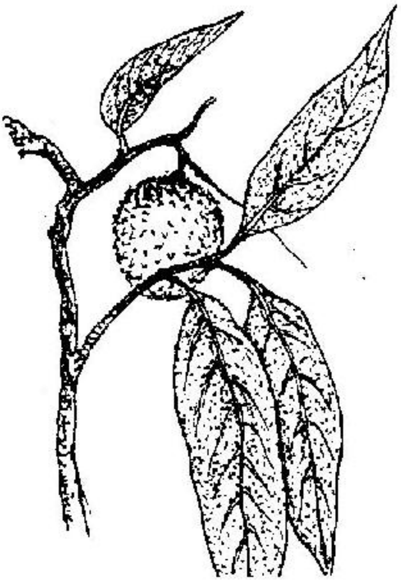

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ।
উচ্চতা : ১৩ থেকে ১৫ মিটার।
কাঠ : মধ্যম শক্ত, লাল।
মৃত্তিকা : উঁচু উর্বর গভীর দো-আঁশ উর্বর মাটি জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।
বীজ সংগ্রহ : মে থেকে জুন।
ব্যবহার : ফল হাল্কা নির্মাণ কাঠ ও জ্বালানি।

এলাকা : রাজশাহী, দিনাজপুর এলাকা এবং কিশোরগঞ্জ।

জাম (Black berry)
Eugenia jambolana
Myrtaceae.

বৃক্ষ : বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা : ২৫–২৭ মিটার।
কাঠ : খুব শক্ত।
পাতা : গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
ডালপালা : মধ্যম বিস্তৃত, নরম।
ফুল : এপ্রিল থেকে মে।
বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।
মৃত্তিকা : অনেক ধরনের মাটিতেই জন্মে। তবে পলি ও দো-আঁশ মাটি ভাল। জাত ভেদে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।
ব্যবহার : ফল খাওয়া হয়। কাঠ দ্বারা নির্মাণ ও আসবাব তৈরি করা যায়।
এলাকা : সারা দেশে জাম গাছ লাগানো যায়। পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ি জাম বেশি দেখা যায়।

কাজুবাদাম (Cashew nut)
Anacardium occidentale
Anacardiaceae.

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের গাছ, চিরসবুজ ধরনের।
কাণ্ড : খাটো, মোটা।
ডালপালা : ছড়ানো ছাঁটাই করা যায়। পাতা বেশ বড়
উচ্চতা : ৫ থেকে ৭ মিটার।
কাঠ : মধ্যম
ফল : কিডনির মতো।
বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।
মৃত্তিকা : বেলে-দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়
ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। কাঠ দ্বারা নিম্নমানের আসবাব তৈরি হয়।

এলাকা : সারা দেশেই দেখতে পাওয়া যায়।

ডেউয়া বা ডেওফল

Artocarpus lacucha

Moraceae.

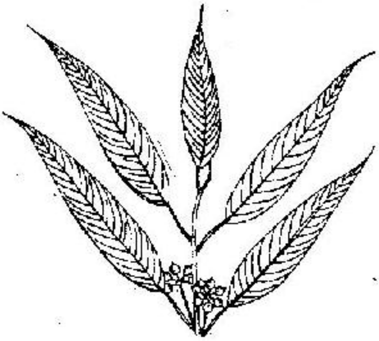

বৃক্ষ : বহদাকার পাতাঝরা গাছ।

উচ্চতা : ২২ থেকে ২৪মিটার।

কাঠ : শক্ত।

ফুল : ফেব্রুয়ারি থেকে মে।

ডালপালা : ছড়ানো।

মৃত্তিকা : ভিজা মাটিতে জন্মে। চারা অবস্থায় ছয়াতে ক্ষতি হয় না।

ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। পাতা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কাঠ নির্মাণ কাজ ও সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : সিলেট, চট্টগ্রামে বনসহ সারা দেশেই সামাজিক বন বা বসত বনে জন্মানো যায়।

জলপাই (Olive)

Elaeocarpus robustus

Elaeocarpaceae.

বৃক্ষ : চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ১০ থেকে ১৮ মিটার।

কাঠ : নরম।

ফুল : মে থেকে জুন।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ৫০০ থেকে ৮০০ টি।

বীজ সংগ্রহ : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর।

ডালপালা : বিস্তৃত।

মৃত্তিকা : গাছ সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

ব্যবহার : ফল খাওয়া হয়। কাঠ দিয়ে প্যাকিং বাক্স তৈরি করা যায়, ডালপালা জ্বালানি হয়।

এলাকা : সারা দেশেই জলপাই গাছ জন্মে।

কামরাঙ্গা (Carambola or Starufruit)
Averrhoa carambola
Averrhoaceae

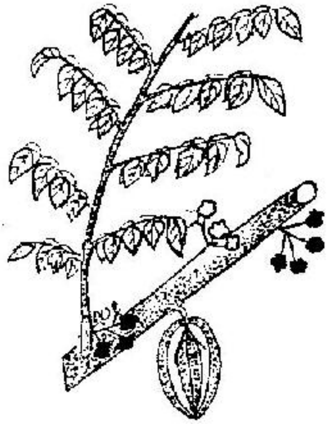

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের বৃক্ষ চিরসবুজ প্রকৃতির।

উচ্চতা : ৭ থেকে ১৩ মিটার।

ডালপালা : নিচের দিকে ঝুলে থাকে। বিস্তৃত মধ্যম।

কাঠ : শক্ত।

মৃত্তিকা : দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

ফুল : এপ্রিল থেকে জুন।

বীজ সংগ্রহ : অক্টোবর থেকে নভেম্বর।

ব্যবহার : ফল খাওয়া হয়। কাঠ আসবাব ও নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : সারা বাংলাদেশেই জন্মে। বসতবাড়িতে ভাল হয়।

কুল বরই (Jujube/Plum)
Zizyphus mauritiana
Rhamnaceae.

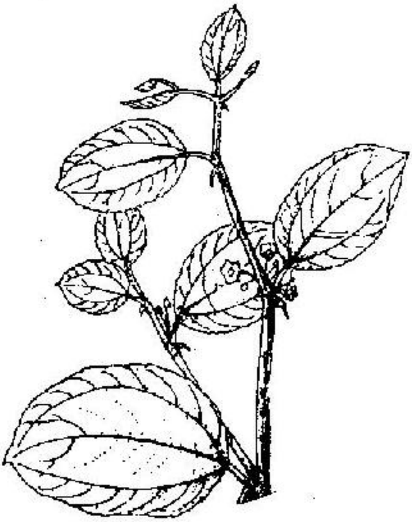

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৭ থেকে ১০ মিটার।

কাঠ : শক্ত,লাল বর্ণের।

ডালপালা : মধ্যম, কাঁটা আছে, ছাঁটাই করা যায়।

ফুল : সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর।

বীজ সংগ্রহ : জানুয়ারি থেকে মার্চ।

বংশবিস্তার : বীজ ও কলম।

মৃত্তিকা : বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মে। তবে পলি মাটিতে ভাল হয়। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ব্যবহার : ফল খাওয়া হয়। কাঠ দ্বারা নির্মাণ ও আসবাব তৈরি হয়। কৃষি ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি হয়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে থাকে। বসতবাড়িতে বেশি লাগানো হয়।

ডালিম (Pome granate)
Punica granatum
Punicaceae

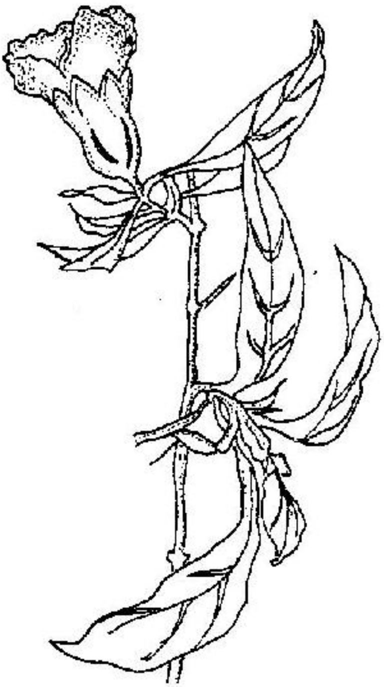

বৃক্ষ : ছোট থেকে মধ্যম আকারের পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা : ৫ থেকে ৭ মিটার।
কাঠ : নরম।
ডালপালা : মধ্যম, নরম কিছু কিছু কাঁটা আছে।
মৃত্তিকা : কাঁকড়যুক্ত মাটিতে জন্মানো যায়।
ফুল : এপ্রিল থেকে জুন।
বীজ সংগ্রহ : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।
বংশবিস্তার : কলম।
ব্যবহার : মূল্যবান ফল খাওয়া যায়। কাঠ দ্বারা বাক্স বানানো যায়।
এলাকা : সারা দেশেই বাগানে বা বসতবাড়িতে ডালিম গাছ লাগানো যায়।

শেওড়া (Siamese bush)
Streblus asper
Moraceae

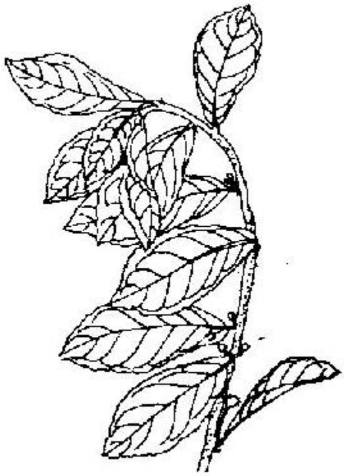

বৃক্ষ : ঘন পল্লবি ছোট গাছ, চিরসবুজ।
উচ্চতা : ৩ থেকে ৫ মিটার।
ডালপালা : বেশি, কাটা বা ছাঁটাই করা যায়।
কাঠ : শক্ত তার আঁশ বাঁকা, শাখাবহুল।
মৃত্তিকা : অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। রাস্তার পাশে বেশি দেখা যায়। আংশিক ছায়াতেও জন্মে। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।
ব্যবহার : ঔষধি গুণ রয়েছে। পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মণ্ড তৈরি হয়। জ্বালানি ও মাছের আশ্রয় ডাল হিসেবে ভাল।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। রাস্তার পাশে ও জলাশয়ের ধারে বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

করনজা (Beech tree)

Pongamia pinnata

Leguminosae (Papilionoidae)

বৃক্ষ : ছোট ও মধ্যম আকার গাছ।

উচ্চতা : ১০ থেকে ১৭ মিটার।

কাণ্ড : কাণ্ড খাটো, ডালপালা ছড়ানো। ছাঁটাই করা যায়।

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

পরিবেশ : এটি মাটির উর্বরতা বাড়ায়। বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে। লোনা মাটি ও পানিতে শিকড় বৃদ্ধি পায়। আংশিক ছায়াতেও জন্মে। ঘন করে লাগানো যায়। দ্রুত ঝোপের আকার ধারণ করে। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর

ব্যবহার : ঔষধি গুণ আছে। বীজ থেকে তেল হয়। তেল জ্বালানো যায়। পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কাঠ দ্বারা কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করা যায়।

এলাকা : বাংলাদেশের জোয়ার প্লাবিত এলাকায় বেশি জন্মে। নদীনালা ও জলাশয়ের ধারে প্রায় সারা দেশেই জন্মে। বিল হাওড় এলাকায় ও বেশি জন্মে।

জিগা (Jhiga)

Garuga pinnata

Burseraceae.

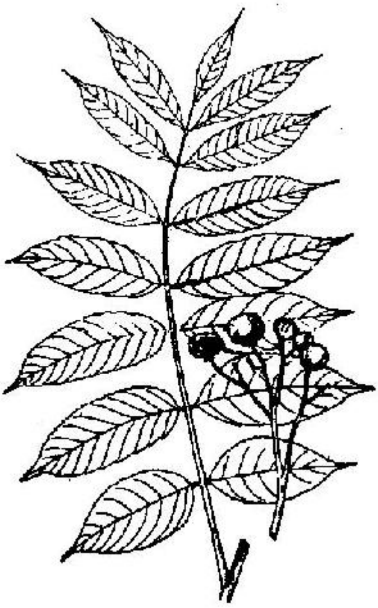

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের গাছ। পাতা ঝরা প্রকৃতির দ্রুত বড় হয়।

উচ্চতা : ১২ থেকে ১৬ মিটার

কাণ্ড : নরম, বাকল মোটা।

ডালপালা : ডালপালা খাড়া। ছাঁটাই করা যায়।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : পাতাঝরা মিশ্রবনের মাটিতে জন্মে। প্রচণ্ড সূর্যালোকে

গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। অনুর্বর মাটিতেও জন্মে

বংশবিস্তার : প্রধানত ডাল শাখা কেটে রোপণ করা হয়।

ব্যবহার : পরিপক্ব কাঠ দ্বারা সৌখিন দ্রব্য তৈরি করা যায়। কাঠ শোধন করে রেলওয়ে স্লিপার তৈরি হয়। পাতা ডগা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জীবন্ত বেড়া তৈরির কাজে বেশি ব্যবহার হয়।

এলাকা : দেশের পূর্বাঞ্চলে ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি বনসহ সারা দেশেই জন্মে থাকে। বসতবাড়িতে বেশি লাগানো হয়।

কৈয়া জারুল বাগানিয়ারী বা কাকিয়ারা
Premna benghalensis
Verbenaceae.

বৃক্ষ : মধ্যমাকার চিরসবুজ বৃক্ষ। কোনো কোনো সময় গাছ অনেক বড় হয়ে যায়।

উচ্চতা : ১০ থেকে ২২ মিটার।

কাঠ : শক্ত

পাতা : তরকারি/সবজি হিসেবে খাওয়া যায়.

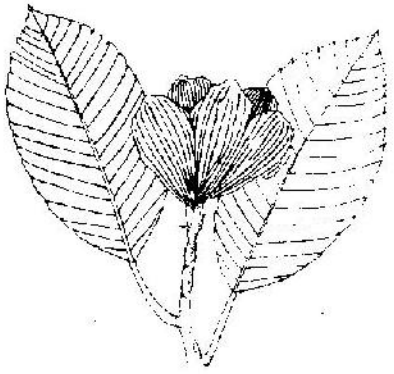

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। সিক্ত মাটিতেও জন্মানো যায়। তবে মাটি সুনিষ্কাশিত হলে ভাল হয়।

বীজ সংগ্রহ : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর।

ব্যবহার : কাঠ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঠ বাঁকানো যায়। কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়।

এলাকা : পাহাড়ি বন ও শালবনে বেশি জন্মে। দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপকভাবে জন্মে।

পরশ বা পরশপিপল (Portia tree)
Thespesia populnea
Malvaceae.

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের গাছ চিরসবুজ প্রকৃতির।
উচ্চতা : ২৩ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।
কাঠ : শক্ত।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ: অনেক ধরনের মাটি যথা ম্যানগ্রোভ এলাকা, বেলে মাটি এবং পাথুরে মাটিতেও জন্মে। দো-আঁশ মাটিতে বৃদ্ধি দ্রুত হয়।
বীজ সংগ্রহ : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।
ব্যবহার : গাছের সকল অংশই ঔষধিসহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঠ নৌকা ও কৃষি যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়।
এলাকা : দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বেশি জন্মে। রাস্তার পাশেও লাগানো হয়। বালিয়াড়ি ও সমুদ্রোপকূলে ভাল জন্মাতে পারে।

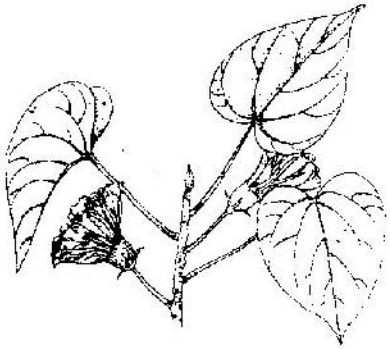

নিটলি গাছ (Nettle) **বা মেরা গাছ**
Trewia polycarpa
Euphorbiceae.

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের পাতাঝরা উদ্ভিদ
উচ্চতা : ১২ থেকে ১৭ মিটার।
কাঠ : নরম থেকে মধ্যম।
বীজ সংগ্রহ : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সিক্ত মাটির পরিবেশে বেশি জন্মে। নিচু জমিতে জন্মে। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। জলাশয় ও নদীর ধারে বেশ টিকে থাকতে পারে।
ব্যবহার : পাকা ফল খাওয়া যায়। কাঠ দ্বারা প্যাকিং বাক্স তৈরি করা যায়। গাছের ঔষধি গুণ আছে।
এলাকা : বাংলাদেশের সকল নিচু এলাকা বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে বেশি জন্মাতে দেখা যায়। নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ এলাকায়ও জন্মে।

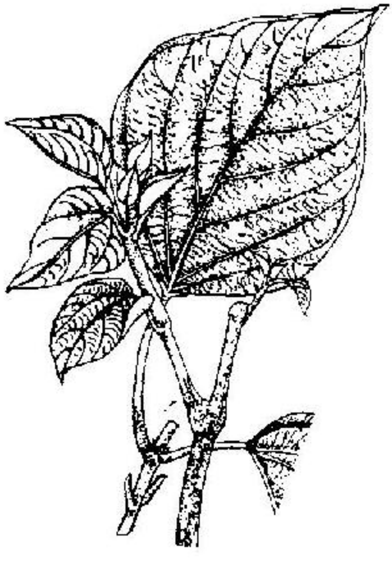

কাঠ বাদাম (Almond)
Terminalia catappa
Combretaceae.

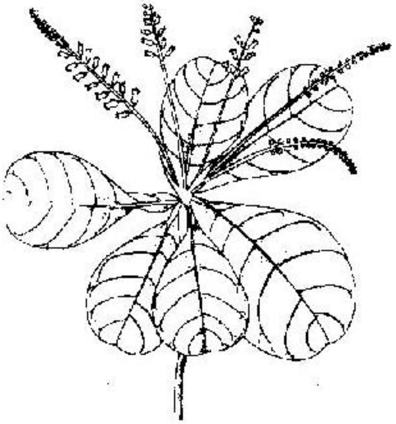

বৃক্ষ : লম্বা পাতাঝরা উদ্ভিদ

কাণ্ড : কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের।

কাঠ : শক্ত।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : বালিময় সৈকতেও জন্মে। তবে পলিমাটিতে বৃদ্ধি ভাল হয়। জলাবদ্ধতায় টিকে থাকতে পারে। সূর্যালোক চাহিদা বেশি।

বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।

বংশবিস্তার : বীজ ও কলম।

ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। কাঠ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যায়। প্লাইউড তৈরি করা যায়। ঔষধি গুণ আছে। বীজ থেকে তেল হয়।

এলাকা : সারা দেশের বসতবাড়ি রাস্তার পাশে ও বন বাগানে জন্মানো যায়। পাহাড়ি এলাকায় ও এ গাছ জন্মাতে দেখা যায়

রঙ্গি গাছ বা তুন (Toon tree Moulmein cedar)
Toona ciliata
Meliaceae.

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের পাতা ঝরা বৃক্ষ। দ্রুত বর্ধনশীল।

উচ্চতা : ১৩ থেকে ১৯ মিটার।

কাঠ : শক্ত।

বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনেক ধরনের মাটিতেই জন্মে। যেমন— সিক্ত মাটি, শুকনা মাটি ও নিকাশযুক্ত অন্যান্য বুনটের মাটি।

ব্যবহার : কাঠ আসবাবপত্র তৈরি ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। নৌকা ও বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে ও ব্যবহার বেশি। রিক্সা তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : দেশের পাহাড়ি বন ও শালবনে বেশি পাওয়া যায়। এছাড়া সারা দেশেই রঙ্গি গাছ জন্মাতে দেখা যায়

ভাদি (Bhadi)

Lannea coromandelica, Odina wodier

Anacardiaceae.

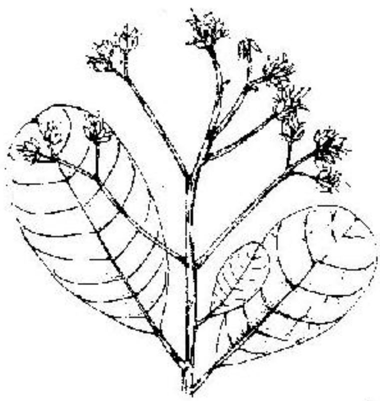

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৭ থেকে ৯ মিটার।

বাকল : মোটা, ধূসর।

ফুল : ছোট সবুজ।

বীজ সংগ্রহ : জুলাই থেকে আগস্ট।

মৃত্তিকা : উঁচু ও মাঝারি উঁচু, মধ্যম উর্বর জমি

বংশবিস্তার : কলম।

ব্যবহার : জীবন্ত বেড়া

বংশ বৃদ্ধি : ডাল।

এলাকা : 'ভাদি' প্রজাতি পাহাড়ি অঞ্চল ও অন্যান্য জাত সারা দেশেই জন্মাতে দেখা যায়।

পিটা (Pitha) বা বড় হরিনা

Erioglossum rubiginosum

Sapindaceae.

বৃক্ষ : ছোট গাছ। চিরসবুজ

উচ্চতা : ৩ থেকে ৫ মিটার।

বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সিক্ত মাটিতে জন্মে। চিরসবুজ বনে বেশি পাওয়া যায়। পিটা গাছের জন্য দো-আঁশ মাটি ভাল।

ব্যবহার : ফল খাওয়া হয়। কাঠ যন্ত্রপাতির হাতল ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়

এলাকা : সিলেট, চট্টগ্রাম,পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার পাহাড়ি এলাকায় বেশি জন্মে। এছাড়াও সারা দেশে জংলী পরিবেশে জন্মাতে দেখা যায়।

জিয়াপুতা (Child life tree)
Drypetes roxburghii, Putranjiva roxburghii
Euphorbiaceae.

বৃক্ষ : ছোট অনুচ্চ গাছ।
উচ্চতা : ৩ থেকে ৫ মিটার।
কাঠ : শক্ত।
বীজ সংগ্রহ : জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সিক্ত উর্বর মাটি। সাময়িক জলাবদ্ধতায় টিকে থাকতে পারে। ছোট গাছ আংশিক ছায়াতেও জন্মে। তবে ঘন ছায়াতে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
ব্যবহার : কাঠ নির্মাণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর বীজ দিয়ে মালা বানিয়ে শিশুর গলায় পরিয়ে দিলে শিশু কুনজর থেকে শয়তানের রক্ষা পায় বলে বিশ্বাস আছে।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

চালতা (Chalta)
Dillenia indica
Dilleniaceae.

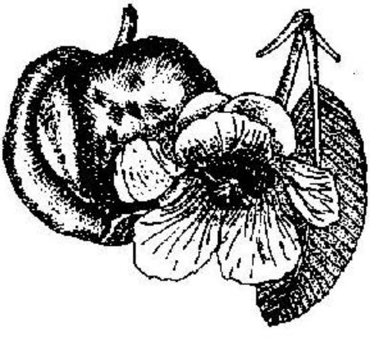

বৃক্ষ : মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা : ১২ থেকে ১৪ মিটার।
ডালপালা : বিস্তৃত।
পাতা : পাতার কিনারা খাঁজকাটা।
ফল : টক।
কাঠ : মধ্যম শক্ত
বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
ব্যবহার : নৌকার সরঞ্জাম
এলাকা : ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পটুয়াখালীতে বেশি দেখা যায় তবে উঁচু ও মাঝারি উঁচু মাটিতে সারা দেশেই কম বেশি জন্মে।

দানুরা বা আমরুজ
Aphania danura
Sapindaceae.

বৃক্ষ : চিরসবুজ ছোট গাছগুল্ম, দ্রুত বাড়ে।
উচ্চতা : ৩ থেকে ৪ মিটার।
বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।
মৃত্তিকা : ভিজা বেলে-দো-আঁশ মাটি। আংশিক ছায়াতে ও জন্মে।
ব্যবহার : জ্বালানি।
এলাকা : সারা বাংলাদেশেই পাওয়া যায়, তবে সংখ্যায় কম।

কুকুরচিতা (Kukurchita)
Litsea glutinosa
Lauraceae

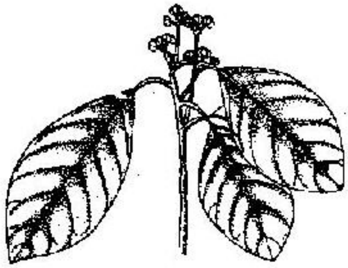

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা : ৫ থেকে ৭ মিটার।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনুর্বর মাটিতে জন্মানো যায়। ছায়াতে ও জন্মে। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।
বীজ সংগ্রহ : জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি।
ব্যবহার : গাছের অনেক ভেষজ গুণ রয়েছে। কাঠ নির্মাণ ও আসবাব তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।
এলাকা : সারা বাংলাদেশেই পাওয়া যায়। তবে শালবনে মিশ্রভাবে জন্মাতে বেশি দেখা যায়

বরুন বা মেরা (Bengal quince/Caper tree)
Crataeva nurvala
Capparidaceae.

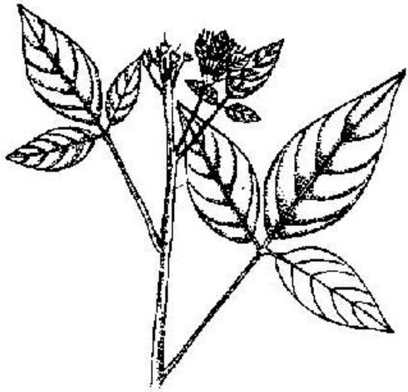

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের গাছ।
উচ্চতা : ৭ থেকে ৯ মিটার।
কাঠ : নরম, ডালপালা ছাঁটাই করা যায়।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : খাল-বিলের ধারে জন্মে। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। অনুর্বর মাটিতে ও জন্মে।
বীজ সংগ্রহ : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।
ব্যবহার : ঔষধি গুণ রয়েছে। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে নিচু এলাকায় জন্য বরুন গাছ খুবই উপযোগী

এচরি বা চাকুয়া

Anogeissus acuminate

Combretaceae.

বৃক্ষ : বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ১৮ থেকে ২২ মিটার।

ডালপালা : বিস্তৃতি মধ্যম, ডালপালা নিচের দিকে ঝুলানো। ছাঁটাই করা যায়

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

মৃত্তিকা : দো-আঁশ ও পলিমাটিতে জন্মে। মাটির শুষ্কতা সহ্য করতে পারে

বীজ সংগ্রহ : এপ্রিল থেকে মে।

ব্যবহার : কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। পরিপক্ক গাছ সহজে পুড়ে না।

এলাকা : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট পাহাড়ি এলাকায় পাওয়া যায়। শালবনে জন্মাতে দেখা যায়।

হিজল (Hijal)

Barringtonia acutanguld

Lecythidaceae.

বৃক্ষ : মধ্যমাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৯ থেকে ১৩ মিটার।

বাকল : ঘন ছাই রঙের পুরু

কাঠ : নরম জলাশয়ের মাছের আশ্রয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বীজ সংগ্রহ : অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।

বীজের ওজন : প্রতি কেজিতে ১৩০০ থেকে ১৫০০ টি।

ব্যবহার : নরম কাঠ,জলাশয়ে মাছের আশ্রয় ও জ্বালানি।

এলাকা : হাওড় ও নিচু এলাকা।

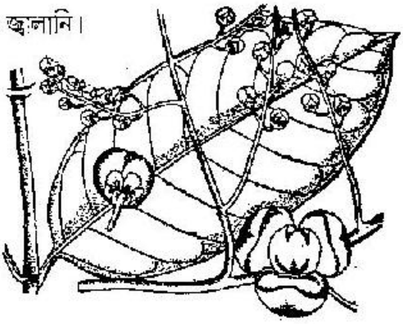

পিতরাজ বা রয়না বা বন্দিরাজ (Baddiraj)

Aphanamixis polystachya

Meliaceae.

বৃক্ষ : বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।

উচ্চতা : ২০ থেকে ২৫ মিটার।

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনুর্বর জমিতে জন্মাতে পারে। নদী নালা ও বিলের পানির ধারে জন্মে। আংশিক ছায়াতে ও জন্মে। বসতবাড়ির সীমানায় লাগানো হয়। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

বীজ সংগ্রহ : মার্চ থেকে এপ্রিল।

ব্যবহার : ঔষধি গুণ আছে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়। জ্বালানি হিসেবে ভাল।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগাম এলাকায় বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

কেপক বা বার্মা শিমুল (Kapok tree)
Ceiba pentandra
Bombacaceae.

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ২৫ থেকে ২৭ মিটার।

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

ডালপালা : প্রায় সমান্তরালভাবে জন্মে।

কাণ্ড : লম্বাটে ছোট গাছে কাঁটা থাকে।

মৃত্তিকা : সুনিষ্কাশিত দো–আঁশ মাটি। প্রচণ্ড সূর্যালোকে ভাল হয়।

বীজ সংগ্রহ : এপ্রিল থেকে মে।

ব্যবহার : কাঠ প্লাইউড ও প্যাকিং বাক্স তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। হালকা নির্মাণ কাজেও ব্যবহার করা যায়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কক্সবাজার এলাকায় বেশি দেখা যায়।

বহাল বা কানউজা (Sebesten)
Cordia dichotoma
Boraginaceae.

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ৮ থেকে ১১ মিটার।

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

পাতা : গো খাদ্য।

বীজ সংগ্রহ : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।

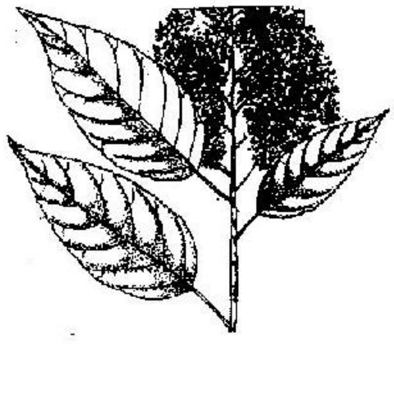

মৃত্তিকা : ভিজা দো–আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। শুষ্ক মাটিতেও টিকে থাকতে পারে। আংশিক ছায়া সহ্য করতে পারে। সাময়িক জলাবদ্ধতা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। সুগন্ধি কাঠ নির্মাণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

এলাকা : সারা দেশেই পাওয়া যায়। তবে নেত্রকোনা ও সিলেট অঞ্চলে নিচু জমিতে বেশি জন্মে।

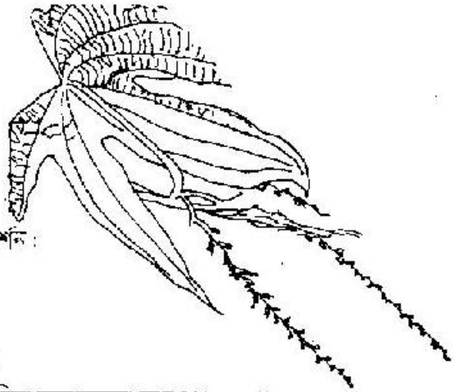

কুলাম (Kalauga)
Ehretia acuminata
Boraginaceae.

বৃক্ষ : মধ্যম আকারের চিরসবুজ গাছ। সুদর্শন।

উচ্চতা : ৭ থেকে ১০ মিটার

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

পাতা : গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

মৃত্তিকা : বেলে-দো-আঁশ মাটিতে জন্মে। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

বীজ সংগ্রহ : জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি

ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। কাঠ নির্মাণ কাজ ও কৃষি সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ এলাকায় বেশি দেখা যায়।

পন বট (Peepul tree)
Ficus religiosa
Moraceae.

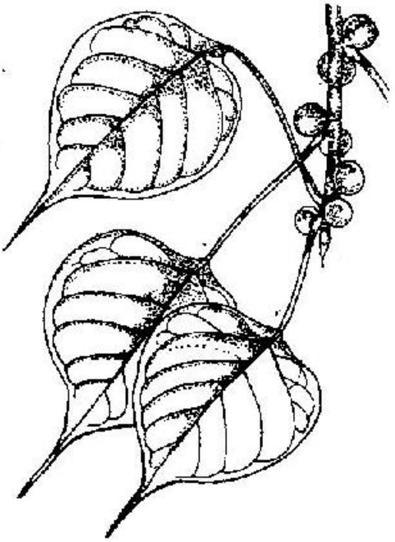

বৃক্ষ : বৃহদাকার বৃক্ষ, পাতাঝরা।

উচ্চতা : ১০ থেকে ২০ মিটার।

বিস্তৃতি : ডালপালার বিস্তৃতি বেশি।

কাঠ : মধ্যম শক্ত।

মৃত্তিকা : সিক্ত মাটিতে বেশি হয়। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। অধিক সূর্যালোকে ভাল জন্মে।

বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।

ব্যবহার : পাতা গো-খাদ্য এবং ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কাঠ প্যাকিং বাক্স তৈরিতে ব্যবহৃত করা যায়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে থাকে।

বট বা ঝুরি বট (Banyan tree)
Ficus benghalensis
Moraceae.

বৃক্ষ : চিরসবুজ ছড়ানো বড় বৃক্ষ।

উচ্চতা : ১৫ থেকে ২০ মিটার।

ডালপালা : সমান্তরালভাবে ছড়ায়। শাখা থেকে ঝুরি নামে

মৃত্তিকা : অনুর্বর জমিতেও জন্মে। সাময়িকভাবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

বীজ সংগ্রহ : জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি

ব্যবহার : নিম্নমান জ্বালানি কাঠ। পাতার ডগা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ঔষধি ব্যবহার আছে।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মাতে দেখা যায়।

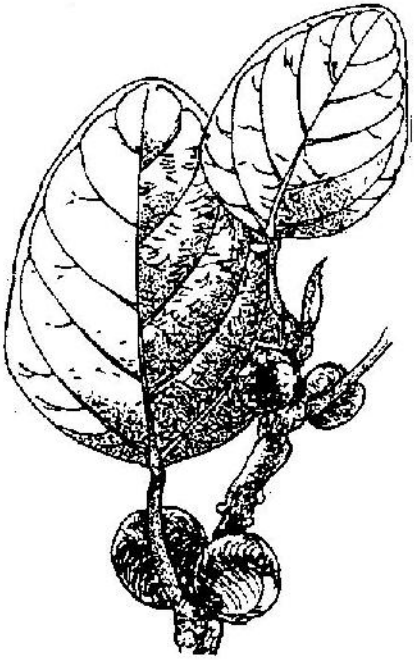

জগা ডুমুর (Jagya fig)
Ficus racemosa
Moraceae

বৃক্ষ : বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ।

উচ্চতা : ১২ থেকে ২০ মিটার।

কাঠ : নরম, মধ্যম শক্ত।

বীজ সংগ্রহ : জুন থেকে জুলাই।

মৃত্তিকা : সিক্ত মাটিতে জন্মে। অনুর্বর জমি বা কাঁকড়সম্পন্ন জমিতেও জন্মাতে পারে। সূর্যালোকে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। ছায়াতে ও জন্মে।

ব্যবহার : ফল খাওয়া যায়। ঔষধি গুণ আছে। পাতা ও কচি ডগা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়

এলাকা : সারা বাংলাদেশেই জন্মাতে দেখা যায়।

নারকেল (Coconut)
Cocos nucifera
Palmae.

বৃক্ষ : এক কাণ্ডবিশিষ্ট লম্বা গাছ।

উচ্চতা : ১৫ থেকে ২০ মিটার।

কাণ্ড : শাখাবিহীন, বহিরাবরণ শক্ত, ভিতরে মধ্যম শক্ত।

বীজ সংগ্রহ : ফল পাকার পর সারা বছর সংগ্রহ করা যায়।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি, লোনা মাটিতে জন্মে। মাটি গভীর হওয়া দরকার।
ব্যবহার : ফল, নির্মাণ কাঠ অন্যান্য দ্রব্য জ্বালানি।
এলাকা : দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বেশি হয়। তবে সারা দেশেই কম বেশি জন্মে

ডুমুর (Fig)
Ficus hispida
Moraceae
বৃক্ষ : ছোট বা মধ্যম গুল্ম।
উচ্চতা : ৪ থেকে ৬ মিটার।
কাণ্ড : কচি কাণ্ড কাঁশ।
বীজ সংগ্রহ : ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সিক্ত মাটি জন্মে। ছায়াতেও জন্মে। অনুর্বর মাটিতেও জন্মে, তবে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়।
ব্যবহার : কচি ডগা পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ফল খাওয়া যায়।
এলাকা : সারা দেশেই জন্মাতে দেখা যায়।

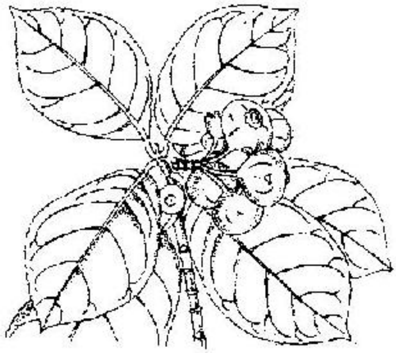

সুপারি (Betel nut)
Areca catecuh
Palmae
বৃক্ষ : এক কাণ্ডবিশিষ্ট চিকণ লম্বা গাছ।
উচ্চতা : ১০ থেকে ১৫ মিটার।
কাণ্ড : শাখাবিহীন, বাইরের ত্বক শক্ত ভিতরে নরম।
বীজ সংগ্রহ : অশ্বিন থেকে পৌষ মাস।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু ও মাঝারি উঁচু পলি মাটি, পাহাড়ের উর্বর মাটির দক্ষিণ ঢাল।
ব্যবহার : ফল, নির্মাণ ও জ্বালানি।

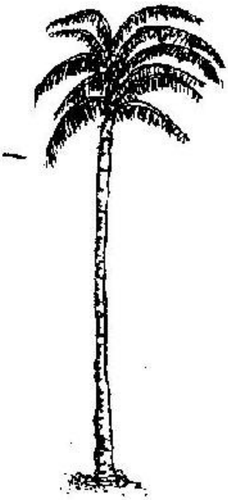

এলাকা : দেশের উপকূলীয় এলাকায় বেশি জন্মে, তবে সারা দেশেই কমবেশি জন্মে থাকে।

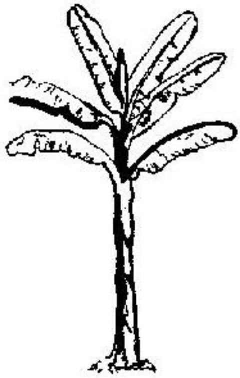

কলা (Banana)
Musa sapientum
Musaceae

বৃক্ষ : নরম, খোল দ্বারা আবৃত.
উচ্চতা : ৩ থেকে ৭ মিটার।
কাণ্ড : সিউডোস্টেম (Pseudostem)
বীজ সংগ্রহ : কলার সাকার সংগ্রহ করতে হয়।
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উচু ও মাঝারি উচু দো-আঁশ উর্বর মৃত্তিকা।
ব্যবহার : ফল ও জ্বালানি.
এলাকা : জাতভেদে সারা দেশেই জন্মে.

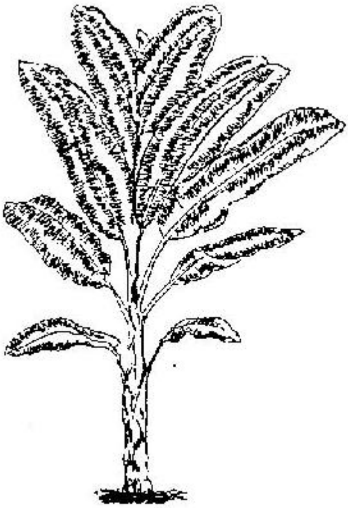

আঁশ কলা (Abaca)
Musa textilis
Musaceae

বৃক্ষ : নরম, খোলা সাহায্যে আবৃত পাতার বোটা লম্বা।
উচ্চতা : ৪ থেকে ৭ মিটার।
কাণ্ড : খাটো সিউডোস্টেম।
বীজ সংগ্রহ : সাকার সংগ্রহ করতে হয়.
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উচু জমিতে জন্মে। মধ্যম উর্বর জমিতে জন্মাতে পারে।
ব্যবহার : গাছ থেকে আঁশ তৈরি করা যায়.
এলাকা : বাংলাদেশে কেবল পাহাড়ি এলাকায় জন্মাতে দেখা যায়।

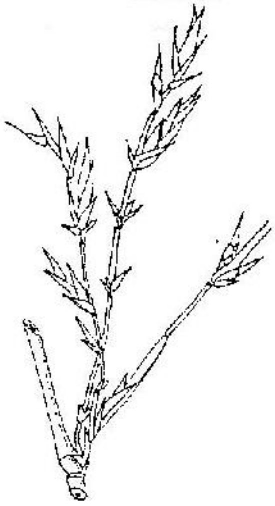

কনকাইচ বাঁশ (Kanakaich)
Bambusa sp
Graminae

উচ্চতা : ১০ মিটার পর্যন্ত।
ব্যাস : ৩ থেকে ৫ সে.মি.
শাখা তৈরি : বাঁশের মাঝামাঝি থেকে উপরে.
মৃত্তিকা ও পরিবেশ : বেলেদো-আঁশ মাটি, সুনিকাশযুক্ত জমি। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ব্যবহার : নির্মাণ ও ঝুড়ি ডোলা তৈরি করা হয়।

এলাকা : এই বাঁশ কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বেশি দেখা যায়।

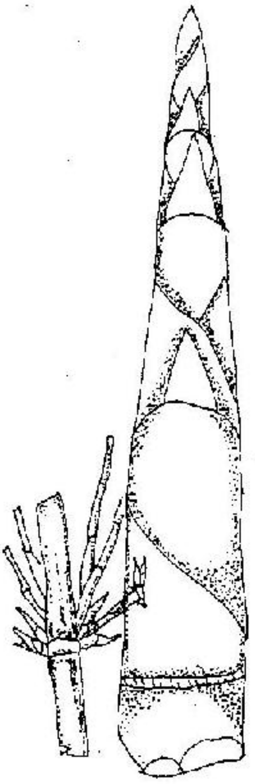

বরাক বা বৌড়া বাঁশ (Boura bambo)
Bambusa balcooa
Graminae

উচ্চতা : ২৫ থেকে ৩০ মিটার।

ব্যাস : ৩ থেকে ১০ সে. মি.।

গিরা : মোটা।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। তবে সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ মাটি ভাল। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ব্যবহার : পুরু আবরণযুক্ত বাঁশ বলে শক্ত খুঁটি হয়। নির্মাণ কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। অপরিপক্ব বাঁশ দিয়ে বেত তোলা যায়।

এলাকা : সারা দেশেই পাওয়া যায়। তবে ময়মনসিংহ এলাকাসহ দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

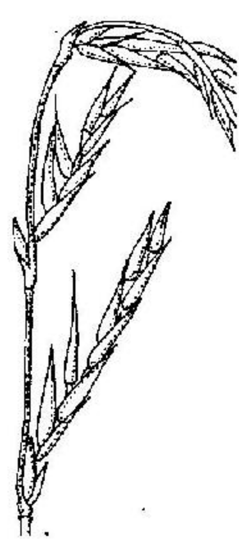

মাকলা বাঁশ (Makla bambo)
Bambusa nutans
Graminae

উচ্চতা : ১৫ থেকে ২০ মিটার।

ব্যাস : ২.৫ থেকে ৮ সে. মি.।

কাঞ্চি : গোড়া থেকে সারা বাঁশে বের হয়।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : গভীর পলিমাটিতে ভাল জন্মে। সুনিষ্কাশিত সিক্ত মাটি ভাল। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ব্যবহার : গ্রামীণ ঘরবাড়ি নির্মাণে বেশি ব্যবহৃত হয়। বেত ও ফলি তুলে অন্যান্য দ্রব্যাদি তৈরি করা যায়।

এলাকা : প্রায় সারা দেশেই জন্মে।

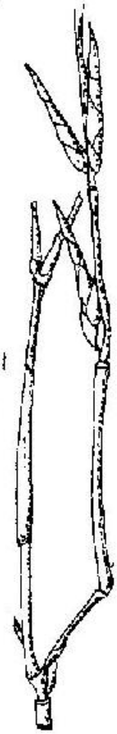

তল্লাবাঁশ বা মিতিঙ্গা বাঁশ (Taralla bambo)
Bambusa tulda
Graminae

উচ্চতা : ১০ থেকে ১৫ মিটার।

ব্যাস : ২.৫ থেকে ৮ সে. মি.।

কঞ্চি : বাঁশের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়।

গিরা : মোটা, নিচের ২ থেকে ৩টি গিট আঁকাবাঁকা।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : হালকা পলিমাটিতে ভাল জন্মে। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ব্যবহার : ঘরবাড়ি নির্মাণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, মাছ ধরার সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : সারা বাংলাদেশেই জন্মে।

বাসনি বাঁশ (Bashni bambo)
Bambusa vulgaris
Graminae

উচ্চতা : ১৫ থেকে ২০ মিটার।

ব্যাস : ৩ থেকে ১০ সে. মি.

কঞ্চি : বাঁশের মাঝামাঝি থেকে উপরের দিকে।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সিক্ত ও সুনিকাশযুক্ত মাটিতে জন্মে। নদী-নালা ও জলাশয়ের কাছেও জন্মে। সাময়িকভাবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

ব্যবহার : নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে, তবে দেশের মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে বেশি জন্মে।

ছোট মিতিঙ্গা বা তেঁতুয়া বাঁশ
Bambusa jaintiana, B. alami,
Graminae

উচ্চতা : কম, ৪ থেকে ৬ মিটার।

ব্যাস : ১ থেকে ৩ সে. মি.।

কঞ্চি : গোড়ায় অনেক বেশি।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সুনিষ্কাশিত সিক্ত মাটিতে জন্মে। পলিমাটি ও বেলে-দো-আঁশ মাটি হলে ভাল হয়।

ব্যবহার : ঘরবাড়ি নির্মাণ ও মাছ ধরার সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কৃষি সরঞ্জাম এবং বেড়া দেওয়ার জন্য ভাল।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাজীপুর নরসিংদী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সিলেট জেলায় বেশি।

মরাল বাঁশ (Moral bambo)
Bambusa cacharensis
Graminae

উচ্চতা : ১৫ থেকে ২০ মিটার।

ব্যাস : ৩ থেকে ১০ সে. মি.।

কঞ্চি : বাঁশের মাঝামাঝি অংশ থেকে উপরের দিকে।

পর্ব : দীর্ঘ, চোখ ছোট।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : দো-আঁশ মাটি, সুনিষ্কাশিত। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ব্যবহার : বেত তোলা এবং সূক্ষ্ম কারুকাজসম্পন্ন শিল্পকর্মের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। নির্মাণ কাজেও ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে তবে সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা জেলায় বেশি জন্মে।

কুরাজাভা বাঁশ বা জিওধা বাঁশ (Kurajava bambo)
Bambusa sp.
Graminae

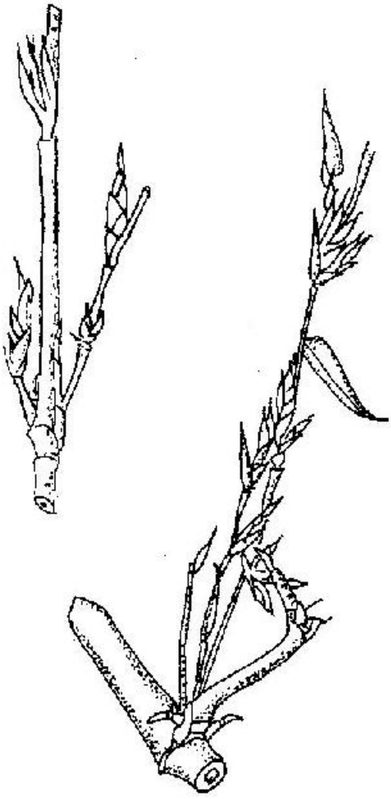

উচ্চতা : ১০ থেকে ১৫ মিটার।

ব্যাস : ৪ থেকে ১০ সে. মি.।

কঞ্চি : গোড়া থেকে বাঁশের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : গভীর পলিমাটিতে ভাল হয়। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ব্যবহার : নির্মাণ ও ঝুড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে। তবে দেশের মধ্য, উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে বেশি জন্মে।

কেইটা বাঁশ (Ketya bambo)
Bambusa bambos
Graminae

উচ্চতা : ২০ থেকে ৩০ মিটার। খুবই উঁচু।

ব্যাস : ২.৫ থেকে ৯ সে. মি.

গিরা : কঞ্চির গিটে কাঁটা আছে।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ব্যবহার : নির্মাণ কাজে ব্যবহার বেশি।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে তবে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও এলাকায় বেশি দেখা যায়।

ক্রোটালারিয়া (Crotalaria)

Crotalaria juncea

Leguminosae

বৃক্ষ : ছোট, খাড়া, লম্বাটে।

উচ্চতা : ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনুর্বর জমিতে জন্মে। মাটির উর্বরতা বাড়ায়। সাময়িক খরা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৮০ থেকে ১০০ কেজি/হেক্টর।

তাপ চাহিদা : ১২ß থেকে ৩৫ß সে.।

ব্যবহার : গো-খাদ্য, আঁশ, ছায়াগাছ, সবুজসার, জ্বালানি।

এলাকা : সিলেট ও চট্রগ্রামের চা বাগান ও অন্যান্য বাগানে বেশি জন্মানো হয়। দেশের অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়, তবে কম।

হেইরি ইন্ডিগো (Hairy indigo)

Indigofera hirsuta

Leguminosae

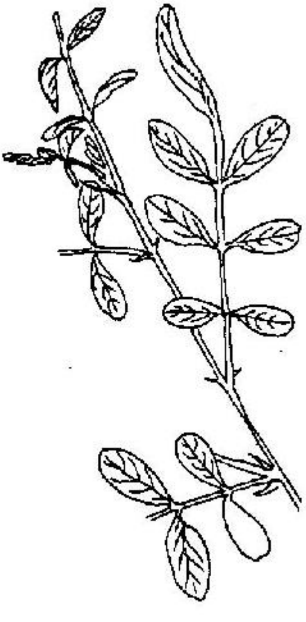

বৃক্ষ : ছোট গাছ, বার্ষিক, খাড়াভাবে জন্মে।

উচ্চতা : ১ থেকে ৩ মিটার।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : নিকাশযুক্ত দো-আঁশ মাটি, মাটির উর্বরতা বাড়ায়। অন্যান্য বাগানে ফাঁকে ফাঁকে লাগানো যায়।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৭০ থেকে ৮০ কেজি/হেক্টর।

ব্যবহার : ছায়া গাছ, সবুজ সার, আচ্ছাদন ফসল, ভূমিক্ষয় রোধকারী ফসল।

এলাকা : সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ এলাকায় বেশি জন্মানো হয়। তবে সারা দেশেই কৃত্রিম বন বাগানে আন্তঃফসল হিসেবে জন্মানো যায়।

ধইনচা (Dhaincha)
Sesbania canabina
Leguminosae

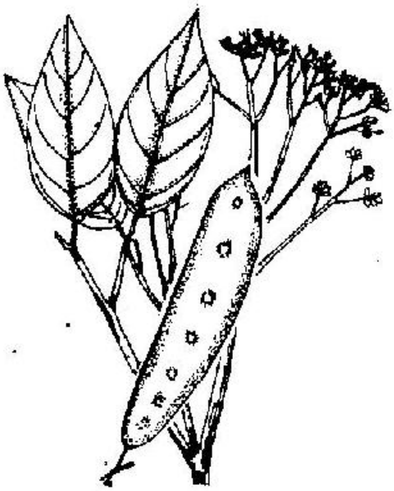

উচ্চতা : ১৫ থেকে ৩০ মিটার।

শাখা প্রশাখা : বীজ গাছে বেশি, জমিতে চাষ করলে এক কাণ্ডবিশিষ্ট হয়।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : মাটির উর্বরতা বাড়ায়। বাগানে সবুজ সার বা আচ্ছাদন ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। জলাবদ্ধ জমিতে জন্মে। বনাঞ্চলে মিশ্র ফসল হিসেবে খুবই উপকারী।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৮০ থেকে ১০০ কেজি/হেক্টর।

ব্যবহার : সবুজ সার ও জ্বালানি।

এলাকা : সারা দেশে সারা বছর সকল বাগানে চাষ করা যায়। সামাজিক বনায়নের অংশ হিসেবে মিশ্র বা আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা হয়।

অড়হর (Pigeon pea)
Cajanas cajan
Leguminosae

উচ্চতা : সোজা লম্বা, ১ থেকে ৪ মিটার উঁচু।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সকল মাটিতেই রোপণ করা যায়। মাটির উর্বরতা বাড়ায়। রাস্তার পাশে বড় গাছের ফাঁকের সারিতে লাগানো হয়। তাপ চাহিদা ১৫ঠ থেকে ৩৫ঠ সেঃ। আচ্ছাদন ফসল হিসেবে ভাল। ভূমিক্ষয় রোধ করে।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৮০ থেকে ১০০ কেজি/হেক্টর।

ব্যবহার : ডাল হিসেবে খাওয়া যায়। ছাঁটাই করা অংশ সবুজ সার হয়। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এলাকা : সারা দেশেই সামাজিক বনায়নের অংশ হিসেবে মিশ্রভাবে লাগানো হয়।

লেসপেডেজা (Lespedeza)
Lespedeza pubescens
Leguminosae

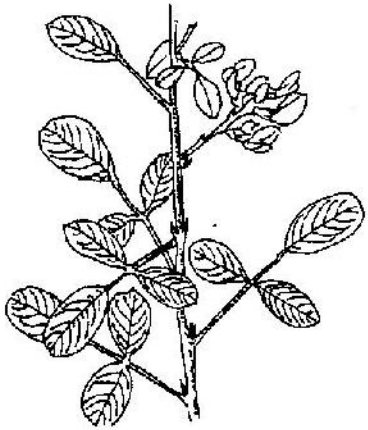

উচ্চতা : ১ থেকে ২ মিটার।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : মাটির উর্বরতা বাড়ায়। খরা প্রতিরোধক। অনুর্বর মাটিতেও জন্মে।

তাপ চাহিদা : ১০ß থেকে ৩৮ß সেঃ।

ব্যবহার : বসতবন, সামাজিক বন ও বন বাগানে মিশ্র ফসল। আচ্ছাদন ফসল বা অন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা যায়। গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৫ টন বায়োমাস থেকে ৯০ থেকে ১০০ কেজি নাইট্রোজেন।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মানো যায়।

শোলা গাছ (Shola)
Aeschynomene aspera
Leguminosae

উচ্চতা : ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : অনুর্বর জমিতে জন্মে। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। মাটির উর্বরতা বাড়ায়। হিজলসহ অন্যান্য নিচু এলাকার বন বাগানে লাগানো যায়

তাপ চাহিদা : ১৫ থেকে ৩৮ß সেঃ।

ব্যবহার : বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরিতে যেমন জালের ভাসমান বস্তু প্রভৃতিতে ব্যবহার করা যায়। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৮০ থেকে ১০০ কেজি/হেক্টর।

এলাকা : সারা দেশেই নিচু এলাকায় (নিচু জমি) জন্মে। বসত বনের পানির ধারে লাগানো যায়।

পাতা করলা (Winged bean) **বা চৌকা শিম**
Psophocarpus tetragonolobus
Leguminosae

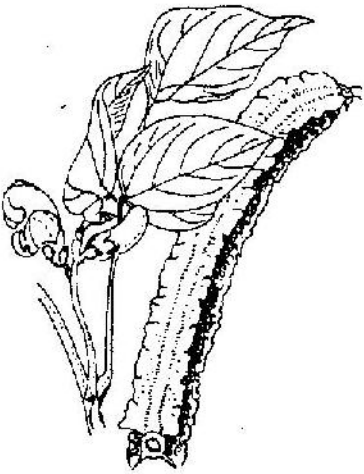

উচ্চতা : লতানো গাছ, ৩ থেকে ৫ মিটার।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : নিকাশযুক্ত জমিতে লাগাতে হয়। মাটির উর্বরতা বাড়ায়। মান্দার, জিগা প্রভৃতি গাছকে আশ্রয় করে জন্মে থাকে।

তাপ চাহিদা : ১৫ থেকে ৩৫ß সেঃ।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৬০ থেকে ৭০ কেজি/হেক্টর।

ব্যবহার : সবজি ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বসত বন ও সামাজিক বনে মিশ্র হিসেবে চাষ করলে উপস্থিত আয় বাড়ে, মাটির উন্নয়ন ঘটে।

এলাকা : দেশের মধ্যাঞ্চলে ও উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলে এর চাষ বেশি দেখা যায়।

আদা (Ginger)
Zingiber officinale
Zingiberaceae

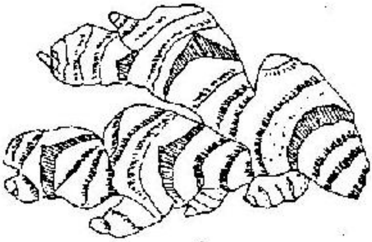

বৃক্ষ : নরম কাণ্ডসম্পন্ন ছোট গাছ।

উচ্চতা : ৬০ থেকে ১২০ সে. মি.।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু জমি, দো–আঁশ মাটি।

ব্যবহার : মসলা।

এলাকা : বৃহত্তর রংপুরসহ উত্তরাঞ্চল। বসতবাড়ি ও উঁচু জমিতে জন্মানো যায়। আন্তঃফসল হিসেবে বাগানেও জন্মানো যায়। রাইজোমের বংশবিস্তার করে।

হলুদ (Turmeric)
Curcuma longa
Zingiberaceae

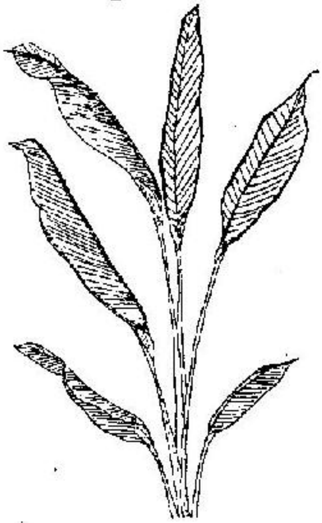

বৃক্ষ : নরম কাণ্ড সম্পন্ন ছোট গাছ।

উচ্চতা : ৬০–১২০ সে. মি.।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু জমি, দো আঁশ উর্বর মাটি।

ব্যবহার : মসলা।

এলাকা : পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও যশোর এলাকায় ভাল হয়। বসতবাড়িতে ও উঁচু জমিতে জন্মানো যায়। হালকা ছায়ায় জন্মে বলে কাঁঠাল বনে লাগানো যায়। বসত বন মডুলে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

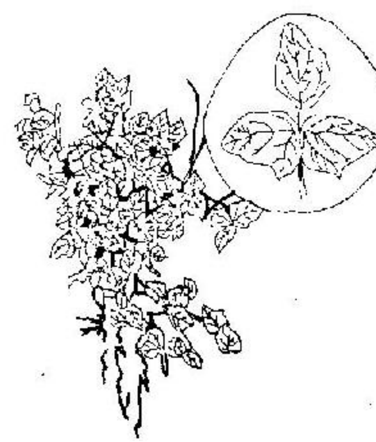

সিরাট্রো গাছ (Siratro)
Leguminosae

উচ্চতা : লতানো গাছ।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : সুনিকাশযুক্ত জমিতে ভাল হয়। মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

তাপ চাহিদা : ১৫ থেকে ৩৫0 সেঃ।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৭৫ থেকে ৮০ কেজি হেক্টর।

ব্যবহার : সামাজিক বন ও প্রাকৃতিক বনে আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করলে ভূমির উন্নয়ন ঘটে। এই গাছ গবাদির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ভূমিক্ষয় রোধক হিসেবে কাজ করে।

এলাকা : দেশের উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমির সামাজিক বনে এর চাষ করে লাভবান হওয়া যায়।

কিডনি বিন বা কিডনি শিম
Phaseolus valgaris
Leguminosae

বৃদ্ধি স্বভাব : ঝোপ, লতানো।

মৃত্তিকা : উর্বর, সুনিষ্কাশিত।

তাপ : ৫ থেকে ২৫0 সেঃ।

সময়সীমা : ৮০ থেকে ৯০ দিন।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৫৫ কেজি/হেক্টর।

খাদ্য : সবুজ শুটি ও শুকনা বীজ

ব্যবহার : সবজি ও সবুজ সার।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে তবে কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে ভাল জন্মে।

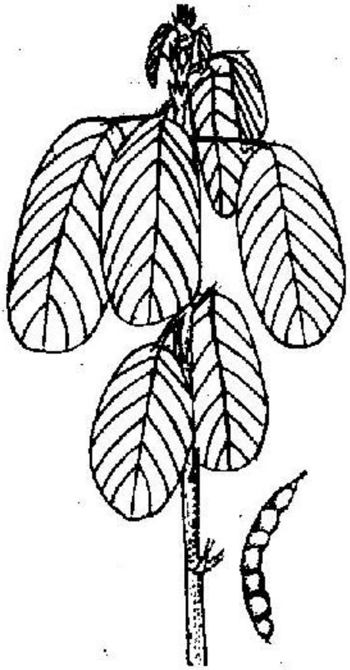

ডেসমোডিয়াম

Desmodium gyroideo

leguminosae

বৃদ্ধি স্বভাব : গুল্ম ৩ থেকে ৪ মিটার উঁচু।

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : কম উর্বর জমি, অম্লীয় বা ক্ষারীয় খরা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল।

তাপ চাহিদা : ১০ß থেকে ৩৮ß সেঃ.

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৫ থেকে ৬ টন বায়োমাস থেকে ১০০ থেকে ১২০ কেজি।

ব্যবহার : গো-খাদ্য, তৃণভূমি, বার বার কেটে খাওয়ানো যায়।

এলাকা : ঢাকা, সাভার, গাজীপুর ও পাহাড়ি এলাকায় ভাল জন্মাতে দেখা গেছে।

নীল জাতীয় গাছ

Indigofera tinctoria

Leguminosae

বৃদ্ধি স্বভাব : ঝোপ, ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু।

মৃত্তিকা চাহিদা : সুনিষ্কাশিত জমি, খরা সহ্য করতে পারে।

তাপ চাহিদা : ১৫ß থেকে ৩৮ß সেঃ।

মৌসুম : ১৫০ থেকে ১৮০ দিন।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৮০ থেকে ৯০ কেজি/হেক্টর।

অন্যান্য ব্যবহার : নীল উৎপাদন।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মে, তবে দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি জন্মানো যায়।

গুচ্ছ শিম বা ক্লাস্টার বিন

Cyamopsis tetragonoloba

Leguminosae

বৃদ্ধি স্বভাব : সোজা, লম্বা, ১ থেকে ১.৩ মিটার

মৃত্তিকা : অনুর্বর প্রান্তিক জমি; খরা সহ্য করতে পারে।

তাপ : ১২ß থেকে ৩৫ß সেঃ।

সময়সীমা : ৭০ থেকে ১১৫ দিন।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৮০ থেকে ৯০ কেজি/হেক্টর।

ব্যবহার : সবুজশুঁটি, শুকনা বীজ, গো-খাদ্য, গাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : সারা দেশেই জন্মানো যায় তবে দেশের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে ভাল জন্মাতে দেখা গেছে।

ডেসম্যান্থাস
Desmanthus virgatus
Leguminosae

বৃদ্ধি স্বভাব : ছোট গুল্ম, ২ থেকে ৩ মিটার উঁচু।

মৃত্তিকা : অম্লীয়, উঁচু, প্রান্তিক জমি।

তাপ চাহিদা : ১০ß থেকে ৩৮ß সেঃ।

নাইট্রোজেন সরবরাহ : ৪ থেকে ৫ টন বায়োমাস থেকে ৮০ থেকে ১০০ কেজি।

ব্যবহার : গো-খাদ্য, তৃণভূমি জ্বালানি।

এলাকা : ঢাকা, সাভার, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ এবং পাহাড়ি মধ্যম উঁচুতে ভাল জন্মাতে দেখা গেছে।

সাইট্রোনেলা বা গন্ধ ঘাস (Citronella grass)
Cymbopogon nardus
Gramineae

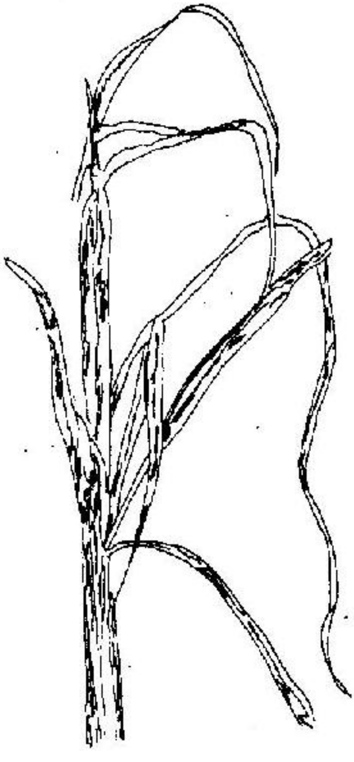

বৃক্ষ : ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ

উচ্চতা : ১০০ থেকে ১৫০ সে.মি.

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু অম্লীয় মাটি

ব্যবহার : সুগন্ধি তেল উৎপাদিত হয়

এলাকা : প্রধানত উঁচু ও পাহাড়ি এলাকা।

এর অপর নাম কচিনা ঘাস (Cochin grass) এই উপমহাদেশে বন্যভাবেও

জন্মে। লেবু ঘাস তেল উৎপাদন করে। গাছের উচ্চতা প্রায় ২ মিটার। লাল কাণ্ডবিশিষ্ট গাছে বেশি তেল উৎপাদিত হয়। বীজ দিয়ে বংশবিস্তার করে। ২ থেকে ৩ মাস পরপর পাতা কাটা যায়।

এরারুট বার্লি (Arrow root)
Moranta arundinacea
Marantaceae.

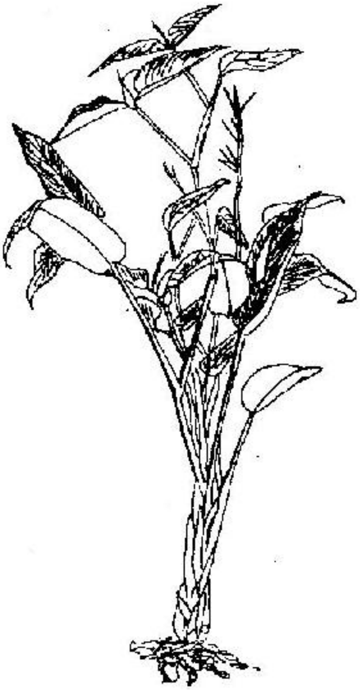

বৃক্ষ : ছোট গাছ

কাণ্ড : নরম

উচ্চতা : ৫০ থেকে ১০০ সে.মি.

মৃত্তিকা ও পরিবেশ : উঁচু মাঝারি উঁচু দো–আঁশ মাটি

ব্যবহার : বার্লি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এলাকা : প্লাবন ভূমিসম্পন্ন পলিমাটিতে ভাল জন্মে। গাছ দেখতে হলুদ গাছের মতো। বসতবাড়িতে হালকা ছায়াতে ও জন্মে। এরারুট বার্লির স্টার্চ উন্নতমানের তাই মূল্যও বেশি। উঁচু জমির বাগানে আন্তঃফসল হিসেবে ও জন্মানো যায়। কৃষি বনায়নের প্রজাতি হিসেবেও লাগানো যায়।

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ের বিষয় সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষ অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

BANGLADESH Library Dhaka

ষোড়শ অধ্যায়

কৃষি বনায়নে রোগ ও পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

কৃষি বনায়নে বিভিন্ন প্রকার গাছ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ গাছগুলোতে বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকার আক্রমণ হতো। বিভিন্ন গাছ অনুযায়ী রোগ ও পোকা দমন সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

শিশুর উইল্ট বা পানামা রোগ

রোগজীবাণু : *Fusarium solani* নামক ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে শিশু গাছের পাতা হলুদ হয় ও ধীরে ধীরে মরে যায়।

প্রতিকার : ১) কুপ্রাভিট, বোঁর্দোমিক্সার বা ডায়থেন এম-৪৫ পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় দিতে হয়।

২) গাছের গোড়ায় যাতে কোনো পানি না জমতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হয়।

শিশুর মূল পচা রোগ

রোগজীবাণু : *Ganodarma lucidum* নামক ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : গাছের মাথা থেকে আস্তে আস্তে মরা শুরু হয় এবং ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে মারা যায়।

প্রতিকার : ১) আক্রান্ত গাছের চারদিকে গর্ত খনন করে নালা তৈরি করে দিতে হয়।

২) বোঁর্দো মিক্সার, ফরমালিন, ডায়থেন-এম ৪৫ ও কুপ্রাভিট ছত্রাকনাশক গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হয়।

ইউক্যালিপটাসের ড্যাম্পিং অফ

রোগজীবাণু : *Pythium* spp ও *Fusarium* spp জাতীয় ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : চারার কাণ্ড পচে গিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার : ১) বীজতলা বা টে-তে মাটি ব্যবহারের পূর্বে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ।

২) ডায়থেন এম-৪৫ কুপ্রাভিট ও বোঁর্দোমিক্সার স্প্রে করে দিতে হয়।

গামার ও নিম চারার কাণ্ড পঁচা রোগ

রোগজীবাণু : *Fusarium* spp ও *Phytopthora* spp নামকছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : মূল পচে যায় ও পরে চারার কলার অংশ পচে শুকিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার : ছত্রাকনাশক ওষুধ ৭ দিন পর পর বিধি অনুসারে ছিটাতে হয়।

মেহগনির শাখা ছিদ্রক পোকার আক্রমণ

পোকা দ্বারা নরম শাখাসমূহ আক্রান্ত হয় এবং ধীরে ধীরে ছিদ্র করে পোকা কাণ্ডের মধ্যে ঢুকে। আক্রান্ত ডাল মরে যায়।

প্রতিকার : ১) আক্রান্ত গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে ফুরাডান (৬ গ্রাম) গছে দিতে হয়।

২) ডায়াজিনন ৬০ই. সি (৩০মিলিলিটার/১০ পানি) ছিদ্রে সিরিঞ্জ দিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

বোরিক এসিড ১ : ২ : ১ কেজি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে বড় আকারের পাত্রে রেখে বাঁশের খণ্ড বা কাঠের খণ্ড কিছুক্ষণ চুবানো হয়।

আমে উইভিল পোকার আক্রমণ

আক্রমণকারী পোকা : *Sternochetus frigidus*।

রোগের লক্ষণ : মুকুল থেকে যখন গুটি বাঁধে তখন আমের উইভিল পোকা বা বিটল সেখানে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে লার্ভা বের হয় আমের মধ্যে ছিদ্র করে ঢুকে এবং ধীরে ধীরে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিকার : ১) মুকুল থেকে ছোট গুঁটি বাঁধার সময় ফ্রোটাপাম্প স্প্রে দিয়ে ডায়াজিনন ৬০ ই.সি. (৩০ মিলিঃ/১০ লিঃ পানি) প্রয়োগ করতে হয়।

কলার সিগাটোকা রোগ

রোগজীবাণু : *Cercospora musae* নামক ছত্রাক এ রোগ সৃষ্টি করে।

রোগের লক্ষণ : কলার পাতায় ছোট কালো দাগ প্রথমে পাতার কিনারায় দেখা দেয় দাগগুলো বড় হয়ে লম্বাটে আকার ধারণ করে।

প্রতিকার : ১) বর্ষা শুরুর আগে থেকে বোর্দোমিশ্রন (৪ পাঃ তুঁত, ৪ পাঃ চুন ও ৫০ গ্যালন পানি) ছিটালে এ রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যায়।

২) ডাইথেন এম–৪৫ বা সানটার–এ প্রয়োগ করতে হয়।

কলার উইল্ট বা পানামা রোগ

রোগজীবাণু : এ রোগ একজাতীয় ছত্রাকের (*Fusarium oxysporium*) আক্রমণে হয়ে থাকে

রোগের লক্ষণ : কলা গাছের পুরাতন পাতা প্রথমে হলুদ ও পরে পোড়াভাব ধারণ করে। পাতা ফেটে যায়। পাতার বোঁটা ভেঙে পড়ে।

প্রতিকার : ১) গর্তে গাছ লাগানোর পূর্বে মাটি শোধন করে নিলে (২০০ মিলিঃ ৫০% ফরমালিন) এ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

২) কাঁঠালী চাপা বা আইটা কলা পানামা প্রতিরোধী জাত।

সুপারির কলেরা রোগ

রোগজীবাণু : এক জাতীয় ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : কলেরা নামক এক প্রকার ছত্রাক সুপারি গাছের ফুলে মঞ্জরী ও খোলে আক্রমণ করে কালো আবরণ সৃষ্টি করে।

প্রতিকার : বোর্দোমিক্সার স্প্রে করতে হয় গাছের গোড়ায় ও আক্রান্ত কাঁদিতে।

সুপারির ফল পচা (Fruit Rot)

রোগজীবাণু : *Phytophthora palmivora* নামক ছত্রাকের আক্রমণে সুপারির ফল পচা রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ : রোগের আক্রমণে কাঁদি থেকে সুপারি অকালে ঝরে পড়তে শুরু করে। ফলে ফলত্বক (pericarp) কুঞ্চিত হয়ে যায় এবং শাঁস বিনষ্ট হয়।

প্রতিকার : কোনো ছত্রাকনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। প্রতি লিটার পানিতে ১ থেকে ২ গ্রাম ক্যাপটাফ বা ৪ গ্রাম ব্লাইটক্স গুলে সুপারির কাঁদিগুলোতে প্রয়োগ করা হয়।

সুপারির গোড়া পচা রোগ (Foot Rot)

রোগজীবাণু : *Ganoderma lucidum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে সুপারি গাছের গোড়া পচা রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ : বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারা বড় হওয়ার পরই চারার গোড়ায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের ফলে চারা গাছের গোড়ার দিকের অংশে (মাটি সংলগ্ন) পচন ধরে। ফলে চারা গাছটি মরে যায়।

রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধ : ১০ লিটার জলে ৪০ গ্রাম ব্লাইটেন বা ১০ গ্রাম ব্যাভিস্টিন গুলে, সেই মিশ্রণে সুপারিগুলো সারা রাত ভিজিয়ে রেখে পরদিন বপন করা।

আমের পরজীবী বৃক্ষের আক্রমণঘটিত রোগ

আম গাছের ডালে লোরেনথাস (বাঁদরা সাদা, রাস্না) ও আরও কয়েকটি পরজীবী গাছ আক্রমণ করে, গাছকে দুর্বল করে দেয়। সেজন্য সংস্কৃত ভাষায় গাছটির নাম দেওয়া হয়েছে বৃক্ষভক্ষ। সেগুলোর নাম নিচে আলোচনা করা হলো:

১। *Loranthus longiflorus*
২। *Loranthus ampullaceus*
৩। *Loranthus capillatus*
৪। *Viscum articulatum*
৫। *Viscum monoicum*

পরজীবী গাছগুলোতে ফুল ধরার আগেই আক্রান্ত শাখা-প্রশাখা কেটে ফেলে দিতে হয়।

কলার ফল পচা বা ঢেঁকি রোগ (Anthracnose)

Gloeosporium musarum নামক আক্রমণে কলার ফল পচা রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ : কচি ফলের বোঁটার কাছাকাছি অংশে ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে। খোসার রঙ কিঞ্চিৎ কালো হয়। আর্দ্র আবহাওয়ায় আক্রান্ত অংশের বাদামি রঙের ছত্রাক রোগ লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠে। রোগের ফলে কলার শাঁসে দাগ ধরে; বেশি দিন ঘরে রাখা যায় না।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : কলার কাঁদি বের হওয়ার পর প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। পনের দিন পর আরও একবার এই ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার। বাগানে এ রোগের আক্রমণ ব্যাপক ও তীব্র হলে কাঁদি কাটার পনের দিন আগে পর্যন্ত প্রতিমাসে একবার করে ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত।

কাঁঠালের মুচি পচা রোগ (Inflorescence rot)

রোগজীবাণু : *Rhizopus atrocarı* নামক ছত্রাকের আক্রমণে কাঁঠালের মুচি পচা রোগ দেখা দেয়। সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ : রোগাক্রান্ত মুচির উপরে সাদা রঙের হালকা ছত্রাকের আস্তরণ পড়ে আস্তরণটির রঙ পরে কালচে হয়ে যায়। হাত দিলে মনে হয় হাতে নস্যির গুঁড়ো লেগেছে। পুরুষ ফুলে প্রথমে ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে। ক্রমশ স্ত্রী ফুলেও আক্রমণ সংক্রমিত হয়।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম ব্লাইটক্স ৫০ বা ফাইটোলান দু'বার প্রয়োগ করতে হয়। রোগের আক্রমণ ঘটলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন বা ১ মিলি. ক্যালিক্সিন গুলে গাছে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

কাঁঠালের অন্যান্য রোগ

রোগের নাম	রোগজীবাণু
১। পাতায় দাগ পড়া (Leaf spot)	*Colletotrichum lagenarium*
২। পাটল রোগ (Pink disease)	*Corticum salmonicolor*
৩। বাদামি পচা (Brown rot)	*Fomes noxius*
৪। কাণ্ড পচা রোগ (Stem rot)	*Phytopthora palmivora*

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : গাছের চারপাশে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। মুচি পচা রোগ নিবারণের জন্য সিঞ্চিত ওষুধে অন্যান্য ছত্রাক রোগেও কিঞ্চিদধিক উপশম ঘটে।

রোগ সংক্রমণকারী ছত্রাক গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ডে অবস্থান করায় সেই অংশটি বিদীর্ণ হয়ে ঘন তরল আঠালো পদার্থ নির্গত হয়। গুঁড়ি বা কাণ্ডে প্রথমে জলবসা ধরনের ক্ষত চিহ্নজনিত বড় বড় ছোপ (Water soaked alrge patches) দেখা যায়।

গাছের রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করে পুড়িয়ে ফেলা দরকার। আক্রান্ত ছাল ছুরি ইত্যাদির সাহায্যে চেঁছে বা কেটে ফেলে দিয়ে সেখানে বোর্দো পেস্ট লাগানো উচিত। গাছের কলম তৈরি করার সময় এলা গাছ Root stock হিসেবে কোনো টকজাতীয় লেবু গাছের চারা ব্যবহার করা উচিত।

লেবুর ডগা ছেঁকা রোগ (Wither tip)

রোগজীবাণু : *Colletotrichum glosporiodes* নামক ছত্রাকের আক্রমণে লেবুর ডগা ছেঁকা ডগার শুষ্ক ক্ষতরোগ হয়।

রোগের লক্ষণ : পত্র পল্লবের (twig) ধূসর রঙ এবং পাতা ঝরে পড়া এ রোগের একটি সাধারণ লক্ষণ। গাছের পুরানো পাতার ডগা ও কিনারায় ছত্রাকের আক্রমণজনিত ছোট ছোট দাগ

পড়ে। ডালপালার অগ্রভাগ সঙ্কুচিত এবং বিবর্ণ হয়ে থাকে। ডালপালাগুলো পরে ধূসর রূপালী রঙের হয়।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : গাছের সম্যক পুষ্টি ও বৃষ্টির প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। গাছে প্রয়োজন মতো (পূর্বোক্ত নিয়মে) ছত্রাকনাশক ওষুধ প্রয়োগ কালে সুফল পাওয়া যায়। অপুষ্ট শাখা-প্রশাখা ছেঁটে ফেলা দরকার। রোগাক্রান্ত ডালপালা ফল ইত্যাদি গাছ থেকে ছাঁটাই করে ফেলে বা পুড়িয়ে দিতে হয়।

লেবুর অন্যান্য ছত্রাকজনিত ব্যাধি

রোগের নাম	ছত্রাকের নাম
১। গুঁড়ো চিতি রোগ (Powdery mildew)	*Odium tingitanium*
২। শিকড় ধ্বসা রোগ (Root rot)	*Diplodia natalensis (Alternaria citri)*
৩। ফল পচা (Fruit infection)	*Ryzoctonia bataticola*
৪। অ্যানথ্রাকনোজ রোগ (Anthracnose)	*Colletotrichum gloporides*

পেয়ারার ঢলে পড়া রোগ (Wilt)

রোগজীবাণু : *Fusarium psidi, Macrophomina phaseoli, Cephalosporium* spp ছত্রাকের আক্রমণে পেয়ারা গাছে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

রোগের লক্ষণ : রোগাক্রান্ত গাছের পাতা বাদামি রঙের হয়। কাণ্ডকে বেষ্টন করে রোগের সংক্রমণ ঘটে। আক্রান্ত কাণ্ড কাটলে দেখা যায় যে, বৃক্ষত্বকের (cambium) বহুদূর পর্যন্ত রঙ কালো হয়ে গেছে। রোগাক্রান্ত গাছে ফল ধরে না

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : বাগানে বা গাছের গোড়ায় মাটি কুপিয়ে গন্ধকচূর্ণ প্রয়োগ করলে অথবা ছত্রাকনাশক মিশ্রণে (১ লিটার পানিতে ১ মিলি, ক্যালিকসিন অথবা ৩ লিটার পানিতে ১ গ্রাম ক্যাপটাফ) গাছের গোড়ায় বা বাগানের মাটি ভিজিয়ে দিতে হয়। রোগাক্রান্ত গাছ সমূলে উচ্ছেদ করে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

পেয়ারার অ্যানথ্রাকনোজ রোগ (Anthracnose)

রোগজীবাণু : *Colletotrichum psidi* নামক ছত্রাকের আক্রমণে পেয়ারার ঢেঁড়ি বা আঁচিল রোগ দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ : ফলের খোসার রঙ ঈষৎ বাদামি হয়। খোসার উপরে প্রায় গোল গোল গুটিকা বা আঁচিলের মতো উপাঙ্গ দেখা যায়। রোগাক্রান্ত ফল বেশি দিন ব্যবহার উপযোগী থাকে না।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : ফল ধরার আগে একবার এবং রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র ১৫ দিন পর পর দু'বার কোনো ছত্রাকনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিঃ ক্যালিকসিন অথবা ২ গ্রাম ক্যাপটাফ গুলে গাছে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পেয়ারার কাণ্ডদুষ্টি রোগ (Stem canker)

রোগজীবাণু : *Physalospora psidi* নামক ছত্রাকের আক্রমণে পেয়ারার কাণ্ডদুষ্টি রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ : প্রথমে ডালপালায় ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে। ডালপালায় চিড় (crack) ধরে। এই ক্ষতচিহ্ন (lesion) ক্রমে কাণ্ডের দিকে প্রসারিত হয়।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : আক্রান্ত চারাগুলোকে সমূলে উচ্ছেদ করে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। বর্ষার আগে যে কোনো ছত্রাকনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার।

পেঁপের গোড়া পচা রোগ (Foot root)

পেঁপের গোড়া পচা রোগ অতি মারাত্মক। *Pythium aphanidermatum* নামক ছত্রাকের আক্রমণে পেঁপের গোড়াপচা রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ : মাটির কাছাকাছি মূল ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে অর্থাৎ প্রথম কাণ্ড বেষ্টনীর (collar) উপরে পানি শোষিত নরম অংশ দেখা যায়. গাছের ডগার দিকের পাতাগুলো নেতিয়ে পড়ে এবং শুকিয়ে যায়। সেগুলোর রঙ হলদে হয় ও অকালে ঝরে পড়ে। রোগক্রান্ত শিকড়ে পচন ধরায় সেগুলো বিনষ্ট হয়।

প্রতিকার : কাণ্ডের রোগক্রান্ত অংশ চেঁছে ফেলে দিয়ে, সেখানে বোর্দো পেস্ট লাগিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। জমির মাটি যে কোনো ছত্রাকনাশক ওষুধের মিশ্রণ (১ লিটার পানিতে ১ মিলি, ক্যালিকাসিন বা ৪ গ্রাম ব্লাইটক্স ৫০) দিয়ে সিক্ত করা প্রয়োজন রোগ দেখা দেওয়া মাত্র সুস্থ এবং আক্রান্ত গাছের ব্লাইটক্স ৫০ (১লিটার পানিতে ৪ গ্রাম) অথবা কুমান–এল (১ লিটার পানিতে ৩ মিলি) ভালভাবে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

পেঁপের মোজাইক রোগ (ভাইরাস)

লক্ষণ : চারার আগার দিকে পাতায় রোগের প্রথম সংক্রমণ ঘটে। রোগের সংক্রমণে, বিশেষত কচি পাতাগুলো অত্যধিক বর্ণ বিকৃতি ঘটায়, পাতার উপরে বিচিত্র হলদে সবুজ দাগ (Mottling) দেখা যায় এবং পাতায় ভাঁজ পড়ে। রোগাক্রান্ত গাছের নতুন পাতাতেও অনুরূপ রোগ দেখা যায়। রোগের আক্রমণ সহ্য করে বেঁচে থাকা গাছে প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মের পরে অত্যধিক মাত্রায় রোগলক্ষণ ফুটে ওঠে। রোগ সংক্রমণকারী এই ভাইরাসটি পাপ্যায়া মোজাইক ভাইরাস নামে অভিহিত। কয়েক ধরনের জাবপোকা এই ভাইরাসের বাহক।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : ১) রোগাক্রান্ত গাছ সমূলে তুলে নিয়ে ফেলে বা পুড়িয়ে দিতে হয়। ২) কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে জাবপোকা দমন করলে রোগের সংক্রমণ বহুলাংশে হ্রাস পেতে পারে ৩) সুস্থ ও সবল চারা লাগাতে হয়।

নারকেলের মুকুল পচা রোগ (Bud rot)

ছত্রাকের নাম *Phytopthora palmivora* বর্ষার সময়ে এই ছত্রাক বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠে।

রোগের লক্ষণ : মাঝখানের কচিপাতায় অর্থাৎ হৃদ–পাতায় (Heart leaf) প্রকাশ পায়। ঐ পাতার স্বাভাবিক রঙের বিকৃতি ঘটে এবং সেগুলোকে হলদে বাদামি রঙের দেখায়। কিছুটা টান

দেওয়া মাত্র সেটিকে সহজেই শীর্ষদেশ বা মুকুট (crown) থেকে পৃথক করা যায়। পাতাগুলো সোজা না থেকে একটু নুয়ে পড়ে বা ভেঙ্গে গিয়ে ঝুলতে থাকে। পাতার রঙ বদলে গিয়ে মেটে হলুদ বা বাদামি রঙের হয়ে যায়। তীব্র আক্রমণের ক্ষেত্রে পুষ্পদণ্ড এবং পুষ্পশীর্ষসহ শীর্ষপত্র গুচ্ছ একেবারে পচে যাওয়ার ফলে বিনষ্ট হয়।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : আক্রান্ত স্থানটি ভালভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া (shave) এবং সেই সঙ্গে আক্রান্ত স্থানের চারপাশের কিছু নিরোগ পাতা অবশ্যই কেটে ফেলা দরকার। মাঝপাতা সহ গাছের শীর্ষদেশে যে কোনো ছত্রাকনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ক্যালিকাসিন অথবা ২ গ্রাম ক্যাপটাফ বা ৪গ্রাম ব্লাইটক্স ৫০ গুলে আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

নারকেলের কাণ্ডক্ষত (Stem bleeding)

এটি নারকেলের একটি ছত্রাকজনিত ব্যাধি। ছত্রাকের নাম *Ceratocystis paradoxa*

রোগের লক্ষণ : রোগের ফলে কাণ্ডের তলদেশে ত্বকক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেখানকার ভিতরের দেহকলায় পচন ধরে। আক্রান্ত দেহকলার রঙ হলদে হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত তরুণ গাছের কাণ্ড মজ্জাতে পচন ধরে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : ভালভাবে (ভিতরের ছিদ্রসহ) চেঁছে ফেলে দিতে হয়। ক্ষতস্থানকে বেষ্টন করে গরম আলকাতরা প্রয়োগ করতে হয় কাণ্ডের চারপাশে। তারপর গরম আলকাতরার সাথে কাঠের গুঁড়ো (sawdust) মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করে সেই মণ্ডের সাহায্যে ক্ষতের ছিদ্র ভরাট করে দিতে হয়।

নারকেলের রোগ

রোগের নাম	রোগজীবাণু সৃষ্টিকারীর মাধ্যম
১। পাতা ঝলসা/ধূসর পত্রক্ষত (Leaf blight or grey leaf spot)	*Pestalotia palmarum*
২। ঢলে পড়ে (Wilt)	*Ganodrma lucidum*
৩। ভাইরাসজনিত ঢলে পড়া (Virus wilt)	*Coconut virus*

পাতা ধ্বসা রোগে গাছের পাতায় ধূসর সাদা দাগ পড়ে। দাগের চারপাশে বাদামি রঙের ঘের বা বন্ধনী (band) দেখা যায়। পাতার ঝলসানো ভাব ফুটে উঠে এবং শুকিয়ে যায় পাতাটি। ঢলে পড়া রোগের ছত্রাক গাছের শিকড়ে সংক্রমণ ঘটায়। কাণ্ডে চিড় বা ফাটল দেখা যায় এবং ফাটলের ভিতর থেকে কালো বাদামি রঙের ক্ষতরস নির্গত হয়।

ভাইরাসের আক্রমণে পাতার সবুজ কণা বিনষ্ট হওয়ায় পত্রফলকে স্থানে স্থানে মিশ্র হলদে-সবুজ ছোপ (chlorotic) দেখা যায়। গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়

মাইকোপ্লাজমার সংক্রমণজনিত হলদে হওয়া রোগে গাছের পাতার রঙ মারাত্মকভাবে হলদে হয়ে যায়।

জমিতে নাইট্রোজেন, পটাশ এবং সালফারের অভাবে নারকেল গাছের কাণ্ডদুষ্টি রোগ হয়। পাতার রঙ হলদে হয়ে যায়, কাণ্ডের পরিধি ও শীর্ষদেশের আয়তন ক্রমশ হ্রাস পায়।

ছত্রাকজনিত রোগ দমনের জন্য গাছে যে কোনো ছত্রাকনাশক ওষুধ উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়।

ভাইরাস ও মাইকোপ্লাজমা রোগাক্রান্ত গাছ সমূলে উচ্ছেদ করে পুড়িয়ে ফেলাই বাঞ্ছনীয়।

কাণ্ডদুষ্টি রোগ দমনের জন্য মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে এমোনিয়াম সালফেট ও পটাশ সার ব্যবহার করা দরকার। গ্রীষ্মকালে জমিতে প্রচুর পরিমাণে সেচ দেওয়া উচিত।

গোড়ার মাটি খুঁড়ে শিকড়গুলো ভালভাবে ঢেকে দেওয়া উচিত। তাহলে গাছ গ্রীষ্মকালেও মাটি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রস শোষণ করতে সক্ষম হয়।

অরণ্য বৃক্ষের কাণ্ডদুষ্টি রোগ Stem canker of forest tree

Nectria cinnabarina নামক ছত্রাকের আক্রমণে নানা জাতের অরণ্য বৃক্ষের (বাগিচার ফল গাছেরও) কাণ্ডদুষ্টি রোগ হয়ে থাকে। ছত্রাকটি ক্ষত পরজীবী (wound parasite) হওয়ায় গাছের কোনো সুস্থ বা অক্ষত অংশে আশ্রয় নিতে অসমর্থ।

প্রথমে গাছের ছোট ছোট কচি ডালপালায় দুষ্টক্ষত (canker) দেখা যায়। ক্রমশ বড় বড় শাখা-প্রশাখায় এই ধরনের দুষ্টক্ষত ছড়িয়ে পড়ে। ডালপালাগুলো ডগা থেকে ক্রমশ নিচের দিকে শুকিয়ে আসতে থাকে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : আক্রান্ত ডালপালা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। ডাল কাটার পর বৃক্ষ সংলগ্ন কর্তিত অংশে (cut end) বোর্দো পেস্ট প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

বাঁশের রোগ

আমাদের দেশে বাঁশের রোগের মধ্যে পাতায় মরিচা পড়া (Foeiage rust), পাতায় দাগপড়া (leaf spot) এবং ক্ষয় ও বিবর্ণতা রোগই প্রধান। লাঠি বাঁশ *Dendrocalamus strictus* প্রায়ই ঐসব রোগে আক্রান্ত হয়। *Cladosporium gramineum* নামক ছত্রাক এবং *Fusarium* গণের একটি প্রজাতির আক্রমণে লাঠি বাঁশের ঐ সব রোগ হয়। *Bambusa* spp প্রজাতির কাঁটা বাঁশ বালকী বাঁশ, তরলা বাঁশ, জাওয়া বা বাঁশনী বাঁশ, কামলা বাঁশ প্রভৃতির পাতায় ছত্রাকের আক্রমণ ঘটিত দাগ পড়ে। *Diplozythiella bambusina* নামক এক ধরনের ছত্রাক ঐ সব বাঁশে এই রোগের আক্রমণ ঘটায়। *Phyllachora* spp প্রজাতির এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে বাঁশের পর্বমধ্যে কালো দাগ পড়া (tar spot) রোগের সংক্রমণ ঘটে। *Balladyna butleri* নামক ছত্রাকের আক্রমণে Bambusa প্রজাতির বাঁশ গাছের পাতায় কালো দাগ (black leaf spot) পড়ে। *Tunicospora bagchii* নামক ছত্রাকের আক্রমণে বাঁশের পাতা ও ছালে মরিচা রোগের লক্ষণ দেখা যায়। পাতা ও ছালে মরিচার মতো দাগ ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

ডাই ব্যাক (Die back) বা ডগার দিক থেকে শুকিয়ে আসা বাঁশের একটি অতি মারাত্মক ছত্রাকঘটিত ব্যাধি। এই রোগে আক্রান্ত বাঁশ এক বছরের মধ্যে শুকিয়ে মারা যায়। মুলি বাঁশ, জাওয়া বাঁশ, কাঁটা বাঁশ এবং ভালকী বাঁশের ঝাড়ে এই ধরনের ঝলসা রোগ হয়ে থাকে। *Sarocladium oryza* নামক এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ দ্বারা বাঁশ এই ঝলসা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ : আগুন দিয়ে বাঁশবনের মাটি শোধন করলে ছত্রাক রোগে অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায়। বাঁশের অনিষ্টকর কীটপতঙ্গ পুড়ে মরে যায়। পাতা পোড়ায় পটাশ সারের যোগান বৃদ্ধি করে। তাতে বাঁশ নিরোগ থাকে বাঁশের বৃদ্ধি হয়। বাঁশের কেঁড় ছেতো রোগে (shooty mould) আক্রান্ত হয় না।

ঝাড়ে ছত্রাকঘটিত রোগের সংক্রমণ দেখা দিলে যে কোনো ছত্রাকনাশক ওষুধ (১ লিটার পানি ২৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা ৩ মিলি কুমন এল বা ৪ গ্রাম ব্লাইটক্স ৫০ গুলে নিয়ে) বাঁশের কোঁগে চারা বাঁশে ও ঝাড়ের অন্যান্য বাঁশে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। রোগাক্রান্ত বাঁশ কেটে ঝাড় থেকে বের করে নিতে হয়।

পেঁপের চারা ধ্বসা ও কাণ্ড রোগ

রোগজীবাণু : এক জাতীয় ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : নার্সারিতে চারার গোড়া পচে যায়। সাধারণত অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত বা স্যাঁত-সেঁতে জমিতে এ রোগ দেখা যায়। কাণ্ড পচা রোগ হয়ে থাকে। মাটি থেকে সামান্য উপরে কাণ্ডে প্রথমে কালো দাগ পড়ে। দাগ বড় হয়ে আক্রান্ত অংশ পঁচে যায়।

প্রতিকার : ১) আক্রান্ত অংশে বোঁর্দোমিক্সার স্প্রে করলে গাছ রক্ষা করা সম্ভব।

নারকেলের মাথা কাটা বা গণ্ডার পোকা

আক্রমণকারী পোকা : গণ্ডার পোকা (*Oryctes rhinoceros*) নারকেলের মারাত্মক পোকা. গাছের মাথায় আক্রমণে শীর্ষপত্র বের হওয়ার পূর্বে খেয়ে ফেলে এবং কচি পাতা মেলার পর খাওয়া চিহ্ন দেখা যায়। এর কচি ফুল ও ফল আক্রমণ করে. গাছের ভিতর তৈরি নালার (tunnel) ভিতর ধাড়ী পোকা লুকিয়ে থাকে।

প্রতিকার : ১) গর্ত হেপ্টাক্লোর মিশ্রিত কাঁদামাটি দিয়ে ভরে দিতে হয়। ২) সৃষ্ট গর্তে লোহার সুচালো শলা দ্বারা পোকা মারতে হয়, এবং ৩) গাছের কাছাকাছি স্থানে গোবর, আবর্জনা রাখা সঙ্গত হবে না।

পেয়ারার ফোস্কা বা স্ক্যাব

রোগের লক্ষণ : কচি পেয়ারার গায়ে ছোট বড় দাগ পড়ে। দাগগুলো ক্রমান্বয়ে বড় হয় ও ফোস্কার আকার ধারণ করে। ক্ষত অংশ লালচে তামাটে রঙ ধারণ করে।

প্রতিকার : ফুল আসার সাথে সাথে রোভরাল (২ গ্রাম লিঃ) ২০ থেকে ২৫ দিন পরপর স্প্রে করলে রোগের প্রকোপ কমানো যায়।

লেবুর আগা মরা

রোগের লক্ষণ : ছত্রাক রোগের লক্ষণ চারা ও বয়স্ক গাছের ডাল উপর থেকে শুকিয়ে নিচের দিকে আসে এবং ধীরে ধীরে গাছ মরে যায়।

প্রতিকার : আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলে তথায় বোঁর্দো পেস্ট লাগিয়ে দিলে এবং আক্রান্ত অংশে বোঁর্দোমিক্সার স্প্রে করে রোগ দমন করা সহজ।

লেবুর স্ক্যাব

পাতা, ডাল ও ফলে দাদের মতো ফোস্কা দেখা যায় বর্ষাকালে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। বর্ষার প্রারম্ভে ডাল ছেঁটে বোঁর্দোমিক্সার স্প্রে করলে রোগ দমন সহজ হয়।

সুপারির মাথা মরা বা ডাইবে রোগ

রোগজীবাণু : *Fusarium* spp. নামক ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : এটি এক জাতীয় ছত্রাক রোগ বিশেষ করে ছত্রাক গাছের মূলের দুর্বল অংশে প্রথমে আক্রমণ করে এবং ধীরে ধীরে মূলের বিভিন্ন অংশে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে মূল পচতে শুরু করে এবং গাছের পাতার অগ্রভাগে বিবর্ণ হয়ে যায়। গাছের পাতার খোল (Sheath) পর্যন্ত শুকাতে হয়।

প্রতিকার : ১) আক্রান্ত গাছের গোড়ায় ও মাথায় ১ লিটার বোর্দো মিক্সার প্রয়োগ করতে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য ছত্রাকনাশক যেমন কুপ্রাভিট, ডায়থেন এম–৪৫ এন্টিকল (৪গ্রাম/২লিঃ) পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের গোড়ায় ও মাথায় প্রয়োগ করতে হয়।

গাছের হার্ট পচা (Heart) রোগ

রোগজীবাণু : এক জাতীয় ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : এ রোগকে সাধারণভাবে গাছে শোল পড়া বলে। কাণ্ডের মধ্যাংশের পিথ পচে গিয়ে গাছে শোল পড়ে। একেই হার্ট পচা বলে

প্রতিকার : গাছের ডালপালা করাত বা ধারালো দা দ্বারা সমানভাবে কাটতে হয়। কর্তিত অংশে আলকাতরা বা বোর্দোমিক্সার লাগাতে হয়।

শালের হার্ট ছিদ্রক পোকা

আক্রমণকারী পোকা : *Hoplocerambys spinciornis* নামক বিটল।

রোগের লক্ষণ : শাল গাছে বিটল জাতীয় পোকার আক্রমণে হার্ট বিনষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার : ১)বর্ষার পূর্বে শালগাছ কাটা পরিহার করতে হয়। ২) আক্রান্ত গাছ কেটে ফেলে তাড়াতাড়ি ব্যবহার করতে হয়।

বাঁশের মাথা পচা রোগ

রোগজীবাণু : এক জাতীয় ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : কাণ্ডের মরা অংশ ক্রমে ফিকে–লাল বর্ণ হয়ে পড়ে ও ডোরাকাটা দাগ দেখা যায়।

প্রতিকার : ঝাড়ে ছত্রাকনাশক বোর্দোমিক্সার, ডাইথেন এম ৪৫ প্রয়োগ করতে হয়।

আনারসের কাণ্ড পচা রোগ

এরোগ এক জাতীয় ছত্রাক *(Phyophthora parasitica)* দ্বারা হয়ে থাকে। এতে গাছের কাণ্ড পচে যায়। জমিতে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকলে এ রোগ বেশি হয়।

প্রতিকার : ১) এগালল ২ বা বাভিস্টিন ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়। ২) জমিতে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয়।

কাঁঠালের ফল পচা রোগ

এক জাতীয় ছত্রাকের *(Rhizophus artocarpi)* আক্রমণে মুচি ছোট অবস্থায় পচে গাছ থেকে ঝরে যায়।

প্রতিকার : ১) ক্যালিক্সিন বা ব্রাইটঙ্গ পানিতে মিশিয়ে মুচি বের হওয়ার পূর্বে ও পরে ২ বার স্প্রে করতে হয়।

লিচুর মাকড় মাকড়সা

লিচু গাছের মাকড় (*Aceria litchi*)-এর আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। এটি সাদা রঙের ছোট কীট, পাতার নিচে থাকে এবং পাতার উপরিভাগে বাদামি ভেলভেটের মতো আবরণ সৃষ্টি হয় ও পাতা শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার : আক্রান্ত পাতায় ও ডালে কেলথেন বা ডাইমেথয়্যাট ফুল আসার দু'মাস পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়।

সেগুনের ক্যাংকার বা গ্রাব রোগ

দুই থেকে ছয় বছর বয়সের গাছের মাটি সংলগ্ন কাণ্ডে লম্বা শিংধারী বিটল (*Disammus cervinus*) গাছের কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে। এতে কাণ্ড দুর্বল হয়ে বাতাসে গাছ ভেঙে পড়ে।

প্রতিকার : ভেঁট গাছ আশে পাশে এলাকা হতে পরিষ্কার করতে হয় ফুরাডান ৩ জি (৬গ্রাম/গাছ) আক্রান্ত গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হয়।

গামার গাছের নিষ্পত্রক পোকা

গামার বাগানে *Craspedonta elayana* Latre নামক বিটলের আক্রমণে পাতায় বড় বড় গোলাকার ছিদ্র তৈরি হয়।

প্রতিকার : ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা লেবেসাইড ৫০ ইসি (২৩মিঃ/১০লিঃ পানি) স্প্রে করতে হয়।

শিমুল শাখা ছিদ্রক পোকা

শিমুল গাছে *Tonica niviferana* W নামক পোকার লার্ভা পাতার শীর্ষ ও শাখা শীর্ষ ছিদ্র করে নালা তৈরি করে।

প্রতিকার : ১) বাইড্রিন ৮৫ ইসি ০.০২% হারে পাতায় স্প্রে করতে হয়। ২) সেভিডুল বা ফুরাডান ৩জি (৬গ্রাম/গাছ) আক্রান্ত চারার গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

কেওড়া কাণ্ড ছিদ্রক পোকা

উপকূলীয় বনাঞ্চলে কেওড়া গাছে সাম্প্রতিককালে *Zewjera conforta* ও *Calfia lintola* নামক পোকার লার্ভা কাণ্ড ও শাখা ছিদ্র করে। এতে গাছে দুর্বল হয়ে যায় এবং ঝড়ের সময় ভেঙ্গে পড়ে।

প্রতিকার : আক্রান্ত গাছের ছিদ্র ডায়াজিনন ৬০ ইসি (৩০মিঃলিঃ/১০মিঃলিঃ পানি) সিরিঞ্জ দিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

আমড়া গাছের নিষ্পত্রক পোকা

এক জাতীয় হলুদ ডোরাকাটা বিটলের শূককীট ও পূর্ণাঙ্গ পোকা কচি পাতা খেয়ে গাছকে পত্রশূন্য করে ফেলে।

প্রতিকার : ডায়াজিনন, সেভিন বা এলথিও প্রয়োগ করতে হয়।

নারকেলের উইপোকা

এক জাতীয় উই *(Odontotermes obsesus)* নারকেল চারার মারাত্মক শত্রু। নারকেল চারা অবস্থায় শিকড় আক্রমণ করে এবং শিকড় নষ্ট করে দেয়।

প্রতিকার : চারার গোড়ায় চক্রাকারে গর্ত করে ৫% গুঁড়া হেপ্টাক্লোর বা ডাইয়েলড্রিন মিশাতে হয়।

পেয়ারার সাদা শোষক পোকা

Cryptolemus spp. এক জাতীয় শোষক পোকা পাতার রস চুষে নেয়।

প্রতিকার : থাইমেট বা ডাইয়েলড্রিন দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি শোষণ করতে হয়।

কুলের বিছা পোকা

Euproctis fraena জাতীয় পোকার লার্ভা কুলের পাতা খেয়ে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

প্রতিকার : মেলাডান বা ফ্রেনিট্রোথিয়ন প্রয়োগে পোকা দমন করা যায়।

নারকেলের লাল কেড়ি পোকা

এক ধরনের লাল কেড়ি পোকা *(Rhynchorus feerugineus)* গাছের মাথার নিচের গর্ত করে ডিম পাড়ে। ডিম হতে শূককীট বের হয়ে কাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করে।

প্রতিকার : কাণ্ডের গর্তে হেপ্টাক্লোর বা ডাইয়েলড্রিন মিশ্রিত কাদা মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়।

কড়ই গাছের নিষ্পত্রক পোকা

এক জাতীয় প্রজাপতির শূককীট কড়ই গাছের কচি পাতায় আক্রমণ করে এবং মুখের লালা নিঃসৃত সুতার সাহায্যে পাতার সাথে জড়িয়ে থাকে। গাছ পত্রশূন্য হয়ে পড়ে।

প্রতিকার : ডায়াজিনন ৬০ ইসি প্রতি ১০ লিটারে ৩৫ মিলিলিটার মিশিয়ে স্প্রে মেশিন দিয়ে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর দু'বার প্রয়োগ করতে হয়।

কড়ই পাতার রস শোষক পোকা

ক্ষুদ্রাকৃতির পাতায় শোষণের ফলে পাতা ও ডাল কুঁচকে যায়। এ পোকার গায়ের রঙ সাদা।

প্রতিকার : কড়ই নিষ্পত্রক পোকার মতো।

পেয়ারার ক্যাংকার রোগ

রোগজীবাণু : *Physalospora psidi* নামক ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণ কাণ্ডে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার : সেলভিয়ন প্রয়োগ করতে হয়।

কুলের গুঁড়োচিতি রোগ

রোগজীবাণু : *Odium erysiphpides*

রোগের লক্ষণ : কুল গাছের পাতা পাউডারের মতো সাদা প্রলেপ তৈরি করে। এরা ফলের রস চুষে স্বাদ নষ্ট করে দেয়।

প্রতিকার : গন্ধক বা চুন গন্ধক মিশায়ে পাতায় ছিটালে এ রোগ দমন হয়।

বেলের মরচে পড়া রোগ

রোগজীবাণু : *Xanthomonas bilvae* নামক ব্যাকটেরিয়া।

রোগের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণে পাতায় খয়েরি রঙের গোল গোল দাগের সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার : কুপ্রাভিট প্রয়োগ করতে হয়।

ডালিমের পাতার দাগ রোগ

রোগের লক্ষণ : এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় কাল দাগের সৃষ্টি হয় এবং পরে ফলেও ছড়াতে পারে।

প্রতিকার : ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োগ করতে হয়।

আমলকি পাতার মরিচা পড়া রোগ

রোগজীবাণু : *Revenellia emblica*

রোগের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণে আমলকির পাতায় খয়েরি দাগ পড়ে।

প্রতিকার : ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োগ করতে হয়

খেজুরের পাতার দাগ রোগ

রোগের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণে খেজুরের পাতার উপর ও নিচে ছোট ছোট কালো ফোঁটা দেখা যায়।

প্রতিকার : নতুন পাতায় ফাইটোলান প্রয়োগ করতে হয়।

সুপারির গোড়া পচা রোগ

রোগজীবাণু : *Ganoderma lucidum*

রোগের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণে শিকড় পচে যায়। মাথা শুকিয়ে ঝড়ে পড়ে। পাতাহীন অবস্থায় গাছ দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রতিকার : ডাইথেন বা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রয়োগ করতে হয়।

সুপারি কুঁড়ি পচা রোগ

রোগজীবাণু : *Phytopthora arecae*

রোগের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণে সুপারির ডগা বা কচি পাতা পচে যায়।

প্রতিকার : কপার অক্সিক্লোরাইড বা কুপ্রাভিট প্রয়োগ করতে হয়।

আমড়ার আগা মরা রোগ

রোগজীবাণু : এক প্রকার ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণে আমড়া গাছের আগা বা ডালপালায় আগা মরতে শুরু করে।

প্রতিকার : ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োগ করতে হয়।

কাজু বাদামের ঢলে পড়া রোগ

রোগজীবাণু : *Fusarium* spp. *Pythium* spp. এবং *Phytophthora* spp নামক ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণে পাতা শুকিয়ে হেলে পড়ে। বীজতলায় নতুন চারা এ রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার : ডাইথেন এম-৪৫ কপার অক্সিক্লোরাইড বা কুপ্রাভিট প্রয়োগ করতে হয়।

ফলের পোকা মাকড় ও প্রতিকার

১। **ফলের মাছি** (Fruit Fly): আম, পেয়ারা, কুল, তরমুজ, ফুটি, লাউ, কুমড়া। মাছি চর্মের নিচে ডিম পাড়ে। ডিপ্টেরেক্স নেসসিয়ন, ম্যালাথিয়ান, ভাইব্রম ছিটানো।

২। **ফলের ভোমরা** (Fruit weevil) : আম। কীড়া কচি ফলে ঢুকে শাঁস খায়। ম্যালাথিয়ন, নেকসিয়ন, ডায়াজিনন, সুমিথিয়ন। ফল ও পোকা ধ্বংস করা।

৩। **ফলের মাজরা** (Fruit Borer) : কাঁঠাল, বেল, আতা, শরীফা। কীড়া কিংবা শুঁয়াপোকা কুঁড়ি ও মুছিতে গর্ত করে ঢুকে। ভাইব্রম, কার্বিক্রন, ডাইমেক্রন, বাইড্রিন, ডায়াজিনন প্রয়োগ।

৪। **ডগার মাজরা** (Shoot Borer) আম। পোকা ও কীড়া কচি ডগা ছিদ্র করে। মেটাসিস্টক্স, টিউপিপি, ডাইমেক্রন, কার্বিক্রন, লেবাসিড।

৫। **কাণ্ড মাজরা** (Stem Borer and Trunk Borer) : আম, লিচু, পেয়ারা, কমলা, কাঁঠাল, চা, কফি বাঁশ। সুড়ঙ্গ হয়। মেটাসিস্টক্স, টিউপিপি, ডাইমেক্রন, কার্বিক্রন, লেবাসিড প্রয়োগ।

৬। **কাণ্ডের উইভিল** (Stem weevil) : কলা। কাণ্ড, খোল ইত্যাদিতে সুড়ঙ্গ করে। ডাইমেক্রন, মেটাসিস্টক্স, বাইড্রিন, বাগান পরিচ্ছন্ন রাখা।

৭। **শোষক** (Hopper) আমের পাতা, ফুল ও ফল চুষে। ফলের গুটি করে সেভিন মেকইসয়ান, ম্যালাথিয়ন, ডাইমেক্রন,বাইড্রিন। পাতা ও কচি ফলে ওষুধ ছিটানো।

৮। **ছাতরা বা শোষক পোকা** (Mealy Bug) আনারস, পেয়ারা, লেবুজাতীয় ফল, কুল সফেদা, সুপারি, বেগুন টমেটো। অ্যানথায়ো, ডাইমেথোয়েট, ম্যালাথিয়ন, নেকসিয়ন।

৯। **কাঁচ পোকা** (Banana Beetle) : পোকা কচি কলা ও পাতায় দাগ সৃষ্টি করে। বাইড্রিন, ফেনিটোথ্রিয়ন, সুমিথিয়ন

১০। **জাবপোকা** (Aphids) : পোকা পেয়ারা পাতার রস চুষে পাতা কোঁকড়ায়। ডাইমেথোয়ো, এনথায়ন, নেকসিয়ন প্রয়োগ।

১১। **গান্ধী পোকা** (Orange Bug) : বাচ্চা ও বয়স্ক পোকা ফসলের রস চুষে। ম্যালাথায়ন, ডাইমেথোয়েড, লেবাসিড, ডায়াজিনন।

১২। **লেবু প্রজাপতি** (Lemon Buterfly) : শুঁয়োপোকা পাতা খায়। পেনিট্রোথায়ন, ডায়াজিনন, মিথাইল প্যারাথায়ন, বাইড্রিন।

১৩। **ডালিম প্রজাপতি** (Butterfly) : কীড়া কচি ফলের ভিতর গর্ত খুঁড়ে। ডাইমেক্রন, ডায়াজিনন, ফেনিটোথ্রায়ন প্রয়োগ বর্ষা মৌসুমে পক্ষকাল পরপর।

সবজির পোকা দমন

সবজির বিভিন্ন প্রকারের পোকা এবং তাদের দমনে ব্যবহার্য ওষুধ

পোকার নাম	আক্রান্ত সবজি	ওষুধের নাম	প্রতি ৫ লিটার পানিতে ওষুধের পরিমাণ
গাছের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	বেগুন, ঢেঁড়শ	রিপকর্ড-১০ ইসি সিমবুশ-১০ ইসি	৫ লিটার
		অ্যারো সাইপার মেথিন-১০ ইসি বেথ্রয়েড-৫ ইসি সুমি সাইডিন ২০ ইসি	৫ মিলিলিটার ২.৫ মিলিলিটার
ফলের মাছি পোকা	করলা, কাকরল, উচ্ছে শসা, লাউ, কুমড়া	ডিপটেরকস-৮০ এসপি	
কাঁঠালে পোকা	বেগুন, শিম, করলা কাঁকরল, লাউ, কুমড়া	রিপকর্ড-১০ ইসি সুমি সাইডিন-২০ ইসি	৫ মিলিলিটার ২.৫ মিলিলিটার
লাল পাম্পকিন বিটল	করলা, কাকরল উচ্ছে ঝিঙ্গা, শশা, কুমড়া	সিপসিন-৭৫	৫ গ্রাম
		সেভিন-৮৫ ডব্লিউপি কারবারিল-৮৫ ডব্লিউপি	৫ গ্রাম
জাবপোকা ও লেদাপোকা	টমেটো, শিম, বেগুন, বাঁধাকপি, শসা, বাটি শাক	ম্যালাথিয়ন-৭৫ ইসি মিথিয়ন ৫৭ ইসি ফাইফানন-৫৭ ইসি	১০ মিলিলিটার ১০ মিলিলিটার

সবজির রোগ দমন

রোগের নাম	সবজির নাম	দমন ব্যবস্থা
পাতায় দাগ পড়া রোগ	টমেটো, বেগুন, কুমড়াজাতীয় গাছ ঢেঁড়শ, মূলা শিম	ডায়থেন এমন-৪৫ (৫ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম) বাগানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
এনথ্রাকনোজ বা ঝলসানো রোগ	টমেটো, ডাঁটা, শিম, কুমড়া, মরিচ	বোর্দোমিশ্রণ (শতকরা ১ ভাগ) সিরেসন ০.২% দিয়ে বীজ শোধন
মরচে পড়া রোগ	শিম, বরবটি, মটরশুঁটি	জায়নেব/ফার্বম-৩ (৫ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম) ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পোড়ানো, সুস্থ বীজ ব্যবহার
পাউডারি মিলডিউ	কুমড়াজাতীয় গাছ, পালংশাক	কারথেন/থিয়োভিট (৫ লিটার পানিতে ৮/১০ গ্রাম)

ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট বা নেতিয়ে পড়া	টমেটো, বেগুন, আলু মরিচ	রোগাক্রান্ত গাছ ধ্বংসকরণ, আক্রান্ত জমিতে আক্রমণযোগ্য সবজির চাষ বন্ধ রাখা ও মাটি শোধন
মোজেইক বা ভাইরাস নাবি ধ্বসা রোগ ফাইটোফথোরা ব্লাইট	টমেটো, বেগুন, মরিচ, শিম টমেটো, আলু পানি কচু, মুখী কচু	রোগাক্রান্ত গাছ ধ্বংসকরণ, জাবপোকা নিধন ডায়থেন এম-৪৫ (৫ লিটার-১০ গ্রাম), বোর্দোমিশ্রণ রিডোমিল/ডাইথেন এম-৪৫ (৫ লিটারে-১০ গ্রাম

কীটনাশক ব্যবহারে সাবধানতা

ক) ওষুধ প্রয়োগের পূর্বে

১) কোনো ঘা বা চর্মরোগী দিয়ে ওষুধ ছিটানো উচিত নয়।

২) নার্সারিতে বা জমিতে ওষুধ প্রয়োগের আগে লোকজনকে জানানো প্রয়োজন।

৩) ওষুধের লেবেল ভালভাবে পড়ে নিতে হয়।

খ) ওষুধ প্রয়োগের সময়

১) অনুকূল বাতাসে ওষুধ ছিটাতে হয়।

২) হাতে দস্তানা পরে, রবারের জুতা, চোখে প্লাস্টিকের চশমা, শরীর ঢেকে রাখার জন্য এপ্রোন পড়তে হয়।

৩) ঠিক ওষুধ, ঠিকমাত্রায় ঠিক প্রয়োগ করতে হয়।

৪) কোনো প্রকার খাওয়া-দাওয়া বা ধুমপান করা যাবে না।

৫) ঝড় বাদলের দিনে ওষুধ প্রয়োগ ঠিক নয়।

৬) ছয় ঘন্টার বেশি একজন লোক ওষুধ ছিটানো উচিত নয়।

গ) ওষুধ প্রয়োগের পর

১) শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য রোগীকে খোলা জায়গায় শুয়ে থাকতে হয়।

২) পেটে কীটনাশক প্রবেশ করলে বমি করার ব্যবস্থা নিতে হয়।

৩) ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় (ব্যবহৃত ওষুধ নিয়ে বা লেবেল নিয়ে)।

বৃক্ষের প্রধান প্রধান পোকামাকড়

১) পোকা পাতামোড়ানো (Leaf roller) : এসব পোকামাকড় চারার পাতা এবং কচি আগা অনবরত কামড়িয়ে গুটিয়ে তাতে বাস করে।

২) পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা (Leaf Minor) : পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা পাতার উপরের ত্বকের ভিতর সরু নালা করে।

নিয়ন্ত্রণ : এসব পোকামাকড় দমনের জন্য ২০ মিলি লিবাসিড ৫০ ইসি বা মেলাডান ৬৭ ইসি সুমেথিয়ন ইসি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত চারাগাছে প্রয়োগ করতে হয়।

৩) রস শোষক পোকামাকড় : এসব পোকামাকড় রসালো পাতা, কুঁড়ি এবং কাণ্ড খায় এবং কোষ হতে রস বের করে গাছকে আক্রান্ত করে। কয়েকটি রস শোষক, যেমন- সাদা মাছি

থ্রিপস, জেসিডস, জাবপোকা ইত্যাদি ভাইরাস বাহক হিসেবে কাজ করে এবং সুস্থ অন্য গাছে ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

নিয়ন্ত্রণ : ২০ মি.লি. লিবাসিড ৫০ ইসি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত চারায় প্রয়োগ।

৪) জাবপোকা (Aphid) : এ পোকা ছোট, সাধারণত সবুজ বর্ণের, তবে কালো ও বাদামি রঙের দেখা যায়। পাতার রস শুষে নেওয়ার ফলে ধীরে ধীরে পুরো পাতা বিবর্ণ হয়ে ঝরে যায়। এ পোকা দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন, ডায়াজিনন ও সেভিন পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।

৫) মাকড় (Mite) : অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার অষ্টপদী পোকা, লাল, সাদা ও ঘিয়ে রঙের হয়। পাতার নিচের দিকে পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত পাতা ও কাণ্ড কুঁকড়ে যায়। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৬) কৃমি (Annelids) : খালি চোখে দেখা যায় না। এ পোকার আক্রমণের লক্ষণ হলো শিকড়ের মধ্যে ছোট ছোট গিঁট দেখা যায়। আক্রান্ত গাছকে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

৭) মিলিবাগ (Milibugs) : ছোট পোকা, এরা প্রায় অনড়। উদ্ভিদের কচি পাতার রস চুষে খায়। আক্রান্ত অঙ্গ তুলার মতো সাদা আবরণে ঢাকা থাকে। ম্যালাথিয়ন নগস বা ফাইফানন স্প্রে করতে হয়।

৮) স্কেল পোকা (Scale insects) : ছোট, বাদামি রঙ পাতার নিচে এবং পাতার মধ্য শিরায় গল আকৃতির সৃষ্টি করে। পূর্ণাঙ্গ পোকা শক্ত আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। গাছে ম্যালাথিয়ন ছিটাতে হয়।

৯) লাল মাকড়সা (Red Spiders) : পাতায় রস শোষণ করে পাতায় হলদে বর্ণের দাগ সৃষ্টি হয়। ম্যালাথিয়ন ছিটিয়ে দেওয়া দরকার।

১০) থ্রিপস (Thrips) : পোকা দেখতে খুব ছোট, ১ থেকে ২ মিঃ মিঃ লম্বাটে, বাদামি বর্ণের হয়। আক্রমণ হলে পাতায় সাদা দাগের সৃষ্টি হয় এবং রস চুষে খায়। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১৫ ঘঃ সেঃ নগস বা ম্যালাথিয়ন প্রয়োগ করে পোকা দমন করা যায়।

১১) বিটল (Beetle) : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের বর্ণ উজ্জ্বল ও দেহ একাধিক বর্ণে বিচিত্রিত। এরা উদ্ভিদের পাতা, কচি কাণ্ড ও ফুল চিবিয়ে খায়।

প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১৫ থেকে ২০ ঘঃ সেঃ ডায়াজিনন ৫০ ইসি অথবা নেক্সিয়ন ২৫ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন অথবা ৮ থেকে ১০ ঘঃ সেঃ ডাইমেক্রেন গুলে প্রয়োগ করলে সহজেই বিটল দমন হয়।

১২) উইভিল বা ঢেলে পোকা (Weevil) : উইভিল দেখতে অনেকটা বিটল–এর মতো, প্রধান ব্যবধান এই যে এর সামনের দিকে শুঁড়ের ন্যায় বর্ধিত অঙ্গ থাকে। পূর্বে বর্ণিত উপায়ে উইভিল দমন করা যায়।

১৩) বিছা ও লেদাপোকা (Caterpillars) : লোমশ হলে এদেরকে বিছা ও লোমহীন হলে লেদাপোকা বলা হয়। এরা প্রধানত পাতা ও কচি ডগা খেয়ে উদ্ভিদের ক্ষতি করে। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০–১৫ ঘঃ সেঃ ম্যালাথিয়ন অথবা সমপরিমাণ নগস কিংবা সুমিথিয়ন প্রয়োগে এটা সহজেই দমন হয়।

নার্সারিতে কীটনাশক নির্বাচন

১। **পিঁপড়া, কাটুই পোকা ও উঁই পোকা :** হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডেন, থিওডান, ডায়েলড্রিন, (১০ লিটার পানিতে ৪০ মিঃলিঃ) বাউড্রিন, বাসুডিন, কেরোসিন মিশ্রিত খৈল ইত্যাদি।

২। **লেদাপোকা :** ম্যালাথিয়ন, নগস, ভেপোনা, রিপকর্ড, সেভিন, বাইড্রিন, ও ডায়াজিনন ইত্যাদি।

৩। **পাতার শোষক পোকা :** ম্যালাথিয়ন, রিপকর্ড, ডাইমেক্রন, বাইড্রিন,সেভিন, এগ্রোসাইড ইত্যাদি

৪। **পামরী পোকা :** এনড্রিন, রিপকর্ড, এগ্রোসাইড, সেভিন, বাইড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ডায়াজিনন ইত্যাদি।

৫। **বিছা, চুঙ্গি ও অন্যান্য পোকা :** এনড্রিন, বাইড্রিন, নেক্সিয়ন, ডায়াজিনন, বি-এইস-সি, সেভিন ৮০% এসপি ইত্যাদি।

৬। **জাব পোকা :** ম্যালাথিয়ন, সেফস, এফিডান, ডাস্টিং ইত্যাদি।

৭। **ছত্রাক বা ড্যাম্পিং অব রোগ :** বোঁর্দেমিক্সার, বোঁর্দো পেস্ট, কুপ্রাভিট ডায়থেন এম-৪৫, এন্টিকল,গ্রানোসান-এম, এগ্রোসান-জি এন, থিউভট, সেরেসান, এরাসান, এরিটান-৬, ভিটাভেক্স-২০০, বার্গান্ডি মিক্সার, চুন মিশ্রিত গন্ধক,ফরমালিন, সালফিউরিক ক্লোরাইড, চেসান্ট কম্পাউন্ড ইত্যাদি।

১। **বোঁর্দেমিক্সার তৈরি :** ইটা চুন ও তুঁতের মিশ্রণ। এ প্রস্তুতে ৪ পাউন্ড চুন, ৪ পাউন্ড তুঁত ও ৫০ গ্যালন পানি ব্যবহৃত হয়। চুন ঃ তুঁতে ঃ পানি হবে ১ ঃ ১ ঃ ৫০০। অর্থাৎ ৫০ কেজি বোঁর্দো তৈরি করার জন্য প্রথমে ১০০ গ্রাম তুঁত ২৫ কেজি পানিতে উত্তমভাবে মিশাতে হয়। অপর পাত্রে ১০০ গ্রাম চুনার সাথে পানি ছিটিয়ে স্লোকেড লাইম তৈরি করা হয় এবং বাকি পানি মিশানো হয়। একটি তৃতীয় পাত্রে একই সময় চুনা ও তুঁতে গোলা পানি একই সাথে ঢালতে হয়।

২। **বোঁর্দো পেস্ট :** পানির পরিমাণ কম দিয়ে বোঁর্দেমিক্সারের মতো বোঁর্দো পেস্ট তৈরি করা হয়। একটি পাত্রে ৪৫০ গ্রাম তুঁতে ৪.৫ কেজি পানিতে দ্রবীভূত করা হয় এবং অপর পাত্রে ৪৫০ গ্রাম চুন ৪.৫ কেজি পানিতে তুঁতের দ্রবণ ঢালতে হয় — এভাবে পেস্ট তৈরি হয়। এটি গাছের কর্তিত শাখা-প্রশাখায় ব্যবহৃত হয়।

৩। **বার্গান্ডি মিক্সার :** ১০০ গ্রাম তুঁতে ১২৫ গ্রাম কাপড় কাঁচা সোডা ও ১০ লিটার পানি মিশিয়ে বোঁর্দেমিক্সারের মতো একই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়।

৪। **চুনমিশ্রিত গন্ধক :** ১০০ গ্রাম চুন, ১০০ গ্রাম গন্ধক ও ৭ লিটার পানি মিশিয়ে বোঁর্দো মিক্সারের মতো একই পদ্ধতিতে মিশ্রণ তৈরি করা হয়।

নার্সারি রোগ

১। কালোজামের পাতার দাগ রোগ

রোগের লক্ষণ : আক্রান্ত পাতা লাল খয়েরি দাগের মতো যায়।

প্রতিকার : ১) আক্রান্ত পাতা ছিঁড়ে পুড়ে ফেলতে হয়।

২) ডায়থেন বা বোঁর্দোমিশ্রার প্রয়োগ করতে হয়।

২। **শালের চারার পাতা ঝলসানো রোগ (Leaf blight of Sal)**

রোগের লক্ষণ : অনিয়মিত লালচে বাদামি রঙের ঝলসানো এলাকা পাতার কিনারা হতে শুরু হয়।

প্রতিকার : ক্যুপ্রাভিট বা ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োগ করতে হয়।

৩। **শিমুলের আগা মরা (Die-back of Shimul)**

রোগের লক্ষণ : চারার আগা মরা নিচের দিকে ছড়াতে থাকে।

প্রতিকার : ক্যুপ্রাভিট বা ডায়থেন এম-৪৫ প্রয়োগ করতে হয়।

৪। **লেবু চারার অ্যানথ্রাকনোজ রোগ**

রোগের লক্ষণ : লেবু ও কাগজি লেবুর প্রান্তীয় শাখায় এ রোগ হয়। শাখাগুলো ক্রমাগত শুষ্ক হয়ে আসে, পাতায় ধূসর বর্ণের ছোট ছোট পানি পচা দাগ দেখা দেয়।

প্রতিকার : আক্রান্ত গাছে ১ শতাংশ বোঁর্দোমিশ্রার বা ক্যুপ্রাভিট ৫০ গ্রাম ডব্লিউপি ৬৯ গ্রাম প্রতি ১১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।

৫। **ইউক্যালিপটাসের ড্যাম্পিং অফ রোগ**

রোগের লক্ষণ : যখন বীজ মাটির নিচে পড়ে ফাটতে শুরু করে তখন ছত্রাক বীজকণা বীজে প্রবেশ করে অঙ্কুরোদগম বন্ধ করে দেয় এবং বীজটি নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার : ১) মাটির মিশ্রণ বিশুদ্ধ (sterilized) করে বীজ বপন করতে হয়।

২) কুপ্রাভিট বা ডায়থেন প্রয়োগ।

৬। **আকাশমনির মূলচটা রোগ**

রোগের লক্ষণ : রোগাক্রান্ত চারার পাতা হলুদ হয়ে যায়। প্রথমে প্রধান মূলের আগা পচে যায়।

প্রতিকার : ১) নার্সারির পানি সেচ কমাতে হয়। মাটি যাতে স্যাঁতসেঁতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

৭। **গামারের মূলপচা রোগ**

রোগের লক্ষণ : নার্সারির মাটি স্যাঁতসেঁতে বা ভিজা থাকলে এ রোগ হতে দেখা যায়। প্রথমে চারার মূল পচে যায়।

প্রতিকার : কুপ্রাভিট বা ডায়থেন এম-৪৫ প্রয়োগ করতে হয়।

৮। **পেঁপের চারার ঢলেপড়া রোগ**

রোগের লক্ষণ : এ রোগে আক্রান্ত হলে পেঁপের চারার কাণ্ড ও পাতা শুকিয়ে যায় এবং চারা ঢলে পড়তে শুরু করে।

প্রতিকার : বোঁর্দোমিশ্রার প্রয়োগ করতে হয়।

৯। **কাঁঠালের পাতার দাগ রোগ**

রোগের লক্ষণ : রোগের আক্রমণে পাতার উপর ক্ষুদ্র দাগ পড়ে। এ দাগ ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং মেরুন বা লালচে বাদামি রঙ ধারণ করে।

প্রতিকার : এ রোগ দমনের জন্য ১% বোঁর্দোমিশ্রার ২/৩ বারে প্রয়োগ করতে হয়।

১০। দেবদারুর পাতার দাগ

রোগের লক্ষণ : আক্রান্ত চারার পাতায় অনিয়মিত হালকা বাদামি দাগের চারদিকে উজ্জ্বল গাঢ় বাদামি রঙের বেষ্টনী দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ : কুপ্রাভিট/ডায়থেন–এম–প্রয়োগ করতে হয়।

১১। পেঁপের কাণ্ড বা গোড়া পচা রোগ

রোগের লক্ষণ : চারার মাটির কাছে কাণ্ডে পানিভেজা দাগ দেখা যায়। এ দাগ বড় হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। গাছের আগার পাতার ঢলে পড়ে এবং হলুদ হয়ে যায়।

প্রতিকার : আক্রান্ত স্থানে বোর্দোমিশ্রার পেস্ট লাগানো যেতে পারে।

নার্সারি পোকামাকড়

১। সুপারির গোবর পোকা

এ পোকা সুপারির শিকড়ে আক্রমণ করে। শূককীট স্যাঁতসেঁতে স্থানের সুপারি গাছকে আক্রমণ করে দুর্বল করে দেয়।

প্রতিকার : হেপ্টাক্লোর পাউডার ও দানাদার ডায়াজিনন প্রয়োগ করতে হয়।

২। লেবুর পাতা ছিদ্রক পোকা

লেবু *Phyllocnistris citrella* নামক পোকার আক্রমণে মারাত্মক ক্ষতি হয়। শূককীটগুলো পাতার নিচে সুড়ঙ্গ তৈরি করে খায়।

প্রতিকার : এজোড্রিন বা ডাইমেক্রন প্রয়োগ করতে হয়।

৩। আকাশমনির উড়চুঙ্গা

উড়চুঙ্গা দিনে গর্তে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে গর্ত থেকে বের হয়ে চারার গোড়া কেটে ফেলে।

প্রতিকার : গর্তে কেরোসিন ঢাললে উড়চুঙ্গা বের হয়ে আসে এবং মেরে ফেলতে হয়।

৪। আকাশমনি পাতা গুটানো পোকা

আকাশমনির চারার পাতা গোটানো পোকার আক্রমণে কচি পাতা নিচের দিকে গোলভাবে গুটিয়ে যায়। সাদা ও লম্বাকৃতির পোকাসমূহ পাতার ভিতরে থাকে বিধায় দেখা যায় না।

প্রতিকার : ১০ লিটার পানিতে ২০ এম.এল. সেভিন বা ডায়াজিনন আক্রান্ত চারায় ছিটাতে হয়।

নার্সারিতে পোকার প্রকারভেদ

(১) কাটুই পোকা (Cutworm) (২) ককচাফার (Cockchafars),
(৩) উঁইপোকা এবং পিপীলিকা (Termites and ants),
(৪) ক্রিকেট এবং মোল ক্রিকেট (Crickets and mole Crickets),
(৫) পাতাভোজী পোকামাকড় (Defoliators), (৬) রস শোষক পোকামাকড় (Sap suckers),
(৭) জাবপোকা (Aphids), (৮) মাকড় (Mites),
(৯) কৃমি পোকা (Annelids), (১০) মিলিবাগ (Milibug),
(১১) স্কেল পোকা (Scale insect), (১২) লাল মাকড়সা (Red spiders)
(১৩) থ্রিপস (Thrips), (১৪) নেমাটোড (Nematods).

(১৫) বিটল (Beetle), (১৬) উইভিল (Weevil), (১৭) বিছা ও লেদাপোকা (Caterpillars), (১৮) লিফ হপার (Leaf hopper)।

নার্সারিতে রোগের প্রকারভেদ

রোগের কারণ নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়—

(ক) ছত্রাকজনিত

(খ) পতঙ্গজনিত

(গ) ব্যাকটেরিয়াজনিত

(ঘ) ভাইরাসজনিত

(ঙ) নেমাটোডজনিত

(চ) এক্টিনোমাইসেটিসজনিত

(ছ) খনিজ পদার্থের স্বল্পতাজনিত

(জ) খনিজ পদার্থের আধিক্যজনিত

(ঝ) মাটির আর্দ্রতাজনিত

ফল গাছের পোকা ও রোগ

শত্রু বা বালাইয়ের নাম	ক্ষতির সংক্ষিপ্ত ধরন	প্রতিকার
পাতা, কাণ্ড, ডাল ফুল ও ফলের শোষক পোকা	অনেক ধরনের শোষক পোকার মধ্যে আমের শোষক, ছত্রাক ও খোসা পোকা; পেয়ারার ছত্রাক ও সাদা মাছি; লেবুর থ্রিপস, জাব, সাইলিড ও সাদা মাছি অন্যতম প্রধান শত্রু। এরা পাতা, কচি ডাল ফুল ও ফলের রস চুষে খেয়ে গাছ ও ফলের ক্ষতি করে।	১। ছত্রাক পোকা, সাদা মাছি, জাব ও সাইলিড আক্রান্ত পাতা। ২। গাছে শোষক পোকার সংখ্যা খুব বেশি মনে হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃ লিঃ সাইপারমেথরিন (রিপকর্ড/ সিমবুশ/ বাসথ্রিন) কিংবা আধা মিঃ লিঃ প্রয়োগ।
ফল গাছের পাতা খেকো পোকা	আমের পাতাখেকো বিছা পোকা, আমড়ার পাতাখেকো বিটলের, কীড়া, কচি কলা কলা পাতায় দাগ সৃষ্টিকারী বিটল পোকা, লেবুর পাতাখেকো কীড়া পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা, নারকেলের গণ্ডার পোকার কীড়া।	১। সাবধানে পোকাসহ পাতা বা ডাল তুলে এগুলো মেরে ফেলতে হয়। বিছা বা কীড়ার শুঁয়া যেন ত্বকে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। ২। আক্রমণ তীব্র হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিঃ লিঃ ডাইক্লোরভস (নগস/ফসভিট) প্রয়োগ।
কাণ্ড ও ছাল ছিদ্রকারী পোকা	ভেঙে পড়া ডালের ভিতরে কেটে লম্বা সাদা বা ধূসর কীড়া দেখা যায় এক ধরনের বাগ বা গান্ধি পোকার ডিম থেকে এ কীড়া বের হয়ে প্রথমে ছাল খেয়ে ছিদ্র করে আম, পেয়ারা লিচু, জাম ইত্যাদি গাছে এ পোকার ক্ষতি দেখা যায়। এ জাতীয় কীড়া দমন খুবই কঠিন।	১। ডালে পোকার আক্রমণ হলে পাতাসহ ডাল কেটে নষ্ট করতে হয়। ২। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিঃ লিঃ ডাইক্লোরভস (নগস) বা ক্লোরপাইরিফস (ডার্সবান/পাইরিফস) প্রয়োগ করতে হয়।

ফলের শাঁস নষ্টকারী পোকা	ফলের শাঁসে অনেক ধরনের কীড়া দেখা যায়। আম, পেয়ারা, বরই, লিচু, ডালিম ইত্যাদি ফল কাটলে শাঁস বা বীজের কাছে এসব কীড়া পাওয়া যায়।	১। ফলের গায়ে পলিথিন বা কাপড়ের প্যাকেটে ঢেকে দিয়ে ডালিম, পেয়ারা ও আম বাঁচানো হয়। ২। আমের উইভিল দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিঃ লিঃ লিবাসিড প্রয়োগ। ৩। বরই-এর ফলের কীড়া দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃ লিঃ সাইপারমেথ্রিন (বাসথ্রিন/ রিপকর্ড/ সিমবুশ) বা ডেল্টা মেথ্রিন (ডেসিস) প্রয়োগ করতে হয় ৪। কাঁঠালের ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২.০ থেকে ২.৫ মিঃ গ্রাম কারবারিল (সেভিন) প্রয়োগ করতে হয়।
পোকামাকড়	কিছু পোকামাকড় ফলগাছ থেকে খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি রোগ সৃষ্টি করে বা রোগ ছড়ায়। ১। আমের ডগায় এপসিলার কীড়া পাতার মধ্যশিরার ভিতর থেকে খেয়ে বড় হয় ও পূর্ণাঙ্গ এপসিলায় রূপান্তরিত হয়। ২। আবার কয়েক প্রজাতির গলমাছি আমের পাতার উপর ও নিচের তলে মসুর দানার মতো গল বা গুঁটি তৈরি করে। ৩। লিচু গাছের পাতায় ঘিরে বা বাদামি রঙের মুখ মলের মতো আবরণ ক্ষুদ্র মাকড়সা বা মাকড়ের আক্রমণে সৃষ্টি হয়। ৪। কলা গাছের মোজাইক ও গুচ্ছমাথা ভাইরাস রোগ লেবু গাছের ট্রিসাইজা ভাইরাস রোগ ও গ্রীনিং মাইকোপ্লাজমা রোগ পেঁপে গাছের মোজাইক ও পাতা কোঁকড়ানো রোগগুলো বিভিন্ন পোকার মাধ্যমে ছড়ায়।	১। গাছের আক্রান্ত ডাল বা পাতা কেটে বা তুলে পুড়ে আমের এপসিলা ও গলমাছি এবং লিচুর ক্ষুদ্র মাকড়সার ক্ষতি থেকে বাঁচানো যায়। ভাইরাস ও মাইকোপ্লাজমা আক্রান্ত কলা, পেঁপে ও লেবু বাগান থেকে আক্রান্ত গাছ শিকড়সহ তুলে পুড়ে ফেলতে হয়। ২। রোগ সৃষ্টিকারী পোকামাকড় দমনের জন্য বালাইনাশক ওষুধ ছিটিয়ে গাছগুলোকে রক্ষা করা যায়: ক. আমের ডগার এসপিলা ওই পাতার গলমাছি দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিঃ লিঃ ডাইমেথোয়েট (রগর/রক্সিয়ন/ পারফেকথিয়ন) বা মনোক্রটোফস (নুভাক্রন/ এজোড্রিন) বা কার্বোসালফা (মার্শাল) প্রয়োগ করতে হয়। খ. লিচু গাছের ক্ষুদ্র মাকড়সা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিঃ লিঃ নিওরন ৫০০ ইসি বা কেলথেন ৪০ এমএফ প্রয়োগ করতে হয়। গ. পেঁপে, কলা বা লেবু গাছের ভাইরাস ও মাইকোপ্লাজমা রোগ করার জন্য রোগ বহনকারী জাব, সাদামাছি বা সাইলিড পোকা কীটনাশক ওষুধ ছিটিয়ে দমন করতে হয়। প্রতি লিটার পানিতে ১.০–১.৫ মিঃ লিঃ ম্যালাথিয়ন, ডায়াজিনন বা সুমিথিয়ন প্রয়োগ করতে হয়।

পিপড়া ও তেলাপোকা	পিঁপড়া গাছের শিকড় এবং ঘর ও গুদামে পাকা ফল খেয়ে ক্ষতি করে। তেলাপোকা ঘরে ও গুদামে পাকা ফল খেয়ে ক্ষতি করে।	১। তেলাপোকা ও পিপড়ার বাসস্থান নষ্ট করে ঝাড়ু দিয়ে ও ঘর সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে এগুলোর উপদ্রব কমানো যায়। ২. পানিতে কেরোসিন তেল মিশিয়ে পিপড়ার চলাচলের জায়গায় ছিটালে এর উপদ্রব কমে।
পাউডারি মিলডিউ রোগ	পেঁপে, কুল, আনারস, আম এবং তরমুজ গাছে পাউডারি মিলডিউ রোগ হয়। এ রোগে পাতার উপর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফুলের গায়ে ধূসর বা সাদা পাউডারের আবরণ পড়ে।	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে থিয়োভিট বা ওয়েটেবেল সালফার বা ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন বা বেনলেট প্রয়োগ করতে হয়।
এনথ্রাক-নোজ রোগ	আনারস, পেঁপে, আম, পেয়ারা, নারকেল ও লেবু গাছে এনথ্রাকনোজ রোগে পাতা, কাণ্ড ও ফলের ক্ষতি হয়।	১. গাছের মরা ডাল পাতা পুড়ে ফেলতে হয়। ২. প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন বা বেনলেট বা ২১ গ্রাম ডাইথেন এম ৪৫ প্রয়োগ করতে হয়।
পাতার দাগ রোগ	কলা, নারকেল ও কাঁঠাল গাছের পাতায় বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাকের আক্রমণে পাতার দাগ রোগের সৃষ্টি হয়।	প্রতি লিটার পানিতে আধা টিল্ট মিশিয়ে স্প্রে মেশিন দিয়ে গাছে ছিটাতে হয়।
ইঁদুর	ইঁদুর গাছের ফল এবং ঘর ও গুদামে রাখা ফল খেয়ে এবং নষ্ট করে অপূরণীয় ক্ষতি করে	১. ইঁদুরের বাসা ভাঙা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্না নিশ্চিত করতে হয়। ২. জিঙ্ক ফসফাইড, ল্যানিরাট, ক্লেরাট এবং বাজারে পাওয়া যায় এমন সুপারিশকৃত ইঁদুর মারার ওষুধ সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে হয়। ৩. ইঁদুর মারার কল ব্যবহার করতে হয়।
বাদুর ও পাখি	বাদুর পাখি গাছের কাঁচা পাকা ফল খেয়ে বা নষ্ট করে ক্ষতি করে।	১। ফল পাকার আগে গাছের ওপর জাল দিয়ে ঢেকে বা সম্ভব হলে পলিথিন বা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে ফল রক্ষা করা যায়। ২। টিন বা ঘন্টা বাজিয়ে বাদুর বা পাখি তাড়ানো যায়।

উইপোকা	উইপোকা ফল গাছের কাণ্ড ও শিকড় খেয়ে ক্ষতি করে।	১. উইপোকার ঢিবি ভেঙে বা খুঁড়ে রাণীসহ উইপোকা মেরে ফেলতে হয়। ২. ফল গাছের কাণ্ডে চুনের প্রলেপ দিলে উই পোকার আক্রমণ কমে। ৩. পানিতে কেরোসিন তেল বা ক্লোরপাইরিফস (ডার্সবান) প্রয়োগ করতে হয়।
আগামরা রোগ	লেবুজাতীয় ফল পেয়ারা ও অন্যান্য ফল গাছে আগামরা রোগের কারণে গাছ আগা থেকে মরতে থাকে এবং ক্রমে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।	১। আক্রান্ত ডাল কেটে দিতে হয়। গাছের কাটা অংশে ১০০ গ্রাম কপার সালফেট ১০০ গ্রাম চুন ও ১ লিটার পানি মিশিয়ে বোর্দো পেস্ট তৈরি করে লাগাতে হয়। ২। প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ডাইথেন এম ৪৫ প্রয়োগ করতে হয়।
কাণ্ড ও শিকড় পচা রোগ	কলা, লেবু, নারকেল, পেয়ারা কাঁঠাল, পেঁপে, ও আনারসে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে কাণ্ড ও শিকড় পচে যায়। এসব রোগের ফলে ফল গাছের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।	১. সম্ভব হলে গাছ লাগানোর আগে শতকরা ২ ভাগ ফরমালিন দিয়ে মাটি শোধন করতে হয়। ২. ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্ট পচা রোগে রিডোমিল এম জেম অথবা ১% বোর্দো মিক্সার ব্যবহার করা যেতে পারে।
উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ	পেয়ারা গাছে উইল্ট রোগে গাছ ঢলে পড়ে। পানি দিলেও গাছ আর বাঁচে না।	১. বাগানোর ঢলে পড়া রোগ আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়ে ফেলতে হয়। ২. টিল্ট–২৫০ ইসি বা টপসিন প্রয়োগ করতে হয়।
ফল পচা রোগ	ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ফলে পচা রোগ হয়। পেয়ারা, কাঁঠাল, আম, পেঁপে ও আনারসে ফল পচা রোগ দেখা যায়। পরিপক্ব অথবা পাকা অবস্থায় এবং ফল পাড়ার পরে ফল পচা রোগ হতে পারে।	১. ফলের মাছি বা নষ্টকারী অন্যান্য পোকার আক্রমণ রোধ করতে হয়। ২. পাড়ার সময় যেন ফলে ক্ষত সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করতে হয়।
ঝুল রোগ	লেবু, পেয়ারা, আম এবং অন্যান্য ফল গাছের পাতায় ঝুল রোগ দেখা যায়।	১. শোষক পোকা দমনের জন্য সুপারিশকৃত কীটনাশক প্রয়োগ ২. প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম থিওভিট প্রয়োগ করতে হয়।
ভাইরাস	কিছুসংখ্যক পোকার মাধ্যমে কলা, পেঁপে, লেবু ও আম গাছে ভাইরাস ও সমজাতীয় রোগের সৃষ্টি হয়।	সুপারিশকৃত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়
পরগাছা	আম,জাম, বরই ও কাঁঠাল গাছে লরানথাস, স্বর্ণলতা, রাস্না বা অর্কিড এবং অন্যান্য ধরনের পরগাছা নানাভাবে গাছের ক্ষতি করে।	১. শিকড়সহ পরগাছা টেনে নামাতে হয়। ২. কাটা ডালে রোগের আক্রমণ রোধ করার জন্য সুপারিসকৃত পরিমাণে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হয়।

তথ্যপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ও সুনির্মল মাহুতি : ১৯৮৪। ধান উৎপাদন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ভারত।

আমিন সদরুল ও অন্যান্য। ১৯৯৩। কৃষি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিএআরসি, ঢাকা।

আমিন সদরুল ও অন্যান্য। ১৯৯৫। মাঠ ফসল উৎপাদনের কৌশল। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

রশিদ, আলী, ওয়াহাব, সদরুল আমিন ও অন্যান্য। ১৯৯৯ : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই। বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

অজানা। ১৯৯৩। প্রযুক্তি পরিচিতি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর

মজুমদার, ম. ১৯৮১। পূর্ব ভারতের ফসল। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলকাতা।

অজানা। ১৯৯৪। আধুনিক ধানের চাষ। বিআরআরআই জয়দের পুর, গাজীপুর।

অজানা। । ১৯৯৪। ধান চাষের সমস্যা। বিআরআরআই জয়দেবপুর, গাজীপুর।

ইসলাম ও আমিন। ১৯৮৮। সার ব্যবহার নির্দেশিকা। ঢাকা।

অজানা। ১৯৯৮ : ফসলের শ্রেণিবিভাগ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। খামার বাড়ী, ঢাকা।

অজানা : ১৯৯৩। ভুট্টার উৎপাদন ও ব্যবহার। বিএআরআই। বাংলাদশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

অজানা। ভুট্টা ১৯৯১ : শুভ্রা, বর্ণালী ও মোহর। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

চিনার চাষ : তুষার ১৯৯৪। বাংলাদশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

অজানা। ১৯৯৫। লাভজনক পদ্ধতিতে গম উৎপাদনের উপায়। বিএআরআই। গম গবেষণা কেন্দ্র, নশীপুর, দিনাজপুর।

অজানা। বিএআরআই কাউনের চাষ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

আমিন সদরুল ও অন্যান্য। ১৯৯৩। কৃষিক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা। বিএআরসি, ঢাকা।

সদরুল আমিন। ১৯৯৩। কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভিত্তিক ভুট্টা চাষের উপযোগিতা, ভুট্টা উৎপাদন ও ব্যবহার। বিএআরআই, গাজীপুর।

আমিন সদরুল ও অন্যান্য সম্পাদিত। ১৯৯৭। কৃষি ও বনায়ন। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফা, বাংলাদেশ।

আমিন সদরুল। ১৯৯৩। ভুট্টা চাষে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। ভুট্টা উৎপাদন ও ব্যবহার। বিএআরআই, গাজীপুর।

আহমেদ, ফ ও অন্যান্য। ১৯৯৭। কৃষি বনায়ন ও জীব বৈচিত্র্য। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বনিক রতনলাল। ১৯৯১। প্রাকমূল কাঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের ব্যাপক চাষ বিএআরসি, ঢাকা।

রহমান ও আমিন। ১৯৮৭। ১৯৮৭ সালের বন্যা ও কৃষি পুনর্বাসন গবেষণা কার্যক্রম। বিএআরসি ও বিএআরআই।

হাসান আবুল। ১৯৮২। বাংলাদেশের ভেষজ উদ্ভিদ। হাসান বুক হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা।

সিদ্দিকী কামাল ও সালামত আলী সম্পাদিত। ১৯৯৪। বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা ম্যানুয়েল এলজিআরডি, ঢাকা।

মহিউদ্দিন ও অন্যান্য। ১৯৮৮। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির বেত সনাক্তকরণের সহজ পদ্ধতি। বুলেটিন-২, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

দে তপন কুমার। ১৯৯৩। সামাজিক বনায়ন ও নার্সারি পরিচিতি বনবিভাগ খুলনা।

দে তপন কুমার। ১৯৯৫। বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া। বরুড়া, কুমিল্লা।

দে তপন কুমার। ১৯৯৬। সামাজিক বনায়ন। বরুড়া, কুমিল্লা।

দে তপন কুমার। ১৯৯৮। আধুনিক নার্সারি ও বাগান পরিচিতি বরুড়া, কুমিল্লা।

হারুন রশীদ ও অন্যান্য। ১৯৮৮। বাংলাদেশে বেত ও এর চাষাবাদ কৃষি কথা, কৃষিতথ্য সার্ভিস, ঢাকা।

হারুন রশীদ ও অন্যান্য। ১৯৯৩। ভেষজ উদ্ভিদ ও ইহার চাষাবাদ। বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

সালেহউদ্দিন। ১৯৯১। উন্নত পদ্ধতিতে বাঁশ সংরক্ষণ ও ব্যবহার, বিএআরসি, ঢাকা।

বণিক হারাধন। ১৯৯২। নার্সারিতে কাঠ, ফুল ও ফলের চারা উত্তোলন কৌশল, বন বিভাগ, খুলনা।

হাসান ও হোসেন। ১৯৯৩। ভূমির উপযুক্ততার ভিত্তিতে বৃক্ষ প্রজাতি নির্ধারণের সহজ পদ্ধতি : একটি ম্যানুয়েল, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

অজানা। ১৯৯৪। কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

অজানা। ১৯৯৪। খেজুর গাছের চাষ ও পরিচর্যা, বিএফ আরআই, চট্টগ্রাম।

নেমাপ। ১৯৯৫। ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যাকশন প্লান। ভলিয়্যুম-১বি, সার-সংক্ষেপ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

আলী সালামত ও অন্যান্য। ১৯৯১। সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও বাগান সৃজন নির্দেশিকা উপজেলা বনায়ন ও নার্সারী উন্নয়ন প্রকল্প, বনভবন, ঢাকা

চৌধুরী এম, আর। ১৯৭৫। নার্সারি ও প্ল্যান্টেশন ম্যানুয়েল, বন বিভাগ, বনভবন, ঢাকা।

দাস সোমেশ্বর। ১৯৮৪। ইউক্যালিপ্টাস প্রজাতির চারা উত্তোলন পদ্ধতি। বিএআরআই।

Ahmed, S. 1995. Appropriate Use of Fertilizer in Asia and the Pacific. APO. Tokyo.

Alam. M. K. 1982. A Guide to Eighteen Spieces of Bamboos. from Bangladesh. BFRI.

Alam. M. K. *et. al.* 1985. Fodder Trees of Bangladesh. BFRI.

Alam, M. K. *et. al.* 199.. Trees for lowlying areas of Bangladesh. BFRI.

Alam. M. K., 1990. Rattans of Bangladesh. BFRI. Chittagong

Amin M. S. and Ahmed, M. 1992. Seasonality and Agro-ecology of vegetable production and supply in Bangladesh. Proc. Nat. Rev. and Planning workshop, Gazipur.

Anon, 1997. Fertilizer Recommendation Guide. Soils No. 41-BARC.

Baksha. M. W. and Blam, M. R. 1997. Major defoliators of teak in Bangladesh and their management. Bull. 2. BFRI.

BARC, 1985. Fertilizer Recommendation Guide. Bangladesh Agriculture Research Council. Farmgate. Dhaka.

BARI, 1988. Homestead Plantation and Agroforestry in Bangladesh. Gazipur.

BARI, 1995. Sustainability of Rice-Wheat Systems in Bangladesh. Edited by Razzaque, M. A. *et.al.* Proc, WRC, BARI, Nashispur. Dinajpur.

BBS. Statistical Pocket Book of Bangladesh. 1995. Bangladesh Bureau of Statistics, GOB.

Begum, M. 1987. Edible Fruits of Bangladesh. Hasan Book House. Dhaka.

Benthal, A. P. 1984. The trees of Calcutta and its neighberhood. Dehra Dun, India.

Bhuiya, A. M. *etal.* 1993. Rice-Wheat System Research in Bangladesh : A Review, BRRI, WRC, Dinajpur.

CHAPMAN, S. R.and CARTER. L. P. 1982. Crop Produtıon : Principles and Practies. Surjeet Pub. New Delhi.

CHATTERJEE. B. N. and MAITI, S. 1981 Principles and Practices of Rice Growing. IBH Publishing Co. India.

Chowdhury, M. K. and Mahat, T. B. S. 1993. Agroforestry Farming System Linkages in Bangladesh. BARI-WI.

Das. D. K. 1990. Forest types of Bangladesh. BFRI.

Davidson, J. 1985. The Mangroves and Mangrove forestry of Bangladesh Forest Dept.

FAO — SNAG, 1995. Fertilizer. Soil Management and Plant Nutrition in Farming Systems. Field Document No. 16.

Fertilizer W. P. 1983. Cereal Seed Technology.

HRC, 1994. A Monag. On mango varieties in Bangladesh, BARI.

HRDC. 1995. Fruit Production Manual. DAE/BADC.

Huxley. A. 1984. Green Inheritance. Four Wall Eight Windows. N. Y.

ICAR. 1988. Handbook of Agriculture. New Delhi. India

IRRI. 1980. Agro meteorology of the Rice Crop. Proc. WMO and IRRI.

IRRI. 1989. A Farmers Primer On Growing Plant Los Banos, Lanuna, Philippines.

IRRI, 1990 1991. Accounting adventure in rice research IRRI Philippins.

IRRI. 1991. A Primer On Organic Based Rice Farming (R.K. Pandey) IRRI and IITA Manila, Philippins.

IRRI, 1996. Advances in Hybrid Rice Technology. IRRI.

Katyal, J. C. and Randhawa, N. S. 1983. Micronutrients, FAO Fert, & Pl. Nutr. Bull. 7.

Kaul, A K. *et.al.* 1982. Rice Quality : A Survey of Bangladesh-Germplasm. BRRI.

Khan, M. S. and Halim. M. 1987. Aquatic Angiosperms of Bangladesh BNH, BARC.

Khan, M. S. *et.al.* 1996. A Preliminary account of legume deversity in Bangladesh. B. J. of Plant Taxonony, 3-1. BAPT.

KIPPS, M.S. 1978. Production of Field Crops. Mc-Grand Hill Book. Co. USA.

Kogai. M T 1992 Modern Rice Production Technology. Agricole Pub. Acad, New Delhi.

Light Foot, C *et.al.* 1991. Households, Agro-ecoystems and Rural Resomes Management. BARI, ICLARM.

MARTIN, J. H. *et.al.* 1985. Principles of Field Crop Production. Memillan Pub. Co. USA.

Martin, J. H. *et.al.* 1976. Principles of Field Corp Production, Collier Memillan Int. N. Y.

Mogno, V. C. and Ali, S. S. 1992. Handbook of Tree Nursery and Plantation Establishment. Bamobhavan, Dhaka.

Mohat, T. B. S. 1993. NGO's and Participatory Forestry in Bangladesh BARC. WI-Dhaka.

Nair, P. K. R. 1989. Agroforestry Systems, Practices and Technologies. In: Agroforestry System in the Tropics. Khewer Academic. Pub.

Pandey, R. K. 1987. A Farmers Primer on Growing Soybean on Rice Field. IRRI/IITA. Philippins.

Pandey. R. K. 1991. A Primer on Organic Based Rice Farming IRRI.

Pandey, R. K. 1991. A primer on Organic Based Rice Farming. IRRI

Pandey., R. K. 1987. A Farmers Primer on Growing Cowpea on Rice land. IRRI. IITA Philippines.

Percival. J. 1985. The Wheat Plant. Agricole Reprints Corp, New Delhi.

Pursglove. J. W Tropical Crops : Monocotyledons. Longman group Ltd.

Raintree. J. B. 1987. D & D Users manual. An Introduction to Agroforestry and Design, ICRA, Nairobi.

Razzaque, M. A. *et. al.* (ed.) 1995. Sustainability of Rice Wheat system in Bangladesh, Proc. BARI BRRI, BAWIP.

Satter, M. A. and Akhteruzzaman, A. F. M. 1997. Properties and Uses of Jackfruit Wood. BFRI.

Tacio, H. D. 1992. Goats, Trees. and other things. Agroforestry for small farms on sloping land in the Philippines, Agroforestry to-day, 4(1) : 12-13.

পরিশিষ্ট — এক
বাংলাদেশের কৃষিবনজ গাছের পরিচিতি

বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	গোত্র	গাছের ধরন
Actinodaphne angustifolia	Madanamasta মদনমস্ত	Lauraceae	Medium tree
Aegialitis rotundifolia	Noniagach ননিয়া গাছ	Plumbaginaceae	Small tree
Albizia lebbeck	কালি কড়ই	Leguminosae	Medium tree
Albizia procera	শিল কড়ই	Leguminosae	Medium tree
Alstonia scholaris	ছাতিম	Apocynaceae	Medium tree
Aphanamixis polystachya	Pitraj পিতরাজ	Meliaceae	Large tree
Aristolochia indica	Iswarmul ঈশ্বরমূল	Aristolochiaceae	Climber
Artocarpus chaplasha	Chapalish চাপালিশ	Moraceae	Medium tree
Bambusa polymorpha	Betua বেটুয়া	Gramineae	Bamboo
Bambusa tulda	মিতিংগা	Gramineae	Bamboo
Bursera serrata	Gutgutia ,গুটগুটিয়া	Burseraceae	Tree
Calamua guruba	Jai bet ,জই বেত	Palmae	Cane
Calamus latifokius	Butum bet ভুতুম বেত	Palmae	Cane
Calamus viminalis	Kerak bet কেরাক বেত	Palmae	Cane
Dipterocarpus gracilis	Dhaligarjan ঢালি গর্জন	Dipterocarpaceae	Tall tree
Dipterocarpus turbinatus	Teliagarjan, তেলিয়া গর্জন Kaligarjan কালি গর্জন	Dipterocarpaceae	Tall tree
Dracaena spicata	Dracina, ড্রাচিনা	Liliaceae	Shrub
Dysoxylum binectariferum	Bara rata বড় রাতা	Meliaceae	Medium tree

Elaeocarpus floribundus	Balphoi বলফই	Elaeocarpaceae	Medium tree
Euphatorium odoratum	Assamlata আসামলতা	Compositae	Shrub
Ficus semicordata	Jaggyadumur যজ্ঞডুমুর	Moraceae	Medium tree
Ficus benghalensis	Bat বট	Moraceae	Tall tree
Ficus rumphii	Hijulia হিজুল	Moraceae	Tall tree
Garcinea cowa	Kao কাউ	Guttiferae	Medium tree
Garcinia xanthochymus	Dephal ডেউফল	Guttiferae	Small tree
Glochidion roxburghiana	Narkochoi নারকোচই	Euphorbiaceae	Shrub
Gmelina arborea	Gamar গামার	Verbenaceae	Medium tree
Hopea odorata	Telsur তেলশুর	Dipterocarpaceae	Tall tree
Hoya parasitica	Purgacha পরগাছা	Asclepiadaceae	Epiphytes
Hydnocarpus kurzii	Chalmugra চালমুগরা	Flacourtiaceae	Medium tree
Imperata cylindric	Sungrass সান গ্রাস	Gramineae	Grass
Saccharum benghalense	Elephant grass এলিফ্যান্ট গ্রাস	Gramineae	Gfrass
Saccharum spontaneum	Kash কাশ	Gramineae	Grass
Salmalia insignis	Bansimul বনশিমুল	Bombacaceae	Tall tree
Saraca asoca	Ashok অশোক	Caesalpinaceae	Samll tree
Smilax macrophylla	Bara Kumaria lata বড় কুমারিয়া লতা	Liliaceae	Climber
Stereospermum chelinoides	Dharmara ধারমারা	Bignoniaceae	Medium tree
Seietenia mahagoni	Mahagoni মেহগনি	Meliaceae	Tall tree
Swintonia floribunda	Civit সিভিট	Anacardia ceae	Tall tree

Syzygium cumini	Kalojam কালোজাম	Myrtaceae	Tall tree
Syzygium grande	Dhakijam ডাকিজাম	Myrataceae	Tall tree
Tectona grandis	Shegun,সেগুন	Verbenaceae	Tall tree
Terminalia belerica	Bahera,বহেড়া	Combretaceae	Medium tree
Terminalia chebula	Haritaki,হরিতকি	Combretaceae	Medium tree
Terminalia arjuna	Arjun,অর্জুন	Combretaceae	Tall tree
Licuala peltata	Kuruspata কুরুসপাতা	Palmae	Shrub
Lophopetalum fimbriatum	Raktan,রাকতন	Celastraceae	Tall tree
Macaranga denticulata	Bura,বুরা	Euphorbiaceae	Medium tree
Maesa ramentacea	Maricha,মারিছা	Myrsinaceae	Shrup
Melicanna baccifera	Mulibans,মুলিবাঁশ	Graminaee	Bamboo
Mesua nagessarium	Nageshwar নাগেশ্বর	Guttiferae	Medium tree
Michelia champaca	Champa চাম্পা	Magnoliaceae	Tall tree
Microcos paniculata	Assar আসার	Tiliaceae	Medium tree
Micromelum pubescens	Bankuch বেঙ্কুছ	Rutaceae	Small tree
Mitragyna parvilfolia	Dhakrum ডাকরুম	Rubiaceae	Medium tree
Naucleasessilifolia	Kom কোম	Rubiaceae	Medium tree
Palaquium polyanthum	Tali তেলি	Sapotaceae	Tall tree
Podocarpus nerifolius	Banspata বাঁশপাতা	Conifereae	Medium tree

Pothos scandens	Sonat, Gajpipul সোনেট, গাছপিপুল	Araceae	Epiphytes
Quercus spicata	Batna, বাটনা	Fagaceae	Medium tree
Quercus acuminata	Katalal batna কাস্তলাল বাটনা	Fagaceae	Small tree
Randiadumentorum	Man kanta ম্যান কানটা	Rubiaceae	Small tree/Shrub
Bombax ceiba	Simul ,শিমুল	Bombacaceae	Tall tree
Brownlowia alata	Moss মোস	Tiliaceae	Tree
Callicarpa arborea	Barmala বারমালা	Verbenaceae	Medium tree
Cassia nodosa	Bonsonalu, বনস্ক আলু	Leguminosae	Small tree
Castanopsis indica	Gulsingra গুলসিংড়া	Fagnceae	Medium tree
Derris robusta	Jumurja	Papilionaceae	Small tree
Dillenia pentagyna	Hargaza,হারগাজা	Dilleniaceae	Medium tree
Dipterocarpus alatus	Sil garjan, শিল গর্জন Dhuligrjan,	Dipterocarpaceae	Tall tree
Dipterocarpus costates	Teligarjan, তেলিগর্জন	Dipterocarpaceae	Tall tree
Elaeocarpus robustus	Jalpai,জালপাই	Dlaeocarpaceae	Medium tree
Garuga pinnata	Silbhadi, শিল ভাদি	Burseraceae	Small tee
Glochidion lanceolarium	Kechua, কেচুয়া	Euphorbiaceae	Shrub
Holarrhena antidysentreca	Kurchi, Kurus করচি	Apocynaceae	Small tree
Hopea odorate	Telsur, তেলশুর	Dipterocarpaceae	Tall tree
Toona ciliata	Toon, তুন	Meliaceae	Medium tree
Venda roxburghii	Rasna, রস্না	Orchidaceae	Orchid
Vitex peduncularis	Goda, Harina গোদা	Vitaceae	Medium tree

Vitex glabrata	Asdol, এসতল	Vitaceae	Medium tree
Vitica lanceofolia	Sutagola, সুতাগোলা	Dipterocarpaceae	Medium tree
Adina cordifolia	Haldu, হলদু	Rubiaceae	Medium tree
Albizia chinensis	Chakua/Tarul চাকুয়া	Liguminosae	Medium tree
Albizia odoratissima	Tetoya koroi তেতোয়া কড়ই	Leguminosae	Medium tree
Anisoptera scaphula	Boilam বৈলাম	Dipterocarpaceae	Tall tree
Aporusa raxburghii	Karrola ক্যারোলা	Euphorbiaceae	Small tree
Artocarpus chaplasha	Chapalish চাপালিশ	Moraceae	Tall tree
Artocarpus lakoocha	Barta, Dewa, ডেউয়া	Moraceae	Medium tree
Sterculia villosa	Udal, উদাল	Sterculiaceae	Medium tree
Streblus asper	Sheoea, শইয়া	Moraceae	Small tree
Syzygium grande	Dhakijam ঢাকি জাম	Myrtaceae	Medium tree
Syzygium formosznum	Painyajam পাইনে জাম	Myrtaceae	Small tree
Syzygium cerasoidium	Dhepajam ঢেপা জাম	Myrtaceae	Small tree
Syzygium fruticosum	Khudijam খুদি জাম	Myrtaceae	Small tree
Terminalia belerica	Bahera বহেরা	Combretaceae	Tall tree
Terminalia chebula	Horitaki হরিতকি	Combretaceae	Medium tree
Vetex trifolia	Nil nisinda নীল নিশিন্দা	Verbenaceae	Shrub
Vitis repens	Marmaria lata মারমরিয়া লতা	Vitaceae	Climber
Xanthophyllum flavescens	Hansak হানসাক	Polygalaceae	Small tree

Acacia pinnata	Aila, Bisoal আইলা	Leguminosae	Climber
hymenodictyon excelsum	Bhui kadam, Jusan, ভুঁই কদম	Rubiaceae	Medium tree
Illex godajam	Gorba, Ludh গোরবা	Aquifoliaceae	Large tree
Lannea coromandelica	Jiulbhadi জিওলভাদি	Anacardiaceae	Medium tree
Litsea monopetala	Kukurchita কুকুরচিতা	Lauraceae	Medium tree
Macaranga denticulata	Bura,Sindur সিন্দুর	Euphorbiaceae	medium tree
Mallotus phillppinensis	Panyaturi, Punnag, পানাং	Euphorbiaceae	Small tree
Melastoma malabathricum	Lotki, Datranga লটকি	Melastomaceae	Shrub
Mitragyna parvifolia	Rangkat, ঢাকরাম Dhakrum	Rubiaceae	Medium tree
Oxytenanthera nigrociliata	Kalibans কালিবন	Gramineae	Bamboo
Phyllanthus emblica	Amloki আমলকি	Euphorbiaceae	Small tree
Quercus velutina	Sil batna শিল বাটনা	Fagaceae	Medium tree
Schima wallichii	Kanak, কনক	Theaceae	Medium tree
Spondias pinnata	Amrah, আমড়া	Anacardiaceae	Small tree
Cassia fistula	Sonalu, সোনালু	Legumianosae	Medium tree
Cleistocalyx operculatus	Dephajam ডেফজাম	Myrtaceae	Small tree
Clerodendrum viscosum	Bhat, ভাট	Verbenaceae	Shrub
Croton oblongifolius	Adagch,Chuka চুকা	Euphorbiaceae	Medium tree
Curculigo recurvata	Bidripata বিড়িপাতা	Iridaceae	Herb
Curcuma aromatica	Ban haldi বন হলদি	Zingiberaceae	Herb

Desmodium gangeticum	Salpani সালপানি	Leguminosae	Shrub
Desmodium gyrans	Gorachand,Toruk gach,গোড়াচাঁদ	Leguminosae	Shrub
Dioscorea esculenta	Maoalu মাও আলু	Dioscoreaceae	Climber
Dioscorea pentaphylla	Jhum alu ঝুম আলু	Dioscoreaceae	Climber
Elephantopus scabar	Shamdhulon শামধুলন	Compositae	Herb
Entada phaseoloides	Gila, গিলা	Leguminosae	Woody climber
Ervatamia coronaria	Tagar, টগর	Apocynaceae	Bushy shrub
Euphatorium odoratum	Assamlata, আসামলতা	Compositae	Shrub
Flacourtia sepiaria	Boinchi, বৈঁচি	Dlacourtiaceae	Shrub
Garuga pinnata	Kapila, Bhadi, ভাদি	Burseraceae	Small tree
Glycomis arborea	Rangach, Datmajan, দাঁতমাজন	Rutaceae	Shrub
Grewia microcos	Patka, Assar, পটকা	Tiliaceae	Small tree
Aegle marmelos	Bel, বেল	Rutaceae	Medium tree
Albizia chinenensis	Chakua, Tarul, চাকুয়া	Leguminosae	Tall tree
Albizia lebbeck	Sirish, Kalo koroi, শিরিষ	Leguminosae	Tall tree
Alpinia nigra	Jangli ada, জংলী আদা	Zingiberaceae	Shrub
Alysicarpus vaginalis	Pannata, পানাতা	Leguminosae	Herb
Antidesma ghaesembilla	Khudijam, Timtoa, ক্ষুদি জাম	Euphorbiaceae	Small tree

Aporusa dioica	Pata Kharalla, পাতা খারালা	Euphorbiaceae	Small tree
Asparagus acerosus	Satamuli, শতমুলী	Liliaceae	Climber
Atylosia scarabaeoides	Banar Kalai, বানর কালাই	Leguminosae	Climber
Bambusa arundinacea	Katabans, কাটাবন	Gramineae	Tree alike
Bauhinia vahli	Cheher, Kanchan lata, কাঞ্চনলতা	Leguminosae	Climber
Bauhinia anguina	Gundilata, গান্দিলতা	Leguminosae	Small tree
Bridelia retusa	Kamkui, Kantakui, কান্তাকুই	Euphorbiaceae	Shrub
Butea monosperma	Palash, পলাশ	Leguminosae	Medium tree
Caesalpinia digyna	Kachai, teri, কাচাই	Leguminosae	Shrub
Careya arborea	Kumbi, কুম্বি	Lecythidaceae	Medium tree
Phyllanthus emblica	Amloki, আমলকি	Eephorbiaceae	Medium tree
Rungia pectinata	Pindi, পিন্ডি	Acanthaceae	Herb
Saccharum spontaneum	Khag, Kash, কাশ	Graminae	Herb
Schleichera oleosa	Kusum, কুসুম	Sapindaceae	Medium tree
Scindapus pfficinalis	Gajpipul, গজ পিপুল	Araceae	Climber
Semicarpus anacardium	Bhela, ভেলা	Anacardiaceae	tree
Shouea robusta	Sal, শাল	Dipterocarpaceae	Medium tree
Smilax aspera	Kumarlata, কুমার লতা	Smilacaceae	Climber
Spatholobus roxburghii	Palashi lata, পলাশী লতা	Leguminosae	Climber
Streblus asper	Sheora, শেওড়া	Utricaceae	Small tree

Tephrosia purpurea	Bannil, বানিল	Leguminosae	Shrhb
Thumbergia grandiflora	Nil lata, নীললতা	Acanthaceae	Climber
Thysanolaena maxima	Phuljar, ফুলঝর	Gramineae	Shrub
Urena lobota	Banokra, বানক্রা	Malvaceae	Shrub
Vamgieroa slomopsa	Moynakat, মৈনাকট	Rubiaceae	Shreb
Hemidesmus indicus	Anantamul, অনন্তমূল	Asclepiadaceae	Climber
Hibiscus manihot	Bankarpus, বন কর্পাস	Malvaceae	Shrub
Ichnocarpus fruticens	Shamlata, Kalilata, শ্যাম লতা	Apocynaceae	Climber
Lagerstroemia parviflora	Sidha jarul, সিধা জারুল	Lythraceae	Medium tree
Litsea polyantha	Menda, Kukurchita, কুকুর চিতা	Lauraceae	Medium tree
Melastoma malabathrecum	Lotki, Datranga	Melastomaceae	Shrub
Merremia umbillata	Sada Kalmi, সাদা কলমী	Convolvulaceae	Climber
Microcos Paniculata	Assar, Pesindi	Tiliaceae	Medium tree
Mikania cordata	Taralata, Assam lata, আসামলতা	Compositae	Shrub
Miliusa velutina	Gandhi gazari, গান্ধি গজারি	Annonaceae	tree
Mimosa rubricaulis	Bara Injjabati, বড় ইনজাবাতি	Leguminosae	Shrub
Moghania microphylla	Bara salpan, বড় সালপান	Leguminosae	Shrub
Morinda angustifolia	Rangach, রঙগাছ	Rubiaceae	Small tree

Mucuna pruriens	Shuashim	Leguminosae	Climber
Oplismenus compositus	Gohar, গহর	Gramineae	Herb
Panicum repens	Baranda, বারান্দা	Gramineae	Herb
Aporosa roxburghii	Karrola, ক্যারোলা	Euphorbiaceae	Small tree
Artocarpus fraxinifolius	Mandar, মান্দার	Moraceae	Medium tree
Artocarpus lakoocha	Barta, বারটা	Moraceae	Medium tree
Bambusa trlda	Muli, মূলী	Gramineae	Bamboo
Bambusa vulgaris	Bariala, বারিলতা	Gramineae	Bamboo
Bauhinia anguina	Goondilata, গুন্দিলতা	Caesalpinaceae	Small tree
Bischofia javanica	Kainjal, কাইঞ্জল	Euphohbiaceae	Medium tree
Bridelia retusea	Kamkui, কামকুই	Euphorbiaceae	Shrub
Callicarpa arborea	Bormala, বড়মালা	Verbenaceae	Medium tree
Calophyllum inophyllum	Sultan champha, সুলতান চাপা	Guttiferae	Medium tree
Carallia brachiata	Keabong, কেয়াবঙ্গ	Rhizophoraceae	Small tree
Cassia nodosa	Bandarlathi, বান্দরলাঠি Bansonail	Caesalpinaceae	Small tree
Cassia siamea	Minjiri, মিনজিরি	Caesalpinaceae	Medium tree
Woodfordia fruticosa	Rangkat, রঙগাছ	Lythraceae	Shrub
Xanthoxylum budrunga	Tejbal,Bajan, তেলবন	Rutaceae	Medium tree
Zizyphus mauritiana	Kul, কুল	Rhambanceae	Small tree
Zizyphus rogusa	Znigota	Rhamnaceae	Climber
Acacia concinna	Lat bahul	Mimosae	Shrub
Adina cordifolia	Holdu/Rangkat	Rubiaceae	Medium tree

Semicarpus anacardium	Bhela, ভেলা	Anacardiaceae	Medium tree
Solanum indicum	Pultibegun, পুলটি বেগুন	Solanaceae	Shrub
Spatholobus roxburghii	Goalialata, গোয়ালিয়া লতা	Leguminosae	Climber
Spondias pinnata	Amra, আমড়া	Anacardiaceae	Medium tree
Sterculia villosa	Udal, উদাল	Sterculiaceae	Medium tree
Syzygium aquea	Jambo, জাম্বো	Myrtaceae	Small tree
Syzygium claviflorum	Nalijam, নালী জাম	Myrtaceae	Small to medium tree
Syzygium fruticosum	Khudijam, ক্ষুদি জাম	Myrtaceae	Small tree
Syzygium grande	Dhakijam, ঢাকি জাম	Myrtaceae	Large tree
Syzygium jambos	Golapjam, গোলাপজাম	Myrtaceae	medium tree
Syzygium operculatum	Dhepajam, ঢেপা জাম	Myrtaceae	Medium tree
Syzygium syzygiodes	Kharijam, খাড়ি জাম	Myrtaceae	Medium tree
Tamarindus indica	Tentul, তেঁতুল	Leguminosae	Large tree
Tectona grandis	Teak, টিক	Verbenaceae	Tall tree
Terminalia catappa	Katbadam, কাঠবাদাম	Combretaceae	Tall tree
Paraserianthes falcataria	Malacana koroi, মালাকনা কড়ই	Leguminosae	Large tree
Parkia roxburghii	Lonchak, Kukititul, কুকি তেঁতুল	Leguminosae	Medium tree
Phyllanthus emblica	Amloki, আমলকি	Euphorbiaceae	Medium tree
Pithecellobium rubra	Jigra, জিগরা	Leguminosae	Small tree

Plaquium pulyanthum	Kurta, কুর্তা	Sapotaceae	Large tree
Polyalthia longifolia	Debdaru, দেবদারু	Annonaceae	Medium tree
Pongamia pinnata	Karanja, করঞ্জা	Leguminosae	Small tree
Protium serratum	Neul, Neur, নেউল	Burseraceae	Medium tree
Pterospermum acerifolium	Kanakchampa, Katchampa, কটকচাম্পা	Sterculiaceae	Large tree
Pterospermum lanceaefolium	Narcha, নারচা	Sterculiaceae	Small tree
Quercus lanceafolia	Jatbatna, জাতবাটনা	Fagaceae	Medium tree
Quercus spicata	Batna, বাটনা	Fagaceae	Medium tree
Randia faciculata		Rubiaceae	Large shrub
Saccharum spontaneum	Khag, Kash, কাশ	Gramineae	Herb
Samania saman	Raintree, রেইনট্রি	Leguminosae	Large tree
Sapindus mukrossi	Ritha, রিঠা	Sapindaceae	Small tree
Sapindus baccatum	Billa, Kalabel, কালা বেল	Sapindaceae	Small tree
Terminalia citrina	Hora, হোরা	Combretaceae	Medium tree
Tetrameles nodiflora	Chundul, Mainkat, চুন্ডুল	Datiscaceae	Tall tree
Thunbergia grandiflora	Nillata, নিলতা	Acantheceae	Climber
Tinospora cordifolia	Gulancha, গুলঞ্চ	Menispermaceae	Climber
Trema orientalis	Gunali, Jibon, জিবন	Ulmaceae	Small tree
Trewia nudiflora	Tipali, Medda, তিপালি	Euphorbiaceae	Medium tree
Vatica lanceaefolia	Lachuagarjan, লাচুয়া গর্জন	Dipterocarpaceae	Small to medium tree

Derris robusta	Jumurja	Leguminosae	Medium tree
Desmodium alatum	Desmodium ডেসমোডিয়াম	Leguminosae	Shrub
Dillenia indicum	Chalta, চালতা	Dilleniaceae	Tall tree
Dillenia pentagyna	Hargoza, হরগোজা	Dilleniaceae	Medium tree
Diospytos peregrina	Deshigab দেশী গাব	Ebenaceae	Medium tree
Diospyros racemosa	Urigab, Gulal উড়িগাব	Ebenaceae	Medium tree
Dipterocarpus turbinatus	Kaligarjan, Koroil, কালি গর্জন	Dipterocarpaceae	Tall tree
Duabanga grandiflora	Bandarlula বান্দুরলুলা	Sonneratiaceae	Tall tree
Lannea coromandelica	Jiga, Jeol, জিগা	Anacardiaceae	Medium tree
Lantana aculeata	Lantana, ল্যান্টানা	Verbenaceae	Shrub
Litsea glutinosa	Kukurchita, কুকুরচিতা	Lauraceae	Medium tree
Macaranga denticulata	Bura, Ratabura, বুরা	Euphorbiaceae	Medium tree
Mallotus albus	Kumaribura, কুমারীবুরা	Euphorbiaceae	Small tree
Mangifera sylvatica	Jangliam, Uriam, উড়িয়াম	Anacardiaceae	Medium tree
Melastoma malabathricum	Phutuli, ফুটুলি	Melastomaceae	Shrub
Melocanna baccifera	Mulibans, মুলিবন	Gramineae	Bamboo
Michelia champaca	Champaful, চাম্পাফুল	Magnoliaceae	Tall tree
Mitragyna parvifolia	Phutki kadam, Keli kadam, কেলি কদম	Rubiaceae	Medium tree
Moringa olitera	Sajna, সাজনা	Moringaceae	Medium tree

Mucuna imbricata	Kasi, কসি	Leguminosae	Climber
Neohouzeaua dulloa	Dullo bans, ডুলো বন	Gramineae	Bamboo
Nephelium litchi	Lichu, লিচু	Sapindaceae	Medium tree
Nerium indicum	Karabi, Rakta karabi, রক্ত করবী	Apocynaceae	Shrub
Flacourtia jangomas	Lukluki Paniala, পানিয়ালা	Flacourtiaceae	Small tree
Garcinia cowa	Kau, কাউ	Gesneriaceae	Small tree
Garcinia paniculata	Bubi-Kewa, বুবি কেওয়া	Gesneriaceae	Medium tree
Gardenia campanulata	Biolem	Rubiaceae	Shrub
Garuga pinnata	Bhadi, Silbhadi, ভাদি	Burseraceae	Medium tree
Glochidion lanceolarium	Kakra, কাঁকড়া	Euphorbiaceae	Shrub
Glochiidion multiloculare	Keotomi, Keura, কেওড়া	Euphorbiaceae	Shrub
Glochidion zelanicum	Zelanicum, জিলেনিকাম	Euphorbiaceae	Small tree
Glycomis arbores	Ranggach, Datmajan, দাঁতমাজন	Rutaceae	Shrub
Gmelina arborea	Gamar, গামার	Verbenaceae	Medium to large tree
Grewia microcos	Assar	Tiliaceae	Medium tree
Hopea odorata	Telsur, তেলশুর	Dipterocarpaceae	Tall tree
Imperata cylindrica	Ulu, Kash, উলু	Gramineae	Grass
Ipomoea fistulosa	Dholkalmi, ঢোলকলমী	Convolvulaceae	Shrub
Lagerstroemia parviflora	Tilla jarul, তিলা জারুল	Lythraceae	Medium tree

Bischofia javanica	Kanjal, Kanjal bhadi, কাঞ্জল ভাদি	Euphorbiaceae	Large tree
Bombax ceiba	Simul, শিমুল	Bombacaceae	Large tree
Bombax insigne	Pahari simul, পাহাড়ি শিমুল	Bombacaceae	Medium tree
Butea monosperma	Palash, পলাশ	Leguminosae	Medium tree
Caesalpinia crista	Nata, Lethanta নাটা	Leguminosae	Shrub
Calamis erectus	Kadam bet, কদম বেত	Palmae	Climber, cane
Calamus flagellum	Bhulum bet, ভুলাম বেত	Palmae	Climber, cane
Calamus guruba	Sundi bet, সুন্দি বেত	Palmae	Climber, cane
Calamus latifolius	Karak bet, কারাক বেত	Palmae	Climber, cane
Calamus tenuis	Jali bet, জলি বেত	Palmae	Climber
Callicarpa arborea	Bormala, Dhalahuza, ধলাহুজা	Verbenaceae	Small tree
Ethretia serrata	Kalahuja, কালাহুজা	Ehretiaceae	Medium tree
Elaeocarpus floribundus	Belphoi, বেল ফৈ	Elaeocarpaceae	Tall tree
Elaeocarpus robustus	Huara, Belphoi, বেলফৈ	Elaeocarpaceae	Medium tree
Entada phaseoloides	Gila lot	Leguminosae	Woody climber
Erioglossum rubiginosum	Bandarful, বান্দুরফুল	Sapindaceae	Small tree
Erythrina fusca	Mander, মান্দার	Leguminosae	Small tree
Erythrina indica	Polita mandar, পলিতা মান্দার	Leguminosae	Small tree
Eugenia khasiana	Khasiajam, খাশিয়া জাম	Myrtaceae	Medium tree

Eugenia lanceolaria	Parajam, পারা-জাম	Myrtaceae	Small tree
Eugenia macrocarpa	Chaltajam, চালতা জাম	Myrtaceae	Medium tree
Ficus bengalensis	Bot, Jhuribot, বট	Moraceae	Large tree
Ficus heterophylla	Bhuidumur, ভূই ডুমুর	Moraceae	Shrub
Ficus hirta	Dangra	Moraceae	Small tree
Ficus hispida	Kakdumur, কাকডুমুর Dumur	Moraceae	Shrub
Ficus nervosa	Pani dumur, পানি ডুমুর	Moraceae	Large tree
Ficus racemosa	Domra, ডুমরা	Moraceae	Medium tree
Ficus religiosa	Assawath, panbot, Pakur, পাকুর	Moraceae	Large tree
Ficus rumphii	Bot, Hijulia, বট	Moraceae	Medium to large tree
Cordia dichhotoma	Kalauja, কালাউজা	Boraginaceae	Medium tree
Craftaeva magna	Barun, বারুন	Capparidaceae	Small tree
Cupania pentapetala	Koipura, কৈপুরা	Sapindaceae	Large tree
Daemonorops jenkinsianus	Golla bet, গোলা বেত	Palmae	Climber
Dalbergia assamica	ডেলবার্জিয়া	Leguminosae	Tree
Dalbergia rimosa	Kawagurum	Leguminosae	Climbring shrub
Dalbergia velutina	Velutina, ভেলুতিনা	Leguminosae	Woody climber
Dendrocalamus hamiltonii	Pencha bans, পেঞ্চা বন	Palmae	Bamboo
Dendrocalamus longispathus	Lathibans, Orabans, লাঠিবন	Palmae	Bamboo
Derris elliptica	Tubamul	Leguminosae	Woody climber

Adenanthera pavonina	Raktakambal, রক্ত কম্বল	Leguminosae	Medium tree
Adhatoda vasica	Basak, বসাক	Acanthaceae	Shrub
Adina cordifolia	Haldu, Dakom, হলদু	Rubiaceae	Large tree
Aegle marmelos	Bel, বেল	Rutaceae	Medium tree
Aganosma marginata	Malati, মলতি	Apocynaceae	Climber
Alangium barbata	Salbiholom, শালবিহলম	Alangiaceae	Small tree
Albizia chinensis	Ghakoa, Sesra koroi, ছেচরা কড়ই	Leguminosae	Medium tree
Albizia lebbeck	Kalo koroi, Sirish, কালো কড়ই	Leguminosae	Medium tree
Albizia odoratissima	Tetuiya koroi, তেতুয়া কড়ই	Leguminosae	Large tree
Albizia lucida	Motor Koroi, মটর কড়ই	Leguminosae	Large tree
Albizia procera	Silkoroi, শিল কড়ই	Leguminosa	Tall tree
Callicarpa lingifolia	Bormala, বরমলা	Verbenaceae	Shrub
Callicarpa macrophylla	Fulujha, Bormala, বরমালা	Verbenaceae	Large shrub
Calophyllum polyanthum	Kamdeb, কামদেব	Guttiferae	Medium tree
Calotropis gigantea	Bara akand, বড় আকন্দ	Asclepiadaceae	Shrub
Camellia caudata	Phulkat	Ternstroemiaceae	Small tree
Canarium bengalense	Dhuna-rata	burseraceae	Medium tree
Canarium reiniferum	Dhup, Pairag, ধুপ	Burseraceae	Medium tree

Carallia brachiata	Rascow, Lat kard	Rhizophoraceae	Small tree
Cassia alata	Dadamardan	Leguminosae	Shrub
Cassia siamea	Minjiri, মিনজিরি	Leguminosae	Medium tree
Castanopsis hystrix	Kata singra, কাটা সিংগ্রা	Fagaceae	Large tree
Chukrassia tabularis	Chickrassi, চিকরাশি	Meliaceae	Medium tree
Cinnamomum cecidodaphne	Gonori, গনোরি	Lauraceae	Large tree
Cinnamomum obtusifokium	Tezia, Ram tejpata, রাম তেজপাতা	Lauraceae	Large tree
Cinnamomum tamala	Tejpata, তেজপাতা	Lauraceae	Medium tree
Clerodendrum indicum	Chokphuta, Bamunhatii, বামুনহাতি	Verbenaceae	Shrub
Clerodendrum kaempferi	Bhandariphul, বান্দারিফুল	Verbenaceae	Shrub
Cerodendrum viscosum	Bhant	Verbenaceae	Shrub
Bambusa polymorpha	Bethua, Pharua, ফরুয়া	Gramineae	Bamboo
Bambusa tulda	Mitenga, Mohal	Grmineae	Bamboo
Bambusa vulgaris	Grah, hariala, Jai, জই	Gramineae	Medium tree
Bauhinia malabarica	Kanchan, Phutki, কাঞ্চন	Leguminosae	Small tree
Bauhinia nervosa	Kanchan lata, কাঞ্চন লতা	Leguminosae	Climber
Bauhinia purporea	Deb kanchan, দেব কাঞ্চন	Leguminosae	Medium tree
Bauhinia vareegate	Swethanchan, Tulla তুল্লা	Leguminosae	Medium tree

Xylocarpus granatum	Dhundul, ধুন্দুল	Meliaceae	Small tree
Xylocarpus mekongensis	Passur, পশুর	Meliaceae	Medium tree
Macrosolen cochinchinensis	Pargacha, পরগাছা	Loranthaceae	Woody parasite in the crowns
Mallotus repandus	Bon notoy, gunti, বন নটয়	Euphorbiaceae	Scandent shrub
Mucuna giiantea	Doyal, Alkusi, দয়াল	Leguminosae	Climber; large seed pods have irritant hairs
Myriostachya wightiana	Dhanshi, ধানশি	Gramineae	Grass, common on new accretions
Nypa fruicans	Golpatta, গোলপাতা	Palmae	Palm with underground stem
Oryza coaractata	Harkata, Dhanshi, ধানশি	Gramineae	Grass
Pandanus foetidus	Kewa katta, কেওয়া কাটা	Pandanaceae	Prickly, Succulent Screw-pine
Paramignya citrefolia	Bannebu	Rubiaceae	Shrub
Petunga roxburghii	Narikitli, Jhijir, ঝিঝির	Rubiaceae	Small tree or shrub
Phoeix paludosa	Hantal, হন্তাল	Palmae	Thorny palm
Phragmites karka	Nol khagra, নল খগরা	Gramineae	Grass
Pongamia pinnata	Karanj, Karanja, করঞ্জা	Leguminosae	Small to medium tree
Premna corymbosa	Serpoli, Setpoli, শ্বেতপলি	Verbenaceae	Shrub or smal tree
Rhizophora apiculata	Khamo, Bhara, ভারা	Rhizophoraceae	Tree

Rhizophora mucronata	Garjan, Jhanna. গর্জন	Rhizophoraceae	Tree with stilt roots
Alpinia allughas	Tara, তারা	Zinziberaceae	Shrub
Alstonia scholaris	Chattim, ছাতিম	Apocynaceae	Medium tree
Amoora wallichii	Rangirata, রঙ্গিরতা	Meliaceae	Tall tree
Anthocephalus chinensis	Kadam, কদম	Rubiaceae	Medium tree
Antidesma acuminatum	Shialbuka, শিয়ালবুকা	Euphorbiaceae	Shrub
Aphania danura	Danura, Amruj, ধানুরা	Sapindaceae	Small tree
Aporusa dioica	Patakharolla	Euphorbiaceae	Small tree
Aquilaria agalloca	Agar, আগর	Thymelaeaceae	Tree
Artocarpus chaplasha	Chapalish, চাপালিশ	Moraceae	Large tree
Artocarpus heterophyllus	Kathal, কাঁঠাল	Moraceae	Medium tree
Artocarpus lacucha	Dewa cham, ডেউয়া চাম	Moraceae	large tree
Azadiracta indica	Neem, নিম	Meliaceae	large tree
Baccaurea ramiflora	Lathka, Latkan, লাক্ষা	Ephorbiaceae	Medium tree
Bambusa arundinacea	Kantabans, কান্তাবন	Gramineae	Bamboo
Bambusa balcooa	Sialbarua, Bora, শিয়াল বড়ুয়া	Gramineae	Bamboo
Bambusa nutans	Kaitta, Pichli, কৈতা	Gramineae	Bamboo
Acacia pennata	Aila, Bisoat, আইলা	Leguminosae	Climber
Arrocarpus fraxinifolius	Mandani, মান্দানী	Leguminosae	Tall tree

Intisa bijuga	Bhaela, bharal	Leguminosae	Small tree
Ixora undullata	Bon bakul, Palakajui, বনবকুল	Rubiaceae	Shrub
Kandelia candel	Gura, Gurae, Gurul	Rhizophoraceae	Small tree
Leea aequata	Kakjangha, কাকজঙ্ঘা	Leeaceae	Shrub
Lepisanthes rubiginosa	Bon lichu, Nush বনলিচু	Sapindaceae	Small tree
Luminitzera racemosa	Kirpa, Kripa	Sapindaceae	Small tree
Bruguiera sexangula	Kankra	Rhizophoraceae	Small to medium tree
Caesalpinia crista	Kutum kanta	Leguminosae	Scandent, armed shrub
Caesalpinia nuga	Shingrilata, শিংড়ি লতা Letkanta	Leguminosae	Shurb
Cerbera manghas	Dagor, Dakur, ডাকুর	Apocynaceae	Small tree
Ceriops decandra	Goran, গোরান	Rhizophoraceae	Shrub or small tree
Clerodendrum inerme	Bhat, Sitki, Banjui, বনজুই	Verbenaceae	Scandent shrub
Cynometra ramiflora	Shingra, শিংড়া	Leguminosae	Shrub or small tree
Cyperus javanicus	Melay, Kusha কুশা	Cyperaceae	Grass like (sedge)
Dalbergia candenatensis	Chanda lata, চান্দা লতা	Leguminosae	Climbing shrub
Dalbergia spinosa	Kalilota, Chanda katta, কালি লতা	Leguminosae	Scandent, armed shrub
Dendrophthoe falcata	Pargacha, পরগাছা	Lorathaceae	Woody parasite in the crown.
Derris scandens	Noalta	Leguminosae	Large climber
Derris trfoliata	Gila lota, গিলা লতা Gawaliasota	Leguminosae	Climber

D. uliginosa	Pan lota, পান লতা		
Derris sinuata	Mahajanilata, মহাজনীলতা	Leguminosae	Climber
Diospyros peregrina	Gab, গাব	Ebenaceae	Tree found in formally inhabited areas
Drypetes sp	Achet	Euphorbiaceae	Scandent shrub
Eriochloa procera	Nol gash, নল ঘাস	Gramineae	Grass
Saccharum spontaneun	Kash, Khag, কাশ Kaicha	Gramineae	Tall Grass
Salacia chinensis	Choyt barai, চৈত বরই	Celastraceae	Small tree
Sarcolobus globosus	Bowali lota, বোয়ালী লতা	Asclepiadaceae	Climber
Sonneratia apetala	Keora, কেওড়া	Sonnertiaceae	Medium tree to tall tree
Sonneratia caseolaris	Choyla, Ora, চৈলা	Sonnertiaceae	Medium tree
Stenochlaena palustris	Deki lota, ঢেকি লতা	Blechnaceae	Climbing fern
Tamarix dioica (Acrostichum scandens)	Laljhu, লালঝাউ	Tamaricaceae	Small tree
Tamarix indica	Nonajhao, নোনাঝাউ	Tamaricaceae	Small tree
Tetrastigna bracteolatum	Golgoti lota, গলগতি লতা	Vitidiaceae	Climber
Thumbergia grandiflora	Jermani lota, জার্মানি লতা	Thunbergiaceae	Climber
Thespesia populnea	Parash, পরশ	Malvaceae	Small tree
Viscum monoicum	Shamu lota, শামু লতা	Loranthaceae	Woody parasite
Vitis lanata	Gode lata, গদি লতা	Vitaceae	Climber

Quercus acuminata	Kantalalbatna	Fagaceae	Small tree
Saccharum spontaneum	Khagra, Kash	Gramineae	Geass
Sapium baccatum	Kala boil	Euphorbiaceae	Shrub
Saraca indica	Ashok	Caesalpinaceae	Small tree
Schaphium wallichii	Chaugan	Sterculiceae	Tree
Schima wallichii	Kanak	Theaceae	Medium tree
Schleichera trijuga	Kusum	Sapindaceae	Tree
Semicarpus anacardium	Bhela	Anacardiaceae	Medium tree
Smilax prolifera	Kaunria lata	Liliaceae	Climber
Smilax roxburghiana	Kumiria lata	Liliaceae	Climber
Acrostichum aureum	Hoda, Hodo	Pteridiaceae	Gregarious fern
Aegialitis rotundifolia	Dhalchaka/Sitali	Plumbaginaceae	Small tree
Aegiceras corniculatum	Khalisha	Myrsinaceae	Shrub or small tree
A. majus	Khalshi		
Amoora cucullata	Amur	Meliaceae	Small tree
Avicennia alba	Sadda baen	Avicenniaceae	Small tree
Avicennia marina	Mairsa baen	Avicenniaceae	Medium tree
Avicennia officinalis	Baen,Bara baen	Avicenniaceae	Medium tree
Barringtonia racemosa	Sumundraphal, Kumia	Lecythidaceae	Small to Medium tree
Blumea lacera	Barakukshima	Compositae	Aromatic herb
Bouea burmanica	Muriam	Anacardiaceae	Small tree
Brownlowia tersa	Sundri lota	Tiliaceae	Scandent shrub
B. lanceolata	Lota Sundri		

Bruguiera gymnorhiza	Kankra	Rhziophoraceae	Small to medium tree
Bruguiera parveflora	Bhat lati	Rhizophoracea	Small tree
Tinospora cordifolia	Gulancha	Menispermaceae	Creeper
Trewia nudiflora	Pitali	Euphorbiaceae	Tall tree
Turpinia pomifera	Jonokijam	Sapindaceae	Small tree
Typha elephantinaa	Hogla	Typhaceae	Shrub
Uraria lagopoides	Goladchakulia	Papilionaceae	Shrub
Uraria picta	Sankarjata	Papilionaceae	Shrub
Vitex pedunqularis	Harina,Arsol	Verbenauae	Large tree
Vitex trifolia	Nilnisinda	Verbenaceae	Shrub
Vitis lanceolaria	Harinia lata	Vitaceae	Climber
Vitis repens	Marmaria lata	Vitaceae	Climber
Xylia dolabriformis	Pynkado	Mimosae	Medium tree
Eugenia fruticosa	Ban jam, বনজাম	Myrtaceae	Small tree
Excoecaria agallocha	Gewa, গেওয়া	Euphorbiaceae	Medium tree
Excoecaria indica	Batla, Batul	Euphorbiaceae	Small tree
Ficus microcarp	Jir	Moraceae	Medium tree
Flagellaria indica	Abethi, Banschand	Flagellariaceae	Climber
Flueggea virosa	Sitka, Sitki	Euphorbiaceae	Scandent shrub
Heritiera fomes	Sundari, সুন্দরী	Sterculiaceae	Tall tree
Hibiscus tiliaceous	Bhola, ভোলা	Malvaceae	Shrub
Holarrhena antidysenterica	Kuruz, Kurchi কুরচি	Apocynaceae	Shrub
Hoya parasitica	Agacha,Pargacha	Asclepiadaceae	Climber
Imperata cylindreca	Ulu, Sungrass উলু	Gramineae	Grass

Musa sapientum	Jangli Kala, জংলী কলা	Musaceae	Herb
Nechouzeana duliooa	Daloobans, ডালুবন	Gramineae	Bamboo
Oxytenanthera auriculata	Kaliserri কেলিসেরি	Gramineae	Bamboo
Oxytenanthera nigrociliata	Kalibans, কালিবন	Gramineae	Bamboo
Palaquium polyanthum	Tali, টালি	Sapotaceae	Tall tree
Pavetta indica	Kalda	Rubiaceae	Shrub
Phyllanthus emblica	Amloki, আমলকী	Euphorbiaceae	Small tree
Podocarpus nerifolia	Banspats, বনস্পতি	Conitereae	Medium tree
Pongamia pinnata	Karang/Karanja, করঞ্জা	Papilionaceae	Small tree
Pterocarpus dallbergioides	Padauk	Papilionaceae	Tall tree
Haplophragme adenophyllum	Dakrum, ডাকরাম	Bignoniaceae	Tree
Heynea trijuga	Gutgutiya, গুটগুটিয়া	Meliaceae	Tall tree
Hopea odorata	Telsur, তেলশুর	Dipterocarpaceae	Small tree
Hymenodictyon excelsum	Jusan/Butum বুতুম	Rubiaceae	Tree
Ipomoea paniculata	Bhui kumra ভুঁই কুমড়া	Convolvulaceae	Climber
Ipomoea pes-caprae	Chagul kuri চাগুল কুরি	Convolvulaceae	Climber
Lagerstroemia macrocarpa	Manjarul মেনজারুল	Lythraceae	Small tree
Lagerstroemia speciosa	Jarul, জারুল	Lythraceae	Midium
Lannea coromandelica	Jiul bhadi জিয়ল ভদি	Anacadiaceae	Midium tree

Litsea sebifera	Kukurchita কুকুরচিতা	Lauraceae	Small tree
Lopopetalum fimbritum	Narikeli নারিকেলী	Celastraceae	Medium tree
Macaranga denticulata	Bure, বুরি	Euphorbiaceae	Medium tree
Massa ramentacea	Maricha, মরিচা	Myrsinaceae	Shrum
Mallotus philippinensis	Punnag, পুন্নাং	Euphorbiaceae	Small tree
Mangifera indica	Mango, আম	Anacardiaceae	Medium tree
Mangifera sylvateca	Uriam, উড়িয়াম	Anacardiceae	Tall tree
Stereospermum suaveolens	Parul, পারুল	Bignoniaceae	Medium tree
Swietenia macrophylla	Bara mahagoni	Meliaceae	Medium tree
Swintonia floribunda	Civit/Amchundal সিভিট	Anacardiaceae	Tall tree
Syzygium cuminni	Kalijam	Myrtaceae	Tall tree
Teincstachyum griffithii	Bazali	Gramineae	Bamboo
Terminalia arjuna	Arjun	Combretaceae	Tall tree
Terminalia catappa	Janglibadam	Combretaceae	Medium tree
Terminalia citrina	Jara	Combretaceae	Medium tree
Terminalia crenulata	Kanak jarul	Combretaceae	Medium tree
Tetrameles nudiflora	Mainkat	Datiscaceae	Medium tree
Pterospermum acerifolium	Kanak champa, Moos	Sterculiaceae	Medium tree
Pterospermumse misaggitatum	Assar, Ban assar	Sterculiaceae	Medium tree
Quercus velutina	Silbatna	Fagaceae	Medium tree

Ageratum conyzoides L.	Uchanti, উচন্তি	Compositae	Herb
Albizia chinensis	Chakua, চকুয়া	Mimosae	Tall tree
Albizia procera	Sil Korli, শিল কড়ই	Mimosae	Tall tree
Alpinia allughas	Tara , তারা	Zinziberaceae	Shrub
Anogeissus lanceolata	Kanta Koroi, কান্তা কড়ই	Combretaceae	Small tree
Duabanga sonneratoides	Bandarhola, বান্দর হোলা	Lythraceae	Tall tree
Engolhardtia spicata	Bolas, বলাশ Jhumkabhadi	Juglandaceae	Tree
Entada phasosloides	Gilagach, গিলাগাছ	Mimosae	Woody climber
Erythrina variegata	Pannaya mander, পানীয় মন্দার	Papilionaceae	Small tree
Erythrina indica	Palita mandar, পালিতা মান্দার	Papilionaceae	Small tree
Euphatorium odoratum	Assam lata, আসাম লতা	Compositae	Shrub
Fagara budrunga	Buerang, বুইরঙ্গ	Rutaceae	Medium tree
Ficus benghalensis	Bat, বেত	Moraceae	Tall tree
Ficus heleruphylla	Bheci dumur, ভেচি ডুমুর	Moraceae	Tree
Fortium serratum	Gutgutiya, গুটগুটিয়া	Barseraceae	Tall tree
Garuga pinnata	Sil bhadi, শিল ভাতি	Burseraceae	Small tree
Glochidion sp.	Keonra, কেওনরা	Euphorbiaceae	Shrub
Giochidio multiloculare	Kestoma, কেস্টোমা	Euphorbiaceae	Small tree
Chickrassia tabularis	Chickrassi, চিকরাশি	Meliaceae	Medium tree

Cinnamomum cecidodaphne	Gundroi গুনড্রে	Lauraceae	Small tree
Cinnamomum iners	Tejbohal, তেজবহাল	Lauraceae	Medium tree
Clausena excavata	Dhulia, Daricha ধুলিয়া	Rutaceae	Shrub
Clerodendron viscosum	Bhaint, ভাহেন্ট	Vervenaceae	Shrub
Clinogyne dichotoma	Murta/Patipata পাটিপাটা	Marantaceae	Shrub
Combretum acuminatum	Patyni, পাটিনি	Combretaceae	Climber
Cordia dichotoma	Bohat/Bahal বহাট	Boraginaceae	Shrub
Cycas spp.	Jam chattan জাম চটান	Cycadaceae	Small tree
Dehausia kurzii	Madan mosta মদন মস্তা	Lauraceae	Small tree
Dendroculamus longispathus	Orah ওরাহ	Gramineae	Bamboo
Derris robusta	Jumurja, যুজুরজা	Papilionaceae	Small tree
Desmodium gangeticum	Salpani, সালপানি	Papilionaceae	Shrub
Diospyros peregrina	Gab, গব	Ebenaceae	Medium tree
Dipterocarpus alatus	Silgarjan শিল গর্জন	Dipterocarpaceae	Tall tree
Meliosomd pinnata	Adaliya আদালিয়া	Saviaceae	Tree
Menzoneuron cyculiatum	Mogaserra knata	Caesalpineae	Small tree
Merrenia vitirfolia	Karnalota	Convolvulaceae	Climber
Micromelum minutum	Ban Kunch, বন কুঞ্চ	Rutaceae	Small tree
Mucuna pruriens	Almushalata	Papilionaceae	Climber
Murraya exotica	Kamini, কামিনী	Rutaceae	Shrub

Vernonia arborea	Pani kossom, পানি কুসুম	Compositae	Medium tree
Vitex negundo	Nishinda, নিশিন্দা	Verbenaceae	Large shrub
Vitex peduncularis	Arsos, Goda, গোদা	Verbenaceae	Large tree
Vetex pinnata	Badruk, বদরুক	Verbenaceae	Large tree
Vitis latifolia	Horinia lata, হরিনিয়া লতা	Vitaceae	Climber
Vitis quadrangularis	Harjora, হাড়জোড়া	Vitaceae	Climber
Wrightia tomentosa	Dudhurus, দুধরাক্ত	Apocynaceae	Small tree
Xylia dolabriformis	Lohakat, লোহাকাঠ	Leguminosae	Tall tree
Zanthoxylum budrunga	Tejbol, Bajna, বাজনা	Rutaceae	Medium tree
Ziziphus mauritia	Boroi, Kul, বরই	Rhamnaceae	Small tree
Ziziphus rugosa	Bonbori, বনবরই	Rhamnaceae	Small tree
Callicarpa arborea	Barmala, বরমালা	Verbenaceae	Medium tree
Conarium resiniterum	Pairag/Dhup, ধুপ	Burseraceae	Tall tree
Carallia brachiata	Ros kau, রস কাউ	Rhizophoraceae	Medium tree
Cattleya sp	Orchid, অর্কিড	Orchidaceae	Orchid
Cinnamomum cecidodaphne	Tejbohal, তেজবহাল	Lauraceae	Medium tree
Clerodendrum infortunatum	Bhat, ভাটি	Verbenaceae	Shrub
Combretum latifolium	Goichalata, গইচালতা	Combretaceae	Climber
Corida myxa	Bohal, বহাল	Boraginaceae	Medium tree
Daemonorops jenkinsisnus	Golak bet, গোলক বেত	Gramineae	Came
Dalbergia spinosa	Ananta kanta, অনন্ত কান্তা	Leguminosae	Shrub

Dendrobium pierardi	Jibanti, জিবন্তি	Prechidaceae	Orchid
Dendrocalanus hamiltonii	Pachabans, পাচাবন	Gramineae	Bamboo
Dendrocalamus longispathus	Orah bans, ওরাবন	Gramineae	Bomboo
Derris robusta	Jangubia, কঙ্গুরিয়া	Leguminosae	Medium tree
Dillenia pentagyna	Hargoza, হাড়গোজা	Dilleniaceae	Medium tree
Dioscoea pentaphylla	Jhumalu, ঝুমালু	Dioscoreaceae	Climber
Dipterocarpus alatus	Sil garjan, Dhuligarjan, শিল গর্জন	Dipterocarpaceae	Tall tree
Dipterocarpus costatus	Teligarjan, তেলি গর্জন	Dipterocarpaceae	Tall tree

উৎস : Chaffey and Sandom, 1985; Prain, 1903; Nasker & Bakshi, 1987; Alam and Shahidullah (Per. Com.)

পরিশিষ্ট — দুই

কৃষি বনায়নে রোপণ উপযোগী গাছের নাম ও ব্যবহার

সাধারণ নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	প্রধান ব্যবহার
রেইনট্রি	Rain Tree	*Samanea saman*	কাঠ, জ্বালানি
কড়ই	Koroi	*Albizia* spp.	কাঠ, জ্বালানি
নিম	Neem	*Azadirachta indica*	কাঠ, ভেষজ
পিতরাজ	Pitraj	*Amoora rohituka*	জ্বালানি ও যন্ত্রপাতি
মান্দার	Alder	*Erythrina* spp.	জ্বালানি
শিমুল	Silk Cotton	*Salmalia malabaricum*	জ্বালানি
জারুল	Jarul (Queen flower)	*Lagerstroemia speciosa*	জ্বালানি ও যন্ত্রপাতি
হিজল	Hijal	*Barringtonia acutangula*	জ্বালানি
তেঁতুল	Tamarind	*Tamarindus indica*	কাঠ
বাবলা	Babla	*Acacia nilotica*	যন্ত্রপাতি
জিগা	Jhiga	*Lannea coromandelica*	বেড়া
শ্যাওড়া	Sahora	*Streblus* spp.	জ্বালানি
আম	Mango	*Mangifera indica*	কাঠ, ফল
কাঁঠাল	Jack Fruit	*Artocarpus heterophyllus*	কাঠ, ফল
সুপারি	Betel nut	*Areca catechu*	কাঠ, ফল
নারকেল	Coconut	*Cocos nucifera*	ফল
খেজুর	Date palm	*Phoenix dactylifera*	ফল জ্বালানি
জাম	Black berry	*Eugenia* spp.	কাঠ
বরই	Jujubi, Plum	*Ziyphus jujuba*	জ্বালানি, ফল
পেয়ারা	Guava	*Psidium guajava*	ফল
বেল	Wood apple	*Aegle marmelos*	ফল, কাঠ
আতা	Ata	*Annona* spp.	ফল
আমড়া	Hog plum (Goose berry)	*Embelica officinalis*	ফল
বরাক বাঁশ	Bamboo	*Bambusa vulgaris*	নির্মাণ

মূলী বাঁশ	Bamboo	*Melocanna (Bambusoides) baccifiera*	নির্মাণ
মাকলা বাঁশ	Bamboo	*Bambusa nutans*	নির্মাণ
তল্লা বাঁশ	Bamboo	*Bambusa nutans*	নির্মাণ
ভেরেন্ডা	Castor	*Ricinus communis*	তেল
কফি	Coffee	*Coffea* spp.	পানীয়
ঝাউ	Jhau	*Casuarina (Equisetirolia,* Forsk) *littorea* L.	সাদৃশ্য
দারুচিনি	Cinnamon	*Cinnamomum (Zeylanicum* B.) *Verum,* Poesl.	মসলা
হলুদ	Turmeric	*Curcuma longa*	মসলা
গিনি ঘাস	Guinea grass	*Panicum maximum*	গোখাদ্য
নেপিয়ার ঘাস	Napier grass	*Pennisetum purpureum*	গোখাদ্য
বড় মেহগনি	Mahogamy	*Swietenia macrophylla*	কাঠ
সেগুন	Teak	*Tectona grandis*	কাঠ
বন কাঁঠাল	Wild jack fruit	*Artocarpus (Hirsuta) lakucha*	কাঠ
পান	Betel vine	*Piper betel*	পানীয়
লেবু ঘাস	Lemon grass	*Cymbopogon citratus*	সুগন্ধী
তাল	Pamyra palm	*Borassus flabellifer*	কাঠ
রাবার	Rubber	*Heven braziliensis*	রাবার
অড়হর	Arhar	*Cajanus cujan*	ডাল
আকাশমনি	Akashmoni	*Acacia auriculiforms*	কাঠ, জ্বালানি
ক্যালিয়েন্ড্রা	Calliandra	*Calliandra calothyrsus*	জ্বালানি
কচু	Taro	*Colocasia* spp	সবজি
গাছ আলু	Yam	*Dioscorea* spp	সবজি
কলা	Banana	*Musa* spp	সবজি

লেবু	Citrus	*Citrus spp*	ফল
পেঁপে	Papays	*Carica papaya*	ফল
ডালিম	Pome granate	*Punica granatum*	ফল
আদা	Ginger	*Zingiber offcinale*	মসলা
গোল মরিচ	Black pepper	*Piper nigrum*	মসলা
ভুট্টা	Maize	*Zea mays*	দানাশস্য
সরগাম	Sorghum	*Sorghum bicolor*	পশুখাদ্য
কাজুবাদাম	Cashew	*Anacardium occidentale*	কাঠ
কাসবা	Casava	*Manihot esculenta*	খাদ্য
জলপাই	Olive	*Elacocarans robustus*	ফল
তেজপাতা	Bay leaf	*Cinnamomum cassia*	মসলা
পাহাড়ি কলা	Manila hemp	*Musa textilis*	আঁশ
শিমুল	Silk cotton	*Bombax ceiba*	আঁশ
মহুয়া	Mahua	*Madhuca indica*	তেল
শাল	Shal	*Shorea robusta*	কাঠ
গর্জন	Garjan	*Dipterocarpus turbinatus D.costatus D. alatus*	কাঠ
গামার	Gamar	*Gmelina arborea*	কাঠ
জারুল	Queen flower	*Lagerstroei speciosa*	কাঠ জ্বালানি
সুন্দরী	Sundari	*Heritiera fomes*	কাঠ
শিরিষ	Sirish	*Albizia lebbeck*	কাঠ
কড়ই	Koroi	*Albizia procera*	কাঠ
শিলকড়ই	Koroi	*Albizia odoratissima*	কাঠ
বৈলাম	Bailam	*Swintionia floribunda*	কাঠ
চাপালিশ	Chapalish	*Artocarpus chapuase chaplasha* Roxb.	কাঠ
তেলসুর	Telsur	*Hopea odorata*	প্যাকিং
গেওয়া	Geoa	*Exvoecaria agallocha*	কাগজ কল
গাব	Evony	*Diospyros ebenum*	কাঠ
শিশু	Sissu	*Dalbergia sisoo*	কাঠ

তেলিকদম	Telikadom	*Adina caroifolia, Leucaena leucocephala*	খুঁটি
নাগেশ্বর	Negeswar	*Mesua ferrea* L.. *Mesua nagassarium* Kost	কাঠ
আসন	Asan	*Terminalia tomentosa*	জলযান
লোহাকাঠ	Loha kat	*Xylia dolabiformis*	কাঠ
কদম	Kadam	*Anthochphalus chinensis*	প্যাকিং
ছাতিম	Chatim	*Alstonia scholaris*	কাঠ
আমলকি	Emblica	*Embelica officinalis*	ভেষজ
তুণ	Toon	*Cedrella tonna*	বাদ্যযন্ত্র
কুচি বাবলা	Babla	*Acacia decurrens*	ট্যানিন
অর্জুন	Arjuna	*Term lalia ajruna*	ভেষজ
বাদাম	Cashew, Cheekit	*Castanea dentata*	ট্যানিন
উলট চণ্ডাল	Ulat Chandal	*Gloriosa superba*	ভেষজ
উলট কম্বাল	Ulat Kamabal	*Abroma augusta*	ভেষজ
শতমূলী	Shatamuli	*Asparagus racemosus*	ভেষজ
আকন্দ	Akanda	*Calotropis procera*	ভেষজ
তালমাখনা	Talmukhna	*Hygrophylla auricelata*	ভেষজ
অশোক	Ashok	*Saraca indica*	ভেষজ
ঘৃতকুমারী	Grit kumari	*Aloe barbadens*	ভেষজ
থানকুনি	Thankuni	*Centella asiatica*	ভেষজ
মুক্তঝুরি	Muktajhuri	*Acalypha indica*	ভেষজ
তুলসী	Tulsi	*Ocimum sanctum*	ভেষজ
মহাভৃঙ্গরাজ	Mohabringraj	*Wedelia (Calendulaceae) chimensis*	ভেষজ
কৃষ্ণচূড়া	Peacock tree	*Delonia regia*	ফুল, জ্বালানি
ডুমুর	Fig	*Ficus* spp.	জ্বালানি
তুঁত	Mulberry	*Moras indica*	ভেষজ
কমলা, মাল্টা	Orange	*Citrus sinensis*	ফল
জাম	Blockberry	*Syzygium cumini*	কাঠ

গ্লিরি-সিডিয়া	Gliricidia	*Giricidia sepium*	জ্বালানি
ইপিল ইপিল	Ipil Ipil	*Leucaena leucocephala*	পশু খাদ্য, জ্বালানি
বকাইন	Bokain	*Melia (Azedarach) sempervirens* (L)	কাঠ
মিনজিরি	Minijiri	*Cassia siamea*	জ্বালানি
কেরং	Kerong	*Derris indica*	জ্বালানি
লিচু	Litchi	*Lichi chinensis*	ফল
কদবেল	Kadbel	*Feronia limonia*	জ্বালানি
আমড়া	Gosse berry	*Spondias dulcis*	ফল
জাম্বুরা	Pomelo	*Citrus grandis*	ফল, জ্বালানি
সাজনা	Dram stick	*Moringa oleiffra*	সবজি
কামরাঙ্গা	Star Fruit	*Averrhoa carambola*	ফল, জ্বালানি
বিলাতী গাব	Rive evony	*Diospyros embryopters*	কাঠ, ফল
বট/অশ্বথ	Banyan	*Ficus bengalensis*	কাঠ, জ্বালানি
মেহিদী	Mehdi	*Lawsonia (Alba) inermis* L.	হেজ
দেবদারু	Debdaru	*Polyalthia longifolia*	সুদৃশ্য
ডেওয়া	Dewa	*Artocarpus (Lakoocha) lacucha*	কাঠ জ্বালানি
খয়ের	Khair	*Acacia catechu*	পানীয়
ঘোড়ানিম/গোরানিম	Geranim	*Melia azedarach*	ভেষজ
জামরুল	Wax fambu	*Syzygium. smrangense (Eugenia javanica)*	জ্বালানি, ফল
কাউ	Cowa Fruit	*Garcinia cowa*	কাঠ
আতাফল	Sugar apple	*Annona sqauamosa*	ফল
সফেদা	Sapota	*Achras sapota*	ফল
রাধাচূড়া	Radhachura	*Caesalpinia pulcherrima*	সুদৃশ্য, ফুল

সোনালু	Golden shoer (Monky Stick)	*Cassia fistula*	কাঠ
হরিতকি	Black	*Terminali chebala*	ভেষজ
বহেরা	Bedda nut	*Terminalia belerica*	ভেষজ
জয়ন্তী	Sesban	*Sesbania sesban*	জ্বালানি
রক্ত কাঞ্চন	Kanchan	*Bauhinia purpurea*	সুদৃশ্য
ঢোলকলমী	Dholkalmi	*Litsea polyantha*	জ্বালানি
ম্যানজিয়াম	Mangium	*Acacia mangium*	কাঠ, জ্বালানি
মলাকানা	Mollacana	*Albizia mollucana*	কাঠ, জ্বালানি
ধইনচা	Sesbania	*Sesbania bispinosa*	জ্বালানি
বকফুল	Bakful	*Sesbania grandiflora*	জ্বালানি
সেসবান	Sesban	*Sesbania sesban*	জ্বালানি
ইউক্যালিপটাস	Eucalyptus	*Eucalyptus citriodora*	কাঠ, জ্বালানি
	"	*E. brassiana*	"
	"	*E. camal dulensis*	"
	"	*E. tereticornis*	"

একক ননলিগুম্যম গাছ

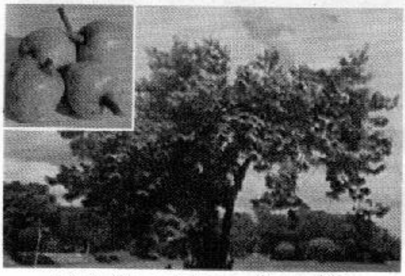

আতা গাছ, আতা ফল (ইনসেটে)

পিটালি গাছ

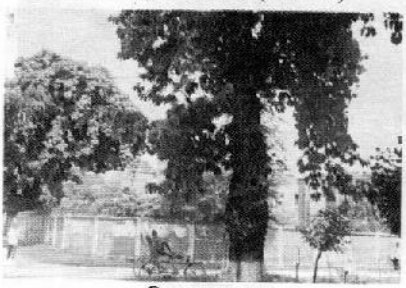

বিষফল গাছ

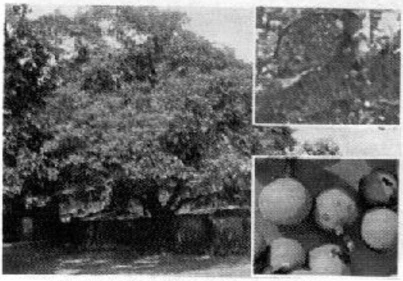

প্রকৃত ডুমুর গাছ, ডালে ডুমুর ফল (ইনসেটে), প্রকৃত ডুমুর ফল (ইনসেটে)

খোকসা ডুমুর গাছ

পিতরাজ গাছ

বট গাছ

পলাশ গাছ, পলাশ ফুল (ইনসেটে)

ওট গাছ

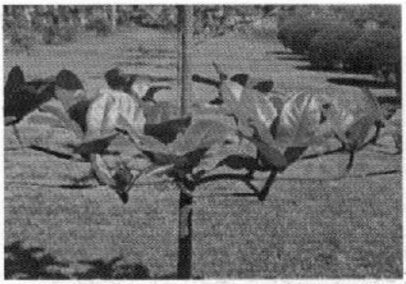

কাঠ বাদাম গাছের একাংশ

বারি কাঠ বাদাম গাছ

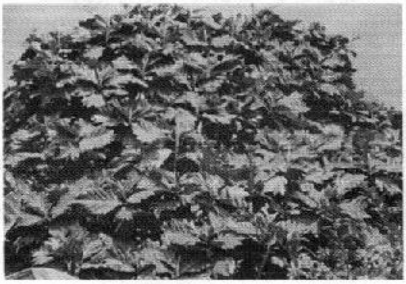

ব্রেক ফাস্ট গাছ

রয়েল পাম্প গাছ

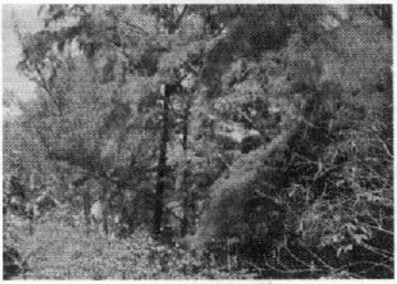

বড় ঝাউ গাছ

নীল গাছ

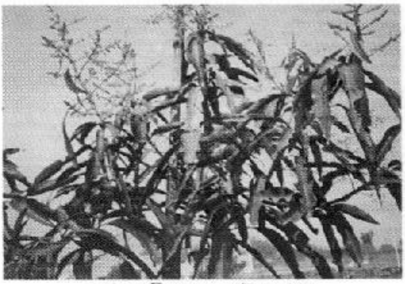

আম্রপালি গাছের উপরাংশ

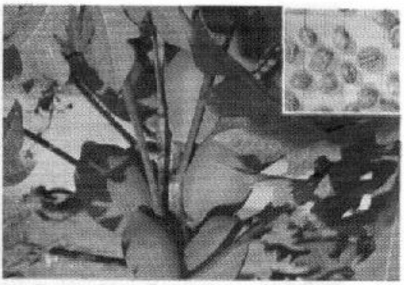
ফলসহ পেঁপে গাছ, পেঁপের বীজ (ইনসেটে)

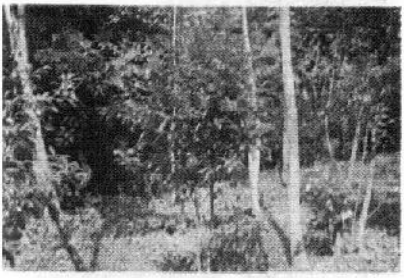
তেজপাতা গাছ

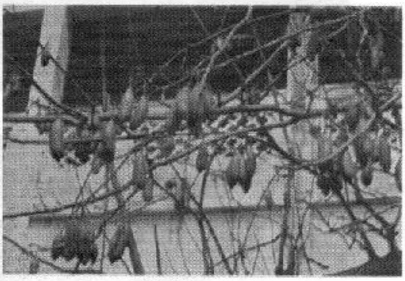
থাই শিমুল ফল

বারি মহানন্দা গাছ

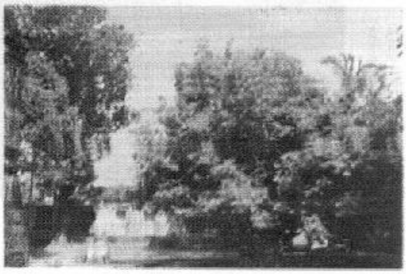
তমাল গাছ

ভেরেন্ডা গাছ

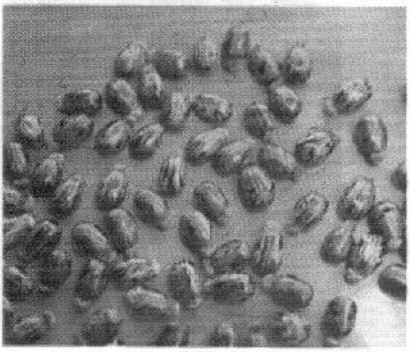
ভেরেন্ডা বীজ

পান্থপাদপ গাছ

কথবেল গাছ

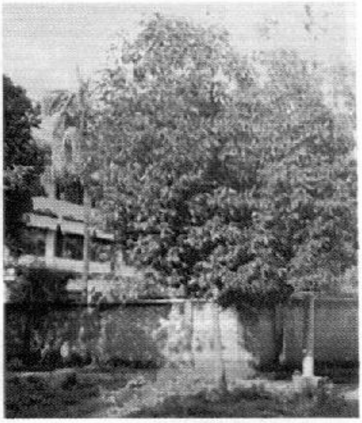

বকুল গাছ

দেবদারু গাছ

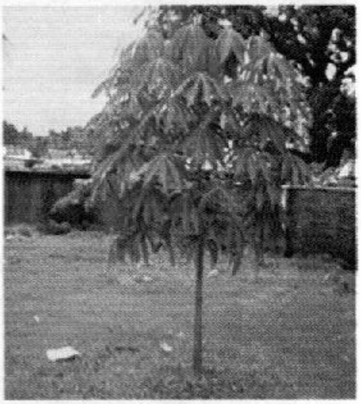

শিমুল চারা

শিমুল ফুল, শিমুল তুলা (ইনসেটে)

ঘোড়া নিমগাছ

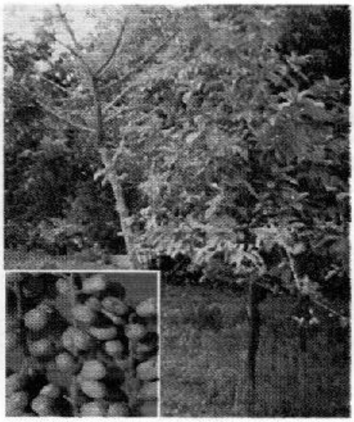

জিগা গাছ, জিগা ফল (ইনসেটে)

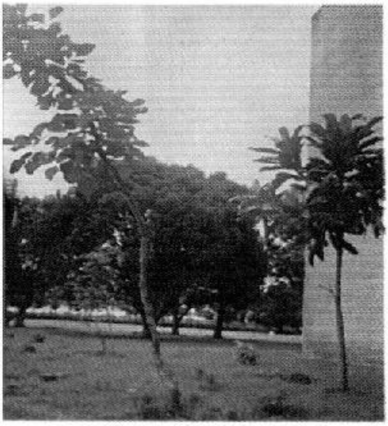

চালতা ও পলাশ গাছ (ডানে)

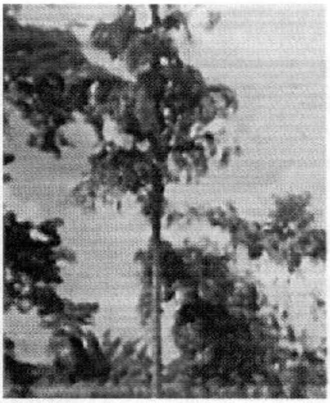

চাউ গাছ

ঝুড়ি চাউ গাছের উপরাংশ

শ্যাওড়া গাছ

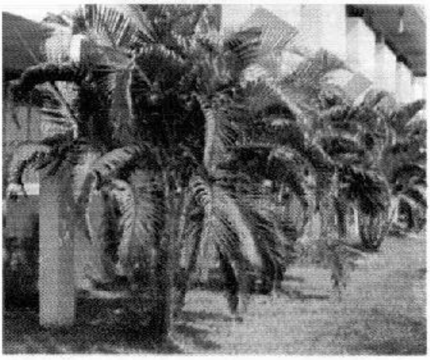

পাম গাছ

রয়েল পাম চারা

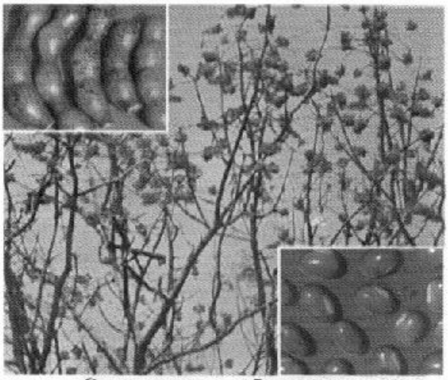

ফুলসহ পালিতা মান্দার গাছ, পালিত মান্দার ফল (উপরে ইনসেটে) ও পালিতা মান্দার বীজ (নিচে ইনসেটে)

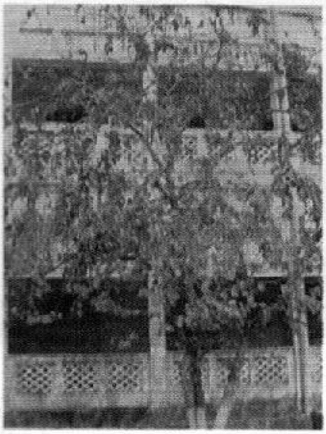

বোহেনিয়া

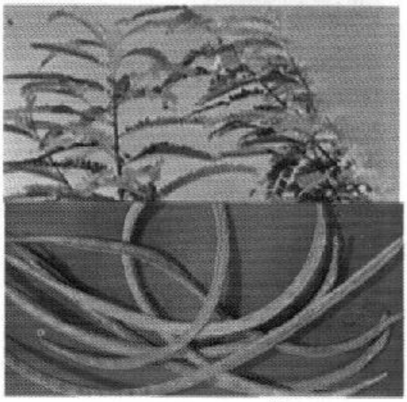

বকফুল গাছ ও ফল (নিচে)

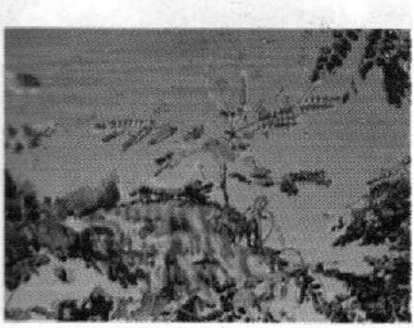

রক্তচন্দন গাছ

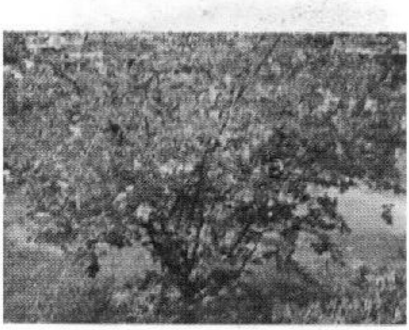

ফুলসহ হলদে কাঞ্চন গাছ

একক লিগুমিনাস গাছ

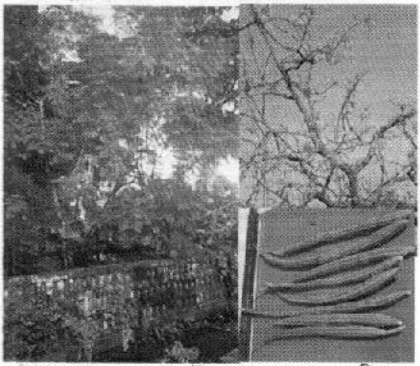

সাজনা গছ ও ফুল (উপরে) এবং ফল (নিচে)

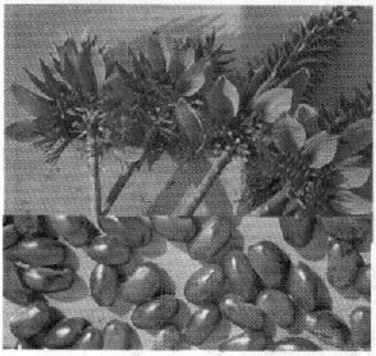

মান্দার ফুল ও মান্দার বীজ (নিচে)

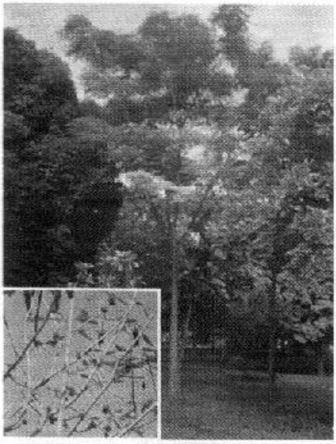

ইপিল ইপিল গাছ, ইপিল ইপিল গাছে ফলের পর্যাপ্ততা (ইনসেটে)

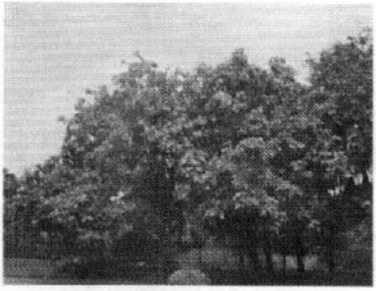

সোনালু গাছ

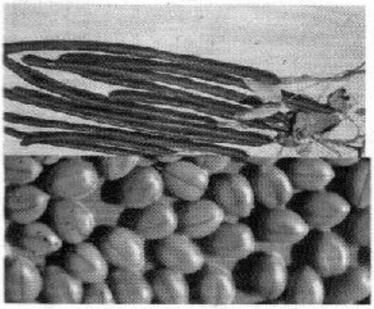

সোনালু ফল, সোনালু বীজ (নিচে)

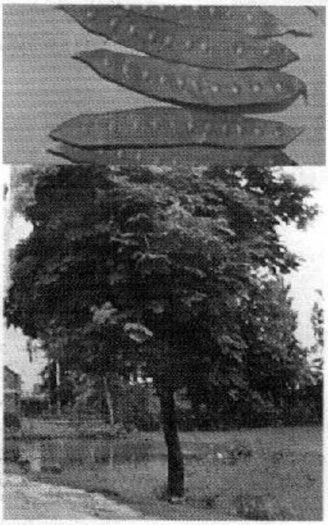

কালি কড়ই গাছ ও ফল (উপরে)

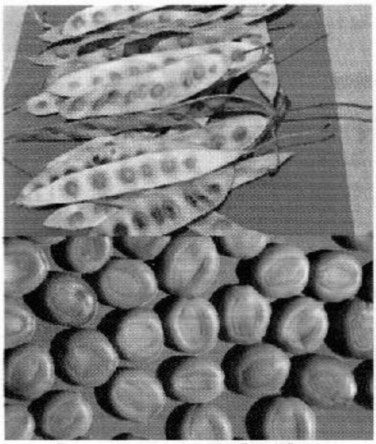

শিল কড়ই ফল ও কড়ই বীজ (নিচে)

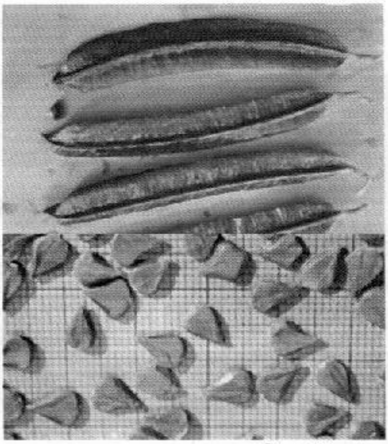

পেয়ারজুন ফল, পেয়ারজুন বীজ (নিচে)

বোতল ব্রাশ গাছ ও ফুল (উপরে)

বাবলা গাছ

অ্যালবিজিয়া

মিনজিরি গাছের একাংশ

শিশু গাছ

মান্দার গাছ

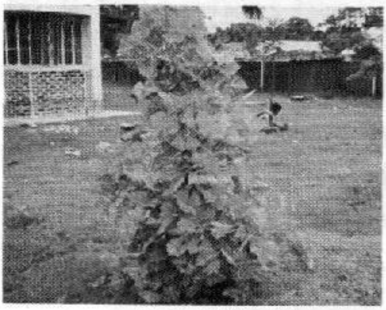

সুদৃশ্য মান্দার গাছ

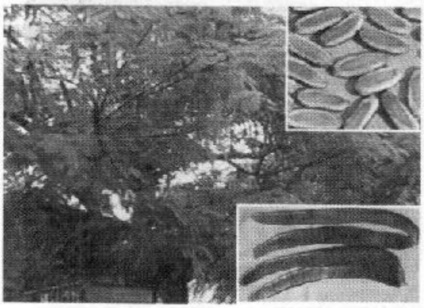

কৃষ্ণচূড়া গাছ, কৃষ্ণচূড়া ফল
(নিচে ইনসেটে) ও বীজ (উপরে ইনসেটে)

ছাঁটাই করা কৃষ্ণচূড়া

চন্দনা কড়ই বা শ্বেত কড়ই

বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক গাছ

শিশু গাছ লোপিং করা যায়

মাটি সংরক্ষণে ইউক্যালিপটাস গাছের নিম্নাংশ

নিচু জমিতে হিজল গাছ লাগানো যায়

ভূমিক্ষয় রোধে ইউক্যালিপটাস গাছের শিকড়

গামার গাছ খরা সহ্য করতে পারে

প্রতিষ্ঠানে কাঁঠালী চাঁপা সৌন্দর্য বাড়ায়

বৃক্ষের নিচে আনারস গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি

গ্লিরিসিডিয়া গাছের ডাল ছাঁটাই করা যায়

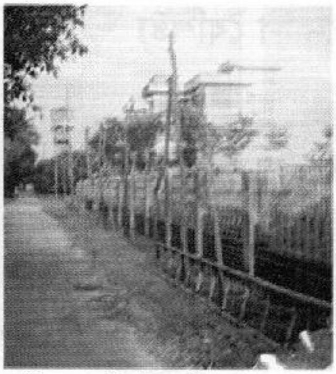

শিশু গাছ নিয়মিত ছাঁটাই করা যায়

বাহারী মান্দার গাছ

কারি প্ল্যান্ট

গোলাপ, জারুল ও অর্জুন

গিলা গাছ

সিঁদুর গাছ

সুদৃশ্য পাইন গাছ

চাঁপা গাছের একাংশ

আন্তঃক্রিয়ায় বিশেষ ক্যানোপি বৈশিষ্ট্য

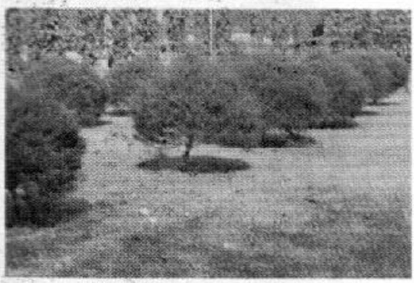

ভূমি ধারায় সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী গাছ

জারুল ও গাব গাছ

সোনালু ও কাঁঠাল আন্তঃক্রিয়া

বেল, নিম ও নারকেল আন্তঃক্রিয়া

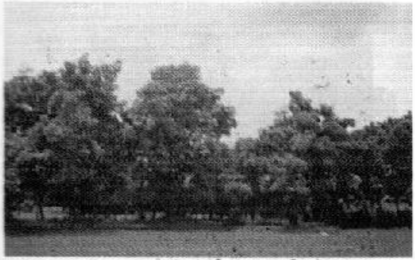

পলাশ ও মেহগনি আন্তঃক্রিয়া

চাউ, রেইনট্রি ও দেবদারু আন্তঃক্রিয়া

আন্তঃক্রিয়ায় ঝুড়ি চাউ ও আমগাছ

আন্তঃক্রিয়ায় কাঁঠাল ও পেয়ারা গাছ

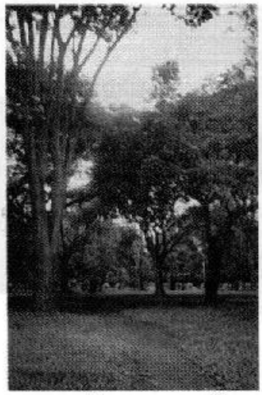

বড় ও ছোট গাছের আন্তঃক্রিয়া

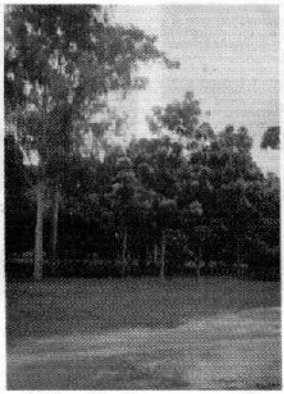

ইউক্যালিপটাস ও মেহগনি আন্তঃক্রিয়া

যজ্ঞডুমুর ও কড়ই আন্তঃক্রিয়া

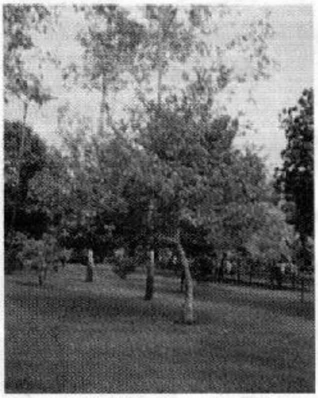

অর্জুন ও ইউক্যালিপটাস আন্তঃক্রিয়া

ঝাউ ও পাম গাছের আন্তঃক্রিয়া

ভুট্টা ও চীনা বাদাম

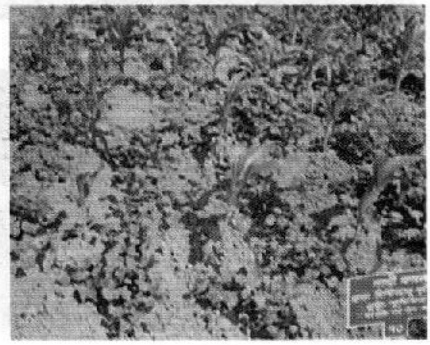

ভুট্টা ও মিষ্টি আলু

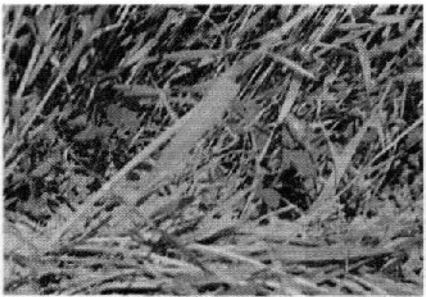

গম ও চীনা বাদাম

শিশু ও অর্জুন

দেবদারু ও ক্যাসিয়া

নারকেল ও কাঁঠাল গাছ

ভুট্টা ও সয়াবিন

ফাঁকা স্থানে আমগাছের ক্যানোপি
অনেক বড় হয়

বকুল ও দেবদারু

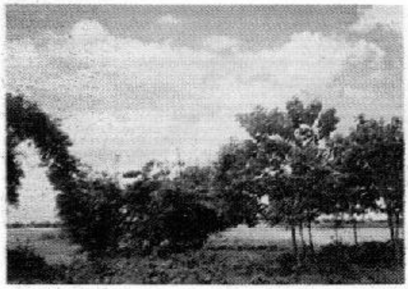

বাঁশ ও গামার আন্তঃক্রিয়া

ক্যাসিয়া গাছের ছড়ানো ক্যানোপি

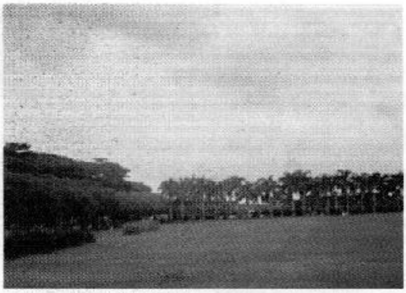

পামজাতীয় গাছের হালকা ক্যানোপি

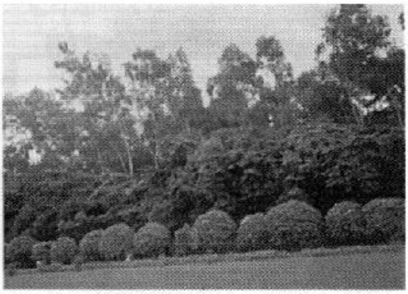

মুসান্ডা, ইউক্যালিপটাস ও ক্যাসিয়ার তিন সারি ক্যানোপি

পুরানো আমবাগানে ঘন ক্যানোপি

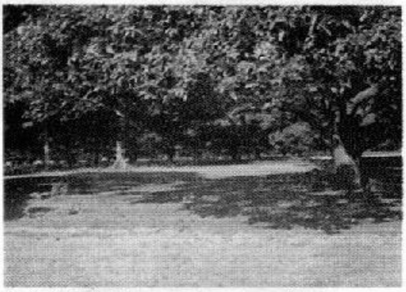

ঘন ক্যানোপির আমবাগানে সবজি করা যায়

বকুল, বরই, আম, সুপারি, নারকেল ও দেশী দেবদারু গাছের ক্যানোপি

প্রাথমিক অবস্থায় মেহগনি গাছের ক্যানোপি খুবই ছোট

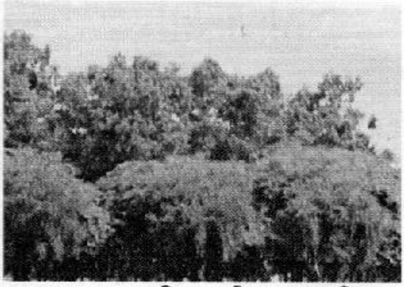
বোতল ব্রাশ-ক্যাসিয়া ও শিশু গাছের দ্বিস্তর ক্যানোপি

পিটালি গাছের মধ্যম হালকা ক্যানোপি

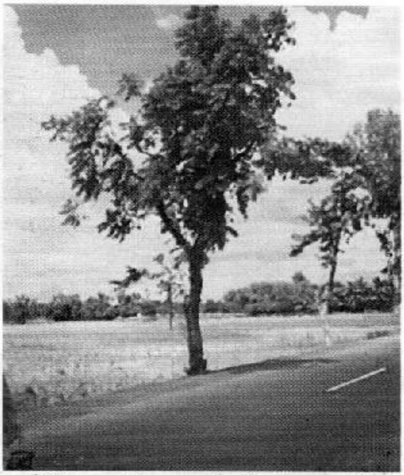
ছাঁটাই করা পিতরাজের অনিয়ত ক্যানোপি

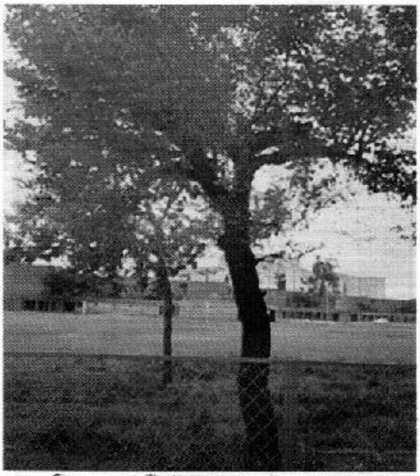
শিশু গাছ ছাঁটাই করে ছোট রাখা যায়

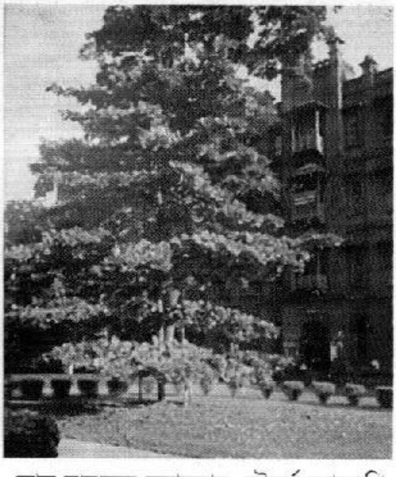
কাজু বাদামের সমান্তরাল সৌন্দর্য ক্যানোপি

রঙ্গন, জারুল ও শিশু গাছের ত্রিস্তর ক্যানোপি

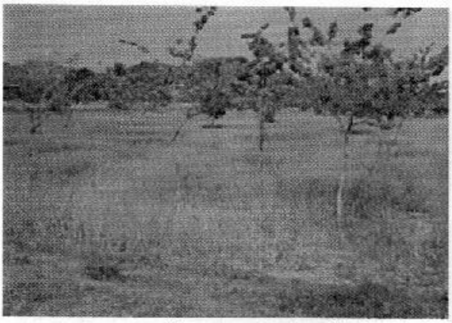
গম ও শিশু গাছের ক্যানোপি

ফাঁকা জায়গায় বোতল ব্রাশের ছড়ানো ক্যানোপি

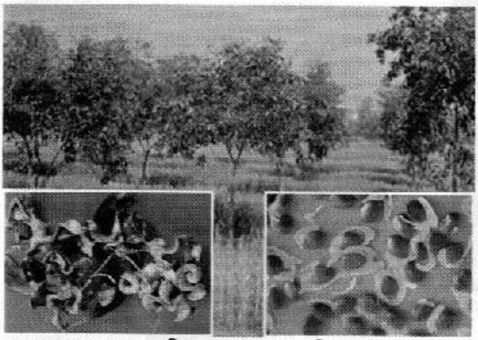
গম ও আকাশমনি গাছের ক্যানোপি। আকাশমনি ফল (ইনসেটে বামে) ও বীজ

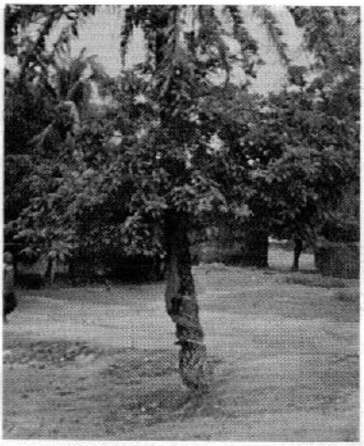
খেজুর গাছ ও সম্পূরক পরগাছা

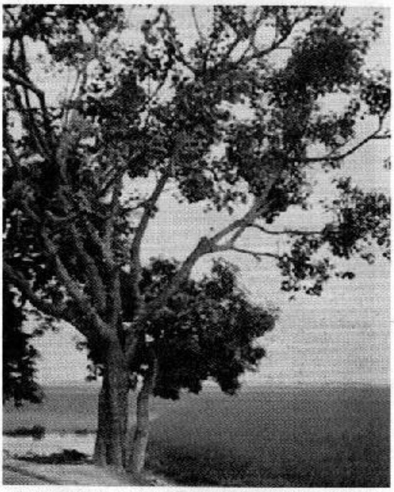
রাস্তার পাশে আমগাছ, বড় গাছ ও ধান গাছের ক্যানোপি

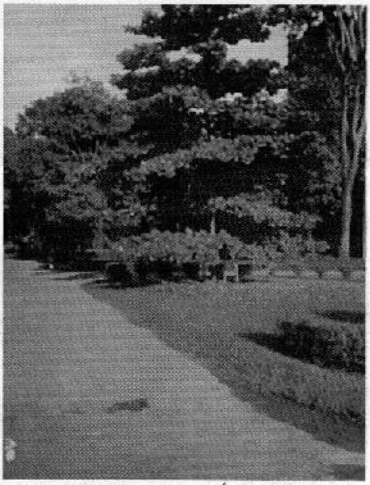
অন্যান্য গাছের সাথে কাঠ বাদাম গাছের ক্যানোপি

নারকেল গাছে পরগাছার আন্তঃক্রিয়া

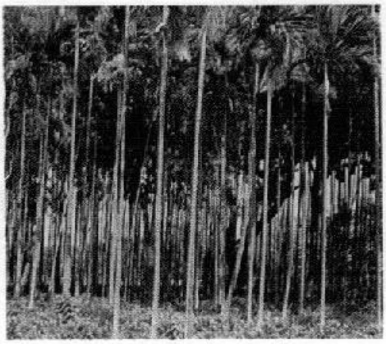

সুপারি ও রেইনট্রি আন্তঃক্রিয়া

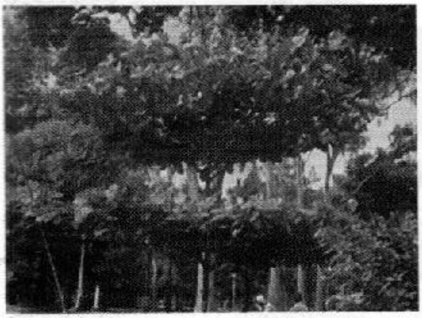

আন্তঃক্রিয়ায় কাঠ বাদাম গাছের দ্বিস্তর ক্যানোপি

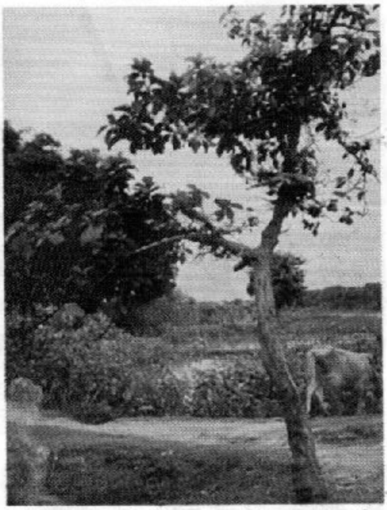

ডুমুর গাছের অনিয়ন্ত্রিত ক্যানোপি ও ঢোলকলমি

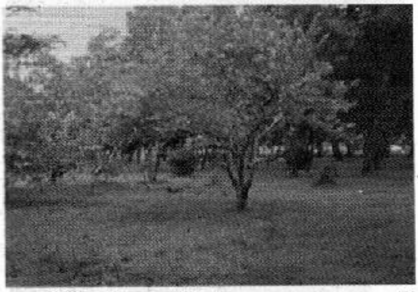

আন্তঃক্রিয়ায় এক সারি পেয়ারা গাছের ক্যানোপি

আন্তঃক্রিয়ায় কৃষ্ণচূড়া ক্যানোপি

খেজুর ও কলা

জারুল ও বেত

খেজুর ও বেগুন আন্তঃক্রিয়া

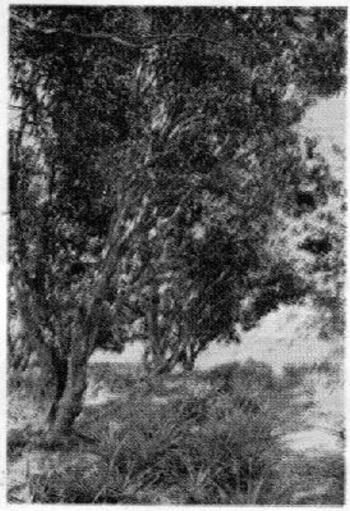

আম ও আনারস

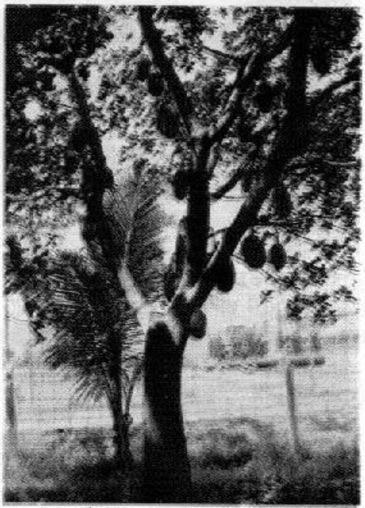

কাঁঠাল ও নারকেল আন্তঃক্রিয়া

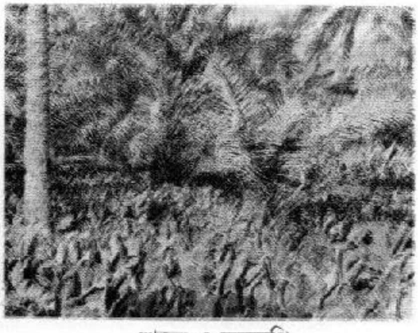

খেজুর ও ফুলকপি

খেজুর ও লাউ

সড়ক বন

ঘোড়া নিম

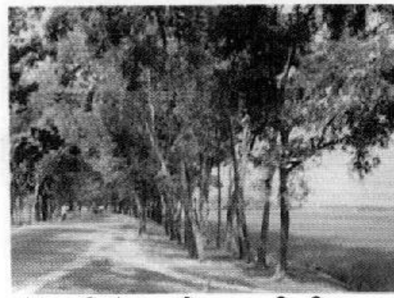

ইউক্যালিপটাস ও শিশুগাছের দ্বিসারি বনায়ন

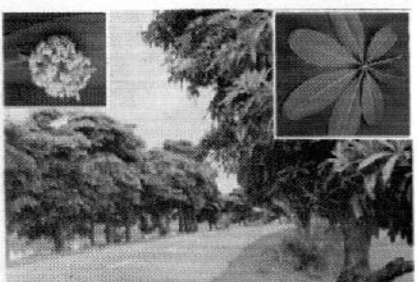

ছাতিম গাছের একসারি বনায়ন
(ইনসেটে ছাতিম পাতা) ও ফুল (ডানে)

আম ও বাবলা গাছের দ্বিসারি বনায়ন

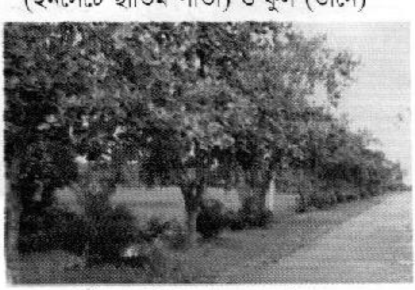

বট ও খেজুর গাছের বনায়ন

তুঁতগাছের বনায়ন

মেহগনি বনায়ন

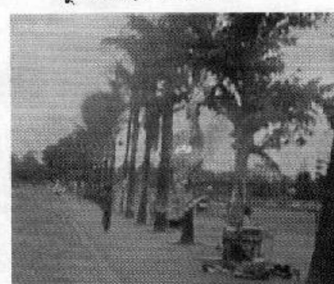

রাজপথ পাশে রয়্যাল পাম বনায়ন

রেল সড়ক পাশে আকাশমনি বনায়ন

রেল সড়ক পাশে বৃক্ষ বনায়ন

তিনসারি সড়ক বন

সড়ক বন (অনুৎপাদনশীল আম গাছ)

ফসল বন বনায়ন

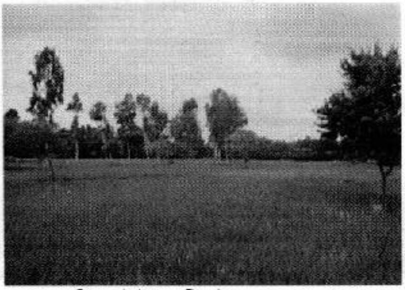
শিশু, ইউক্যালিপটাস ও বাবলা

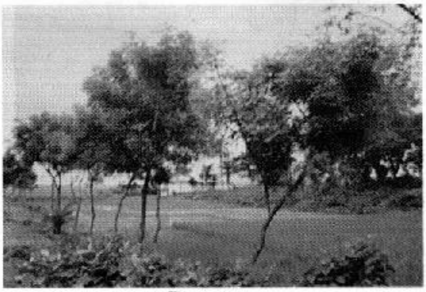
নিম ও ধান

ইউক্যালিপটাস ও বাবলা

ধান ও আম গাছ

মেহগনি ও ধান

ধান ও ইউক্যালিপটাস

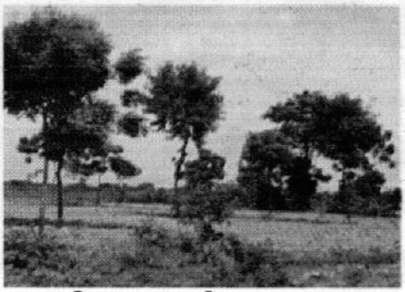

দ্বিস্তর বনায়ন (নিম ও ফসল)

ধানের জমির পাশে বাঁশ ও বৃক্ষ ঝাড়

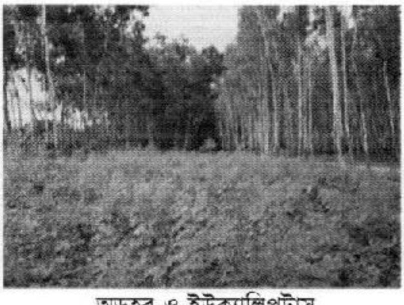

অড়হর ও ইউক্যালিপটাস

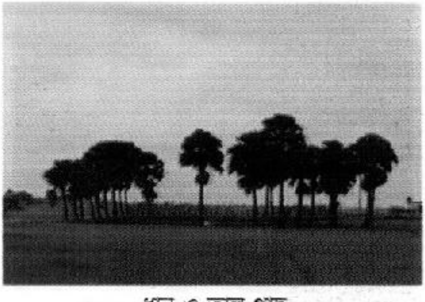

ধান ও তাল গাছ

পেয়ারা, কচু ও লেবু

পেয়ারা ও লুদ

ধানের জমিতে রেইনট্রি

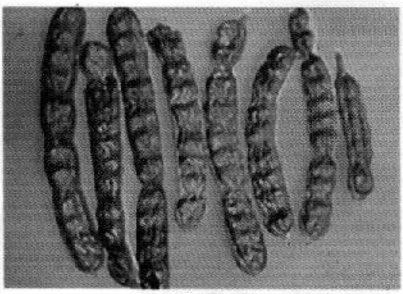

রেইনট্রি ফল

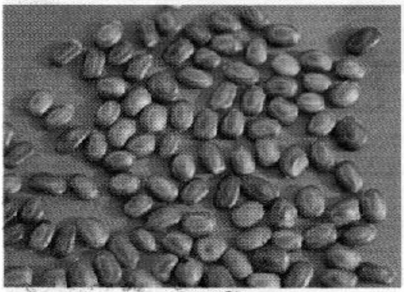

রেইনট্রি বীজ

ধান ও পেয়ারা

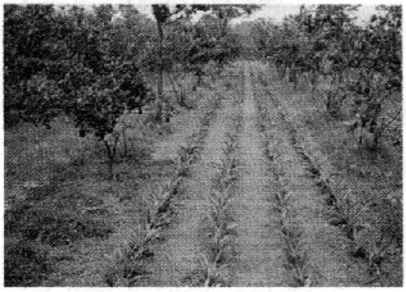

লেবু, আনারস ও পেয়ারা

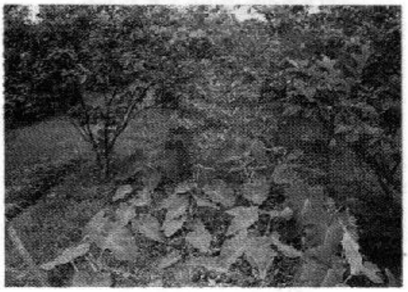

পেয়ারা ও কচু

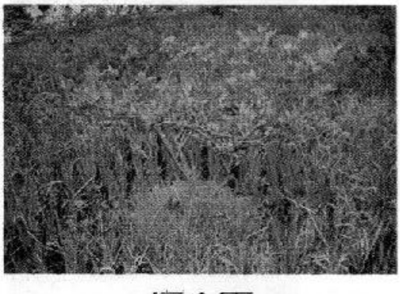

ধান ও লেবু

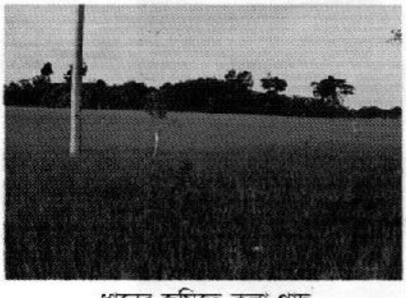

ধানের জমিতে কলা গাছ

বসত বাড়ি বনায়ন

গ্রামে বসত বাড়ি বনায়ন

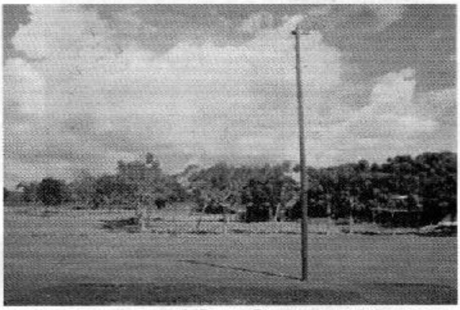

বসত জমিতে জিগা গাছ

গ্রামে বসত ভিটায় বৃক্ষ ও ধান

বসত বন (সবজি)

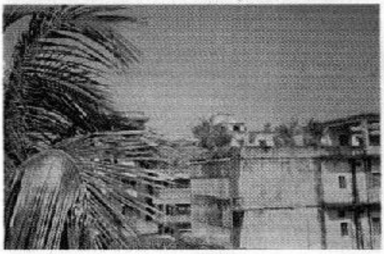

শহরে বসত ভিটায় বৃক্ষ

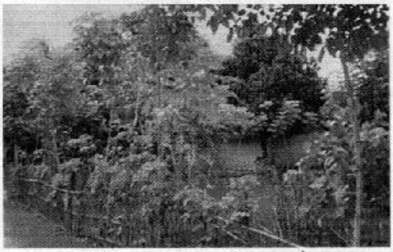

বসত বাড়ি বনায়ন (সবজি ও মাঠ ফসল)

বসতবাড়ি ত্রিস্তর বনায়ন (নারকেল, কলা ও হলুদ)

বসত বন বৃক্ষ (নারকেল ও কাঁঠাল)

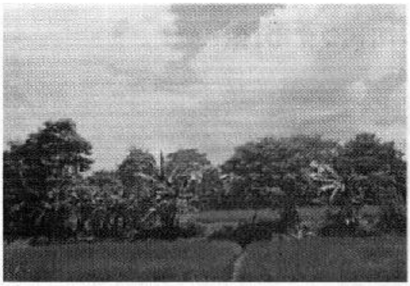

বসতবন (কলা ও শ্যাওড়া)

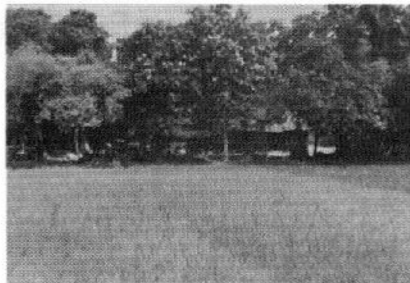

বসত বাড়ি বনায়ন (বৃক্ষ ও মাঠ ফসল)

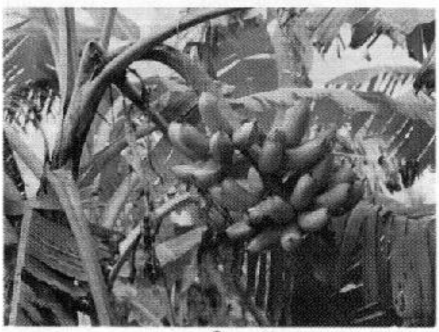

বসত বাড়িতে কলা

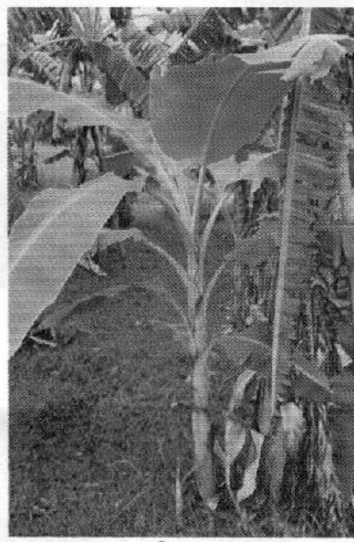

বসত বাড়িতে কলা গাছ

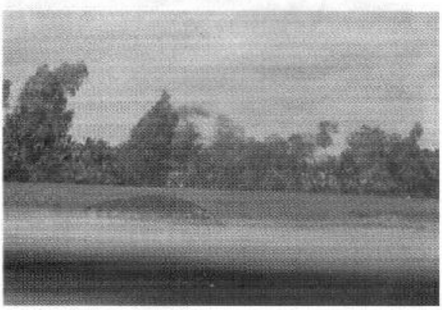

বসত গোলপাতা

শহর বন

শহর বন ক্যানোপি

নার্সারিতে বনজ গাছের চারা

সরাসরি মাঠে চারা উৎপাদন

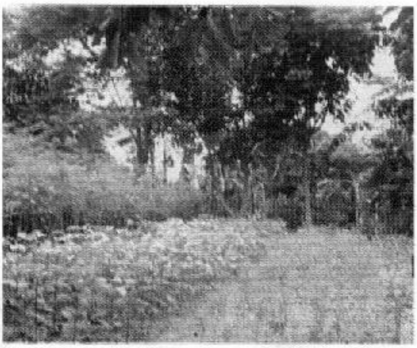

সরাসরি বীজতলায় চারা উৎপাদন

খেজুর চারা উৎপাদন

ছায়া গাছের উন্নত চারা উৎপাদন

পলিব্যাগে চারা উৎপাদন

বন বাগানে মাঠ ফসল

কাঁঠাল বাগানে আখ

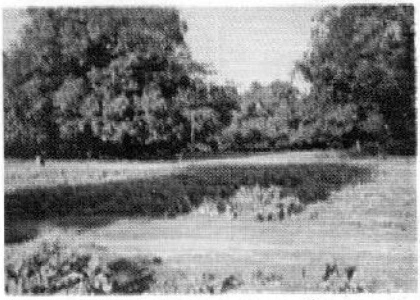
আম বাগানে শাক-সবজি

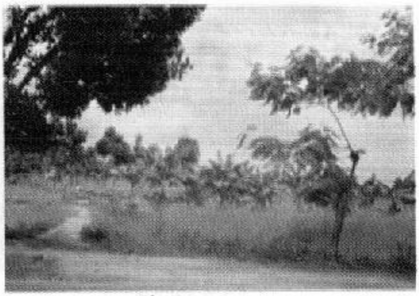
কাঁঠাল বাগানে কলা

মেহগনি বাগানে আনারস

মিশ্র বাগানে কলা ও পাট

মিশ্র বাগানে হলুদ

ছায়া প্রদানকারী জাতের হলুদ

হলুদ ডিমলা (উচ্চ ফলনশীল)

কৃত্রিম বন

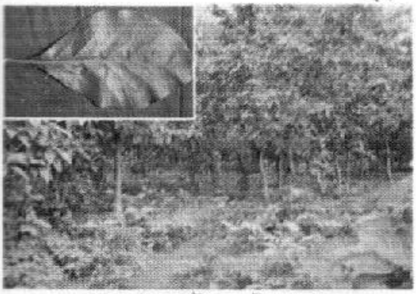

সেগুন বন (ইনসেটে পাতা)

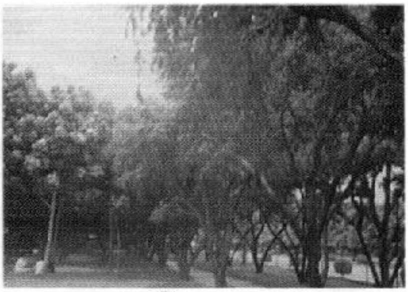

মেহগনি ও বোতল ব্রাশ

শিশু গাছ (এক বিঘা জমির পুকুর পাড়ে প্রায় হাজার সংখ্যক গাছ)

প্রাতিষ্ঠানিক বন (মাঠ ফসলসহ)

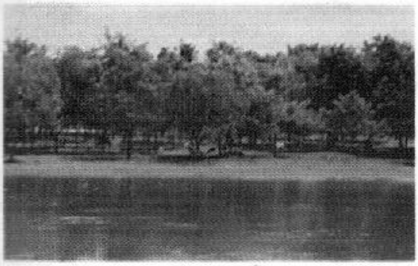

গোচারণ ভূমি

শাল উডলট

সামাজিক বনায়ন

গোচারণ ভূমিতে কৃত্রিম বন

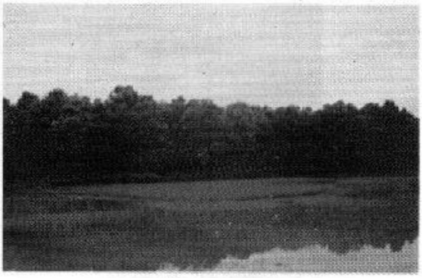

কৃত্রিম শালবন

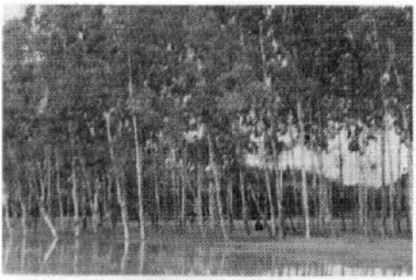

ইউক্যালিপটাস উডলট

ধানের জমি পার্শ্বস্থ ইউক্যালিপটাস বন

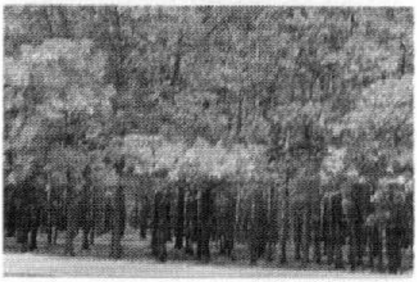

মেহগনি কৃত্রিম বন

পলাশ বন

গামার সারির উপরাংশ

শহরে প্রাতিষ্ঠানিক বন

কৃত্রিম বনের জন্য মেহগনি চারা রোপণ

সুপারি বাগান (মান্দার গাছসহ)

কৃষ্ণ ডিঙ্গা গাছ

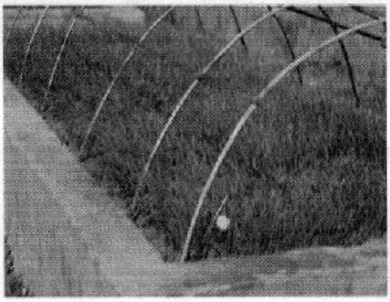

কৃত্রিম বনের জন্য চারা উৎপাদন

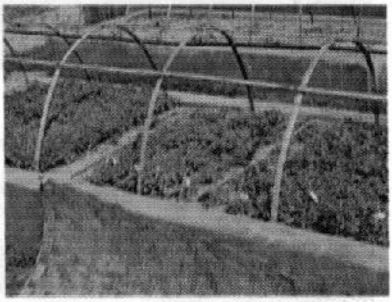

কৃত্রিম বন তৈরির জন্য চারা উৎপাদন

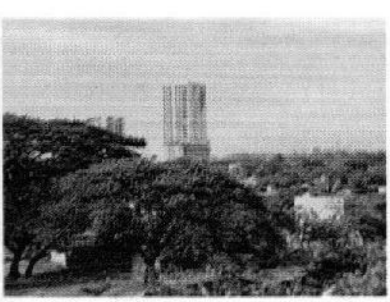

শহুরে পরিবেশে কৃত্রিম বনায়ন

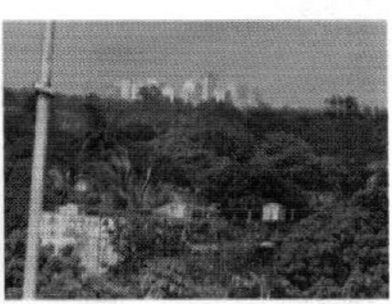

নাগরিক পরিবেশে কৃত্রিম বনায়ন

স্ট্রেস বনায়ন

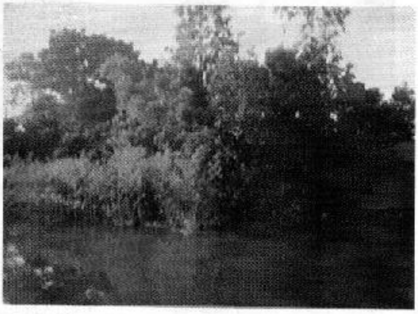

প্লাবিত বসত ও ফসল বন (জলাবদ্ধতায় কাঁঠাল গাছ মৃতপ্রায় হয়)

প্লাবিত বসত বনে ক্ষতিগ্রস্ত বসতি ভিটা বন

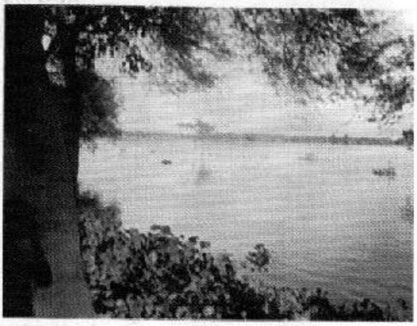

প্লাবনাক্রান্ত রাস্তার পার্শ্বস্থ বৃক্ষ

প্লাবনাক্রান্ত বসতভিটা সংলগ্ন বৃক্ষ ফসল

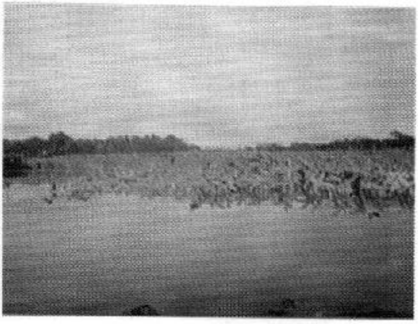

প্লাবনাক্রান্ত মৃতপ্রায় কলা বন

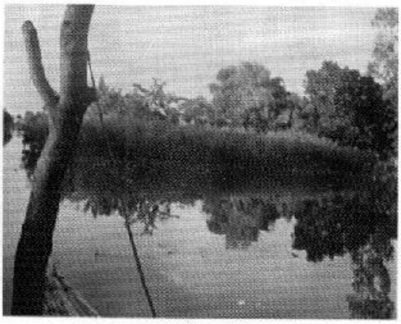

প্লাবনাক্রান্ত বসতভিটা সংলগ্ন পাট ফসল

বসত বনে প্লাবনের হুমকি

সড়ক পার্শ্ব বনে প্লাবনের হুমকি

মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ফসল

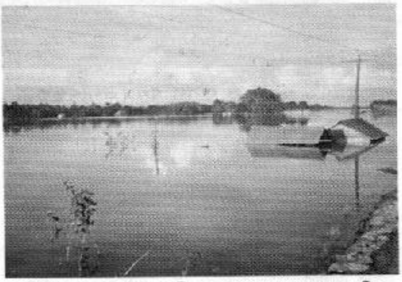
মারাত্মক বন্যায় প্লাবিত ফসল ও বসত বাড়ি

প্রাকৃতিক বনে প্লাবনের আক্রমণ (মৃত গাছ)

প্লাবনাক্রান্ত সামাজিক বন

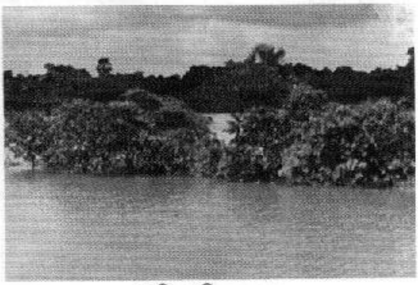
প্লাবিত হিজল বন

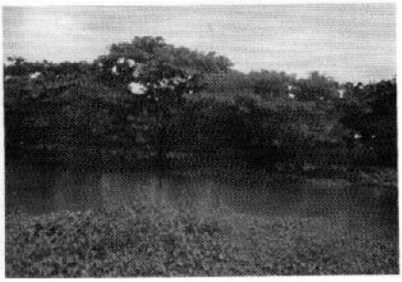
বসত বৃক্ষবন বন্যায় আক্রান্ত

মারাত্মকভাবে প্লাবিত ফসল ও বনবৃক্ষ

বন্যাক্রান্ত গভীর পানির ধান ও বসত বন

উত্তুরে শৈত্য প্রবাহে গাছ

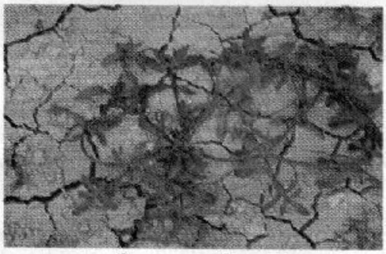
খরা প্রতিরোধক হেইছা আগাছা

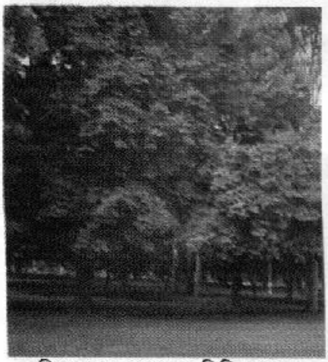
মিশ্রভাবে লাগানো বিভিন্ন গাছ

দ্বি-সারিভিত্তিক ধান ও ইউক্যালিপটাস

বহু সারিতে লাগানো ইউক্যালিপটাস

তিন সারিভিত্তিক রোপিত ইউক্যালিপটাস

কৃষি বনায়ন নকশা

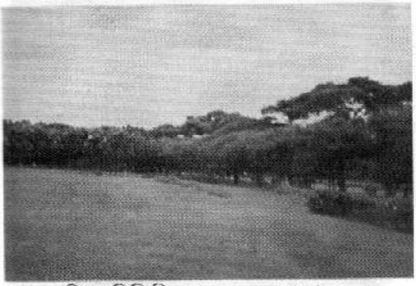

দ্বি-সারিভিত্তিক বোতল ব্রাশ গাছ

পার্ক নকশা

এক ও দুই সারিতে লাগানো ইউক্যালিপটাস ও ধান

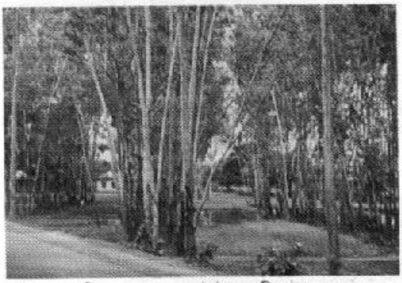

তিন সারিতে লাগানো ইউক্যালিপটাস ও ধান

জমির আইলে কাঁঠাল গাছ

সারিতে লাগানো মেহগনি

তিন সারিতে রোপিতাবস্থায় ইউক্যালিপটাস

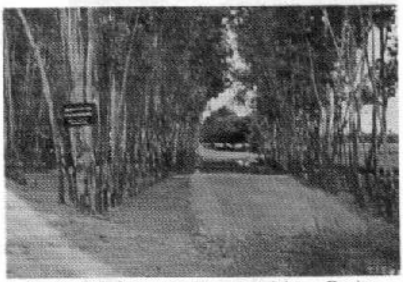

তিন সারিভিত্তিক ধানের চারা ও ইউক্যালিপটাস

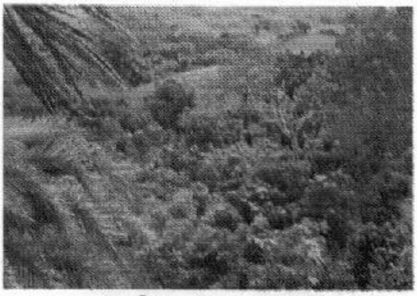

পাহাড়ি বন (অব্যবস্থাপনা)

শালবন

পাহাড় ঝুম (অবনীকরণ)

পশু বনায়ন

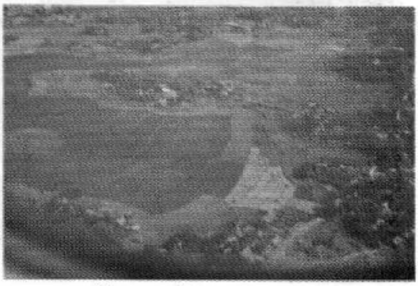

গ্রামীণ বন (বিমান থেকে তোলা)

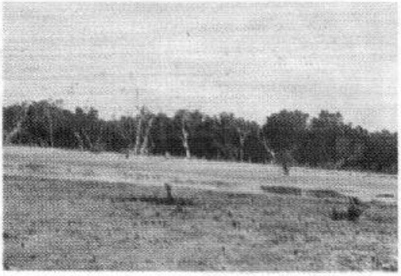

লোনাবনে শ্বাসমূল

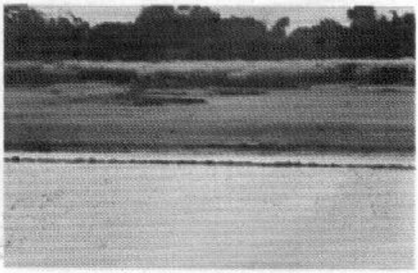

প্রাকৃতিক চরে কাশবন

কৃষি বনায়ন উপযোগী গাছের রোগ

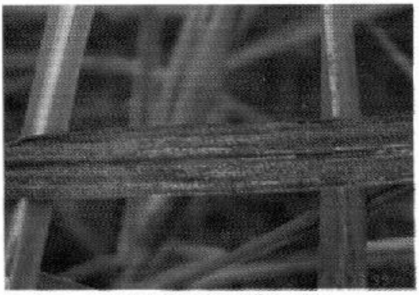

আখ পাতায় লাল পঁচা রোগ

হলুদের রোগ

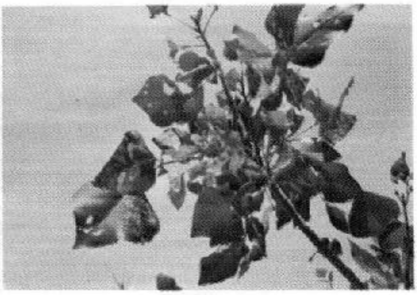

মান্দারের রোগ

অরোক্যারিয়া গাছে পুষ্টির অভাবজনিত রোগ

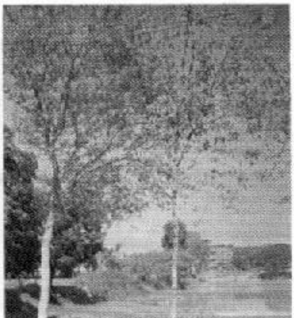

শিশু গাছে রোগ

হলুদের রোগ ও বেগুন গাছ

দেবদারুর পাতা ধ্বসা

কৃষি বনায়ন উপযোগী বিভিন্ন গাছ ও বিভিন্ন অংশ

সুন্দর পাম (কাঠ পাম)

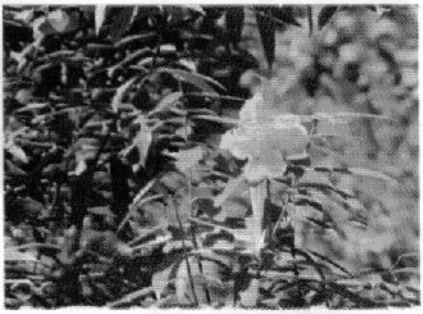

ফুলসহ নাগেশ্বর চাপা গাছের একাংশ

ফলসহ নাগেশ্বর চাপা গাছের একাংশ

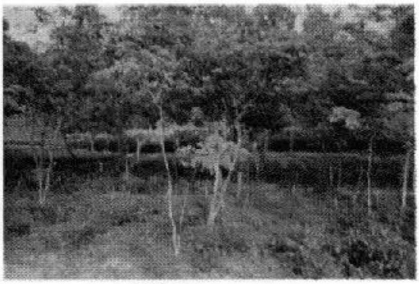

ইন্ডিগো ছায়া গাছ

চা-বাগানে ছায়া গাছ

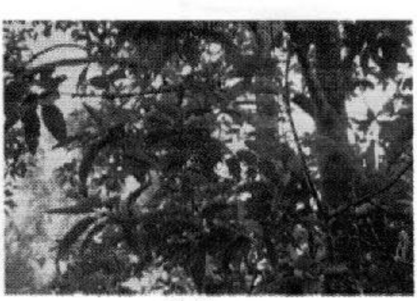

কাঁঠালী চাপা

স্টার আপেল গাছ

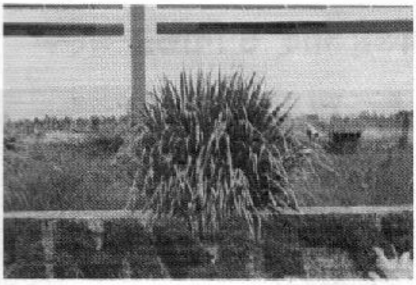

সাইট্রোনেলা

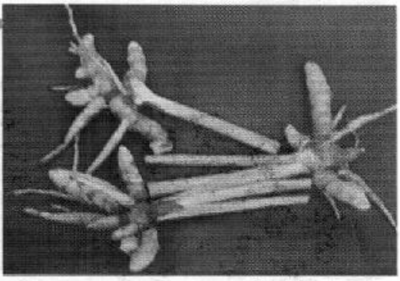

হলুদ (ছায়া-সহ্যশীল)

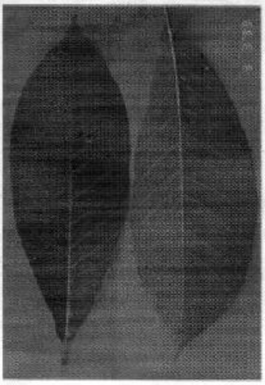

নাগলিঙ্গম গাছের পাতা

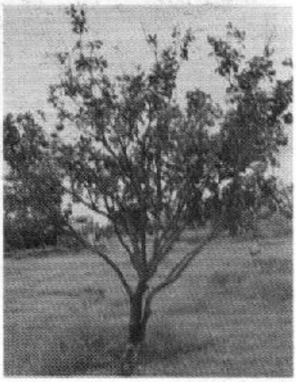

দেশী জাম্বুরা

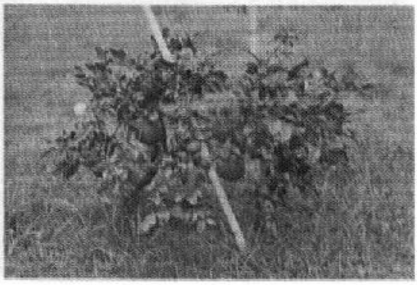

ইরি জাম্বুরা (বামন গাছ)

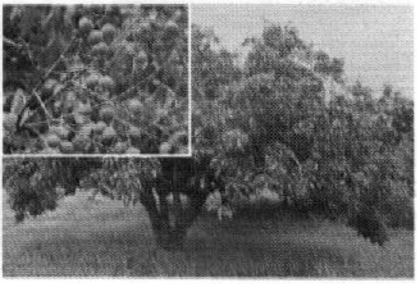

আঁশফল গাছ ও আঁশফল (ইনসেটে)

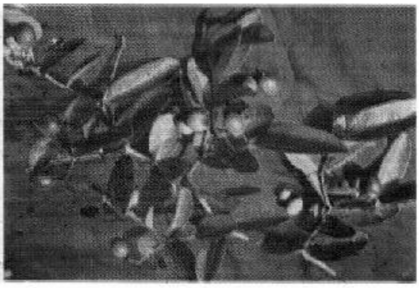

ফলসহ করমচা গাছের একাংশ

কাউফল

ইউক্যালিপটাস ফুল

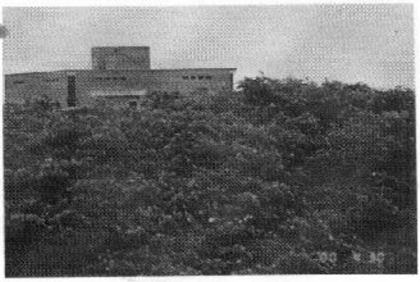

ফুলসহ রেইনট্রি গাছ

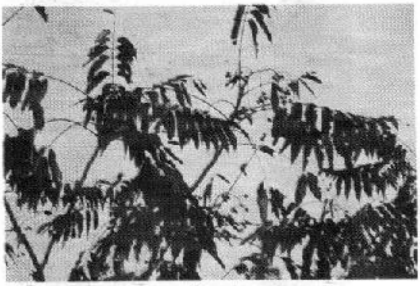

ফলসহ ঘোড়া নিম গাছের একাংশ

ফুলসহ পলাশ গাছের উপরাংশ

হালকা তাল গাছ

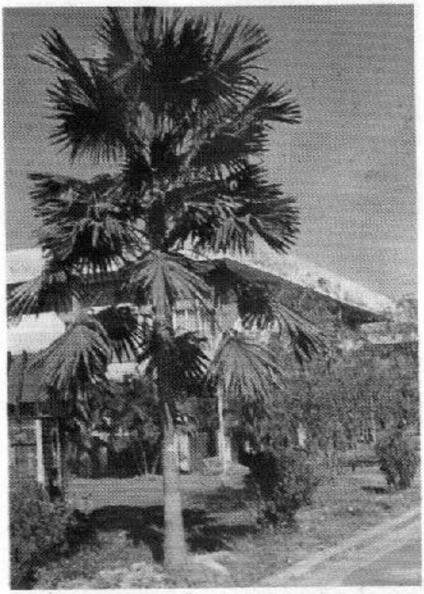

শহরের পরিবেশে পাম গাছ

কৃষি বনায়নে বিভিন্ন প্রাণীর আবাস

সেগুন গাছে পাখির বাসা

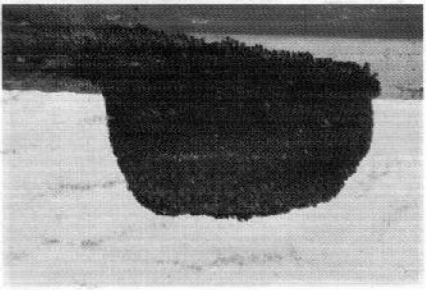

বনবিহীন পরিবেশে মৌচাক (বৃক্ষ থেকে পৃথকীকৃত)

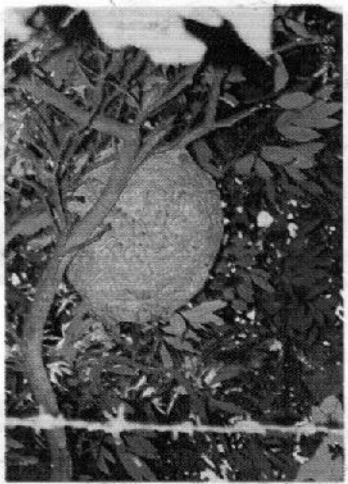

বনবিহীন পরিবেশে লিচু গাছে ভীমরুল

শেফালী ঝাড়ে বল্লার চাক

(ভীমরুলসহ) লিচু গাছে ভীমরুলের চাক

লেবু গাছে পাখির বাসা

BANSDOC Library
Accession No. 17810